দক্ষিণেশ্বর মন্দির

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

॥ ত্রুটী সংশোধন ॥

এই গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠার ২৬ এবং ২৭ লাইন দুটি বর্জিত হবে।

—গ্রন্থকার

রাণী রাসমণি

॥ ১ ॥

রাণী রাসমণি—বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক

রাণী রাসমণি—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি চিরস্মরণীয় নাম। রাণী রাসমণি—একটি মঙ্গলময় নাম। রাণী রাসমণি—একটি জ্যোতির্ময় নাম। রাণী রাসমণি—মাতৃত্বের পরিপূর্ণতায় একটি অমৃতময় নাম। রাণী রাসমণি—তেজস্বিতা, আধ্যাত্মিকতা, সততা ও হৃদয়বত্তার সমন্বয়ে একটি স্বয়ংসিদ্ধ নাম।

* * *

দেবদ্বিজে ঐকান্তিক ভক্তি, জনগণের প্রতি অগাধ প্রেম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অজেয় ব্যক্তিত্ব, অক্ষয় মনুষ্যত্ব, আর ব্যাপকতর কর্মযজ্ঞের জন্য রাণী রাসমণি আজ মানবসভ্যতার শীর্ষে আপন মহিমায় বিরাজিতা।

প্রজ্ঞা, বোধ, বুদ্ধি, যুক্তিসিদ্ধ মন, দার্শনিক জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ধারণা, আপোষহীন স্বপ্রত্যয়,—সর্বোপরি সনাতন হিন্দুচিন্তা ও মননভাবনার নিজস্ব দৃষ্টিকোণের উৎকর্ষতায় রাণী রাসমণির জীবনেতিহাস আজ প্রকৃতপক্ষে ভারতাত্মার ইতিহাস।

* * *

বঙ্গদেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ, স্বাধীনচেতা, বীরোত্তমা রাসমণির সংগ্রামী জীবন যেমন তৎকালীন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত, অশিষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর, তেমন মনুষ্যত্ব সাধনার শক্তিকে জাগ্রত ক'রে বিকলাঙ্গ জাতির কাছে তিনি চিরবিস্ময়!

কাঙাল, ফকির, দীন, দরিদ্র প্রভৃতি ব্যথিত জনগণকে রক্ষার জন্য তাঁর অকাতরে দান সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া, জলকর রোধ, নীলকর উৎপীড়ন রোধ, গোরাসৈন্যদের অত্যাচার রোধ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজগুলির মাধ্যমে তিনি ছিলেন দুর্লভ তেজস্বিতার প্রতীক। আবার, তাঁর একক অর্থদানের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বহু রাস্তাঘাট, বাজার, খাল প্রভৃতি, যা আজকের সমবেত প্রচেষ্টার চাইতেও অনেক বেশী ফলদায়ক। কারণ, প্রতিটি কাজের মধ্যেই ছিল তাঁর অন্তরের নিবিড় স্পর্শ, মাতৃত্বের মহান্ স্পর্শ,—যা নাকি আজকের বড় বড় কর্মযজ্ঞের মধ্যেও দুর্লভ!

* * *

অসীম আত্মপ্রত্যয়, প্রদীপ্ত আত্মমর্যাদা, সদাজাগ্রত উদ্যম, করুণাকাতর হৃদয়, আর দিব্যজীবনের বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে রাণী রাসমণির অবদান সমগ্রজাতির কাছে অভাবনীয়, অপূর্ব। আবার, এই মাতৃশক্তির বিগ্রহস্বরূপিনী রাসমণির

শাশ্বত মাতৃসাধনার ফলশ্রুতি—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রাসমণির সমগ্রজীবনের শেষ ও অমর কীর্তি যেমন- "দক্ষিণেশ্বর মন্দির", তেমনি তাঁর শেষ ও অমর উপহার—"শ্রীরামকৃষ্ণ"

* * *

ভারতের, তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি, প্রধান অধিষ্ঠাত্রী মা-কালিকা, আর যুগধর্মবিধাতৃ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখানকার ব্রহ্মাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ—বীর সন্ন্যাসী 'স্বামী বিবেকানন্দ',—যিনি জগৎকে করলেন আলোকিত, চমকিত, উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত। তাঁরও জাগরণ এই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির তাই আন্তর্জাতিক মহাতীর্থ, মহাশক্তিপীঠ, মহাআকর্ষণের অমোঘ সম্পদ। আবার বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের কাছে দক্ষিণেশ্বরের মাটি 'বিস্ফোরক তুলা,' যার শাশ্বত শুভ শক্তিতে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়, —জগতের যে কোন অশুভ শক্তি দমিত হতে বাধ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই দেবালয় নির্মাণের জন্য রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে জমি ক্রয় এবং দেবালয় নির্মাণ শুরুর ঠিক একশো বছর বাদে -১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পরাধীনতার বন্ধন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি— এও এক পরমাশ্চর্য ঘটনা।

* * *

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিবেশে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ নয়,- ভারতের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ ও জাতীয়তা-বোধেরও পুনর্জাগরণ ঘটেছিল।

একটি দেবালয়কে অবলম্বন ক'রে ভারতের এই নব জাগরণ যেমন পরম গৌরবের বস্তু, আবার এই দেবালয় ভারতের অন্যান্য দেবালয়ের চাইতে স্বাতন্ত্রধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দেবালয় যেমন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মের ধারক বা মাধ্যম, এই দেবালয় কিন্তু সর্বধর্ম সমন্বয়ের এবং **'যত মত, তত পথ'**-য়ের পীঠস্থান, যা বিশ্বের আর কোন দেবালয়ে ঘটেনি। এখানে সকল মতের, সকল পথের সাধনার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভও ঘটেছে আবার, তদানীন্তন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধক, উপাসক, ধর্মগুরুর সমাবেশও হয়েছে এই দেবালয়ে,- -যা অন্যত্র বিরল। উপরন্তু, এই পবিত্রস্থানেই পতি কর্তৃক নিজ পত্নীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে এবং 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' জ্ঞানে এখানেই উভয় বস্তুকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে,—যা আজকের অনেক ভোগবিলাসী মানুষের কাছে 'নিছক পাগলামি' মনে করা স্বাভাবিক।

এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার অভিনব পটভূমিকা, দিব্যানন্দময় পরিবেশ, মন্দির-গুলির বিন্যাস প্রণালী ও স্থাপত্যশিল্প—মনুষ্যজাতির সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে মহামূল্য নতুন সঞ্চয়। ভারতে আরও অনেক দেবালয় নানস্থানে বহুদিন থেকেই

বিদ্যমান,—কিন্তু এই একটি বিশেষ দেবালয়কে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতির জীবনের বহুবিধ সমস্যার বাস্তব সমাধানের ঘটনা ও স্বাধীনতার বীজবপনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায়নি।

* * *

রাণী রাসমণির অমরকীর্তি এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব লীলা এমনভাবে জড়িত যে, রাণী রাসমণির কথা স্মরণ হলেই সর্বাগ্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা যেমন মনে পড়ে, আবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা স্মরণ হলেই মা-কালী সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বার বার মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে এই ত্রয়ী যেন একাত্মায় রূপান্তরিত। রাণী রাসমণির দান, শ্রীরামকৃষ্ণের গান, আর মা-কালীর প্রাণ নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে ও প্রাচুর্যে আজও ঐতিহ্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ভবিষ্যতেও থাকবে. এবং যুগ যুগ ধ'রে তাদের আকর্ষণ করবে শান্তি ও মুক্তির পথে,—যারা জীবন সংগ্রামে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত ও বিভ্রান্ত।

* * *

রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত এটি সেই দেবালয়, যেটি যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনবিদিত প্রধান লীলাস্থল,—যেখানে সমগ্র মনুষ্যসমাজ একদা লুটিয়ে পড়েছিল চরম সত্যের ও শান্তির প্রতীক এই পরমপুরুষের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দুর্নিবার আকর্ষণে।

লৌকিক জগতে সাধারণ হয়েও যিনি অসাধারণ, সামান্য হয়েও যিনি অসামান্য, নির্ধন হয়েও যিনি ধনী, মূর্খ হয়েও যিনি পণ্ডিত, বস্ত্রযুক্ত হয়েও যিনি বিবস্ত্র, জাগ্রত হয়েও যিনি সমাধিস্থ, গৃহী হয়েও যিনি সন্ন্যাসী, মানব হয়েও যিনি দেবতা, নিঃসন্তান হয়েও যিনি জগৎপিতা—সেই অলৌকিক জগতের মানুষটির কাছে, এই দেবালয়েই সমবেত হ'লেন তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর অজস্র নরনারী। দেবদর্শন ছাড়াও মানুষকে দর্শন করার এমন নজীর আর কোন দেবালয়ে নেই।

রাজা, জমিদার, মনীষী, মহাত্মা, চিন্তাশীল, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, দার্শনিক, গায়ক, বাদক থেকে শুরু ক'রে লম্পট, দস্যু, গুণ্ডা, পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভীড় হয়েছে এই একজন অভিনব মানুষের কাছে—এই দেবালয়েই। তাই আজ মানুষ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে এসে দেবদেবী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ও স্মৃতি বিজড়িত ঘরটি দর্শন করার জন্য ভীড় করে, তাঁর সাধনস্থলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায়। পাষাণময়ী দেবী এখানে মানুষের মত কথা ক'য়েছেন,—আবার মানুষও এখানে দেবতার মত পূজা পেয়েছেন। তাই বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্যময়ী পরমাশক্তির সন্ধান দেয় এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী, ধর্মপ্রাণা, সহৃদয়া, দানশীলা, তেজস্বিনী, ঐশ্বর্য-

শালিনী, সর্বগুণাশ্রয়ী, বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক, লোকমাতা রাণী রাসমণিকে জানাই অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'রাণী মা' বলেই সম্বোধন করতেন, তাই আমাদের কাছেও আজ তিনি 'রাণী মা'।

॥ ২ ॥

আবির্ভাবের পূর্বাভাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ইংরাজের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণের দরুন, তৎকালীন জাতীয় জীবনে শুরু হয়েছিল অবক্ষয়ের পালা ;—যার ফলে, ভারতবাসী নিজের সুপ্রাচীন সভ্যতার ওপর আস্থা হারিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপরই অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক—সকল প্রকারে পতনের শিকার হয়। পাশ্চাত্যের নতুন জ্ঞান আহরণের ফলে স্বজাতি, স্বধর্মকে হীন জ্ঞানে সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান, এমনকি সামাজিক আচার-আচরণেও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন। ফলে, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ক্রমশঃ প্রাচ্যের আত্মতাত্ত্বিক অধ্যাত্মবাদকে ধ্বংসের পথে চালিত করার সুযোগ দেয় এবং নবজাগরণের নামে হিন্দুধর্মের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নবজাগরণে মুসলমান সমাজ কোনদিনই সাড়া না দেওয়ায়, ইসলাম ধর্মের কোনও ক্ষতি হয়নি, যদিও তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচুর সংখ্যায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাস করতেন।) ভারতবর্ষ এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ধারক ইংরাজরাজের অধীনে থাকায়, ভারতবর্ষের সনাতন ভাবধারাকে বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন ভারতের সুধীসমাজেরও বৃহৎ এক অংশ ইংরাজী শিক্ষিত হ'য়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অনুপ্রাণিত হন এবং স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অথবা তাকে ঘৃণা করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। এই ভাবে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলতে থাকে এবং ভারতবাসী একটি আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়।

* * *

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শুরুতেই দেখা যায় ভারতের প্রাণশক্তির বিকাশ এবং সকল বিষয়ের মতই বঙ্গদেশই ছিল তার পথপ্রদর্শক। আত্মরক্ষার তাগিদেই সেদিন শুরু হয়েছিল সমাজ সংস্কার ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন। এই অবক্ষয়রোধের উদ্দেশ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নব ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তে, প্রথম অগ্রদূত ও নির্ভীক সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রাহ্মসমাজ।' গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেও

তিনি হিন্দুধর্ম ছাড়াও মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন এবং হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিনটি ধর্মের সমন্বয়ে এক আধুনিক ধর্ম সৃষ্টি করেন, যার নাম হয় 'ব্রাহ্মধর্ম।' এই ধর্মে হিন্দুদের দেবদেবীকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি সকলের উপযোগী সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষিত হিন্দুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চাঙ্গের 'একেশ্বরবাদ' গ'ড়ে তোলেন। কিন্তু যাঁরা সর্বতোভাবে সাকার-উপাসনা পরিত্যাগ করবেন, কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই এই ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এছাড়াও, সামাজিক প্রথাগুলির পুনর্বিন্যাস, নব শিক্ষা পদ্ধতি, বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক চিরবৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আধুনিক প্রথায় স্ত্রী শিক্ষা প্রদান, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি নানা গঠনমূলক কাজের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সেদিন পাশ্চাত্য সভ্যতায় আগ্রহী বহু হিন্দুকে এই ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে জাতির সেই ঘোর দুর্দিনে, এইভাবে হিন্দুধর্মকে পতনের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করেছিল, কিন্তু সর্বতোভাবে পারেনি। কিন্তু 'সতীদাহ প্রথা' রোধ ক'রে, রাজা রামমোহন সেদিন যেভাবে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, সেজন্য হিন্দুজাতি চিরদিন তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাক্‌বে।

এ ছাড়াও, হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য আর্য সমাজ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি সংস্কারবাদী সংস্থাগুলিও সেদিন বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে আলোড়নের সৃষ্টি ক'রেছিল। কিন্তু এই সব আন্দোলনই ছিল হিন্দুধর্মের ভেতর থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি মতবাদকে অবলম্বন ক'রে—কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল প্রাণশক্তিকে বর্জন ক'রে। তাই, এই একদেশদর্শী অর্থবোধের ফলে, তাঁরা হিন্দুধর্মের উপকার অপেক্ষা, পরোক্ষভাবে অপকারই ক'রেছিলেন। কারণ, তাঁদের পছন্দমত হিন্দুধর্মের বাছা বাছা অংশগুলি প্রচারের ফলে, বাকীগুলি অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন ও কুসংস্কার ব'লে বোধ হতে থাক্‌ল এবং হিন্দুধর্মের গভীরে মহান্ একটি একত্বের মূলসূত্র থেকে অনেকেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ সদিচ্ছাসহ হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য তৎকালীন সংস্কারবাদীরা অগ্রসর হলেও, অল্প কয়েকজন সমর্থক ছাড়া সমগ্র জাতি তাঁদের পিছনে ছিল না এবং সেজন্যই তাঁরা এই বিষয়ে কিছুটা অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া, প্রাচীনপন্থী অগণিত জনসাধারণও এই সংস্কারকদের প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন না—বরং তাঁদের তুলনায় 'সংস্কার সমর্থক' শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অবশ্য, প্রাচীনপন্থী এই জনসাধারণকে সংস্কারকেরাও যেমন বিশেষ পছন্দ করতেন না, প্রাচীনপন্থীরাও এঁদের সংস্কার মূলক আন্দোলনকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করতেন না।

* * *

আমাদের রাণী রাসমণি ছিলেন এই প্রাচীন পন্থীদের অন্যতমা। তাই প্রতিমায় পূজা, গুরুবরণ, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রচলিত ও

অন্যান্য নিত্য আচরিত প্রথা দ্বারা তিনি তাঁর অন্তর্জীবনের আবাল্য উদ্দীপ্ত প্রকৃতির অতলস্পর্শী ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রভাবে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রাথমিক যজ্ঞের সূচনা করেন, যার পরিসমাপ্তি ঘটে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আগমনে। বাহ্যিক আচার-নিয়ম ছাড়াও অতঃপর স্থান নিল উপলব্ধি ও অনুভূতি,—যা হিন্দুধর্মের অচ্ছেদ্য অংশ এবং হিন্দুধর্মের প্রাণ। এইভাবেই রক্ষা পেয়েছিল সনাতন হিন্দুধর্ম।

* * *

"ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—ধর্মকে রক্ষা করতে ভগবানকেই নররূপে আবির্ভূত হতে হয়; আপন সৃষ্টিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, আপন সর্বজয়ী শক্তি নিয়ে স্রষ্টাকেই বিশ্বলীলায় এক মূর্ত আকার ধারণ করতে হয়—গীতায় এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যুগ প্রয়োজনেই শ্রীভগবানের আগমন; সনাতন ধর্মরক্ষার জন্যই ঈশ্বরের আগমন নররূপে,—নরনারীর মধ্যে খুব গোপনে শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্বেও মুসলমান ধর্মের অপপ্রয়োগের প্রাবল্যে বিপন্ন হয়েছিল হিন্দুধর্ম; অনগ্রসর হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হ'য়ে আত্মরক্ষায় উৎসাহী ছিল; এই সময়েই সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য ভক্তরূপে ভগবানের আগমন ঘটেছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে।

ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও। খৃষ্টান ধর্মের অপপ্রয়োগের প্রাবল্যে যখন উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাহীন, যখন রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ প্রখ্যাত ধর্মসংস্কারকগণও তাঁদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে সম্পূর্ণ সফলতা অর্জনে ব্যর্থ, তখন 'ধর্মসংস্কারে'র বদলে 'ধর্মসংস্থাপনে'র সঠিক নির্দেশ পাওয়া গেল ভক্তরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ভীক কণ্ঠে। উচ্চ শিক্ষিতদের মাঝে নিরক্ষর মূর্খ সেজে ভগবানের পুনরায় অবতরণ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সর্বধর্ম সমন্বয় কল্পে—লোকশিক্ষার মাধ্যমে। যে উদ্দেশ্যে দু'-বার ঈশ্বর এলেন দুটি বিভিন্নরূপে, সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফলতা লাভ ক'রেছিল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেবলমাত্র হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্যই কেন বারে বারে ভগবান অবতীর্ণ হন এই ভারতবর্ষে! এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় যে, হিন্দুধর্মই জগতের আদি ও সনাতন ধর্ম; 'সনাতন' অর্থে চিরস্থায়ী বা নিত্য এবং 'সনাতন ধর্ম' অর্থে "বেদোক্ত ধর্ম।" সুতরাং এই সনাতন ধর্মকে আঘাত করলে, পরবর্তীকালের অন্যান্য ধর্মও বিপন্ন হয়। সেজন্য ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের স্বার্থেই এই বেদোক্ত সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইস্‌লাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি সব ধর্মই উদারতায় পূর্ণ; কিন্তু কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপের ফলে, বা ঐ সব

ধর্মের অপপ্রয়োগের দরুন সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন বিপন্ন হয়, তারসঙ্গে অপর ধর্মগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবতারপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি কেবলমাত্র একটি জাতি বা ধর্মকে রক্ষার জন্যই আসেন না; তাঁর আগমনের ফলে বিশ্বের যাবতীয় ধর্মই রক্ষা পায় এবং নিজ নিজ পথে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং, সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার অর্থই হল—জগতের সকল ধর্মকে সুপথে চালিত করা। আবার, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে দেশের মুনি—ঋষিরা ঈশ্বরীয় অনুসন্ধানে এত অগ্রসর ছিলেন, যা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি। এই অনুসন্ধানের ফলেই, ভারতীয় মুনি—ঋষিগণ ভগবানের অস্তিত্ব ও অবতাররূপে তাঁর আগমনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বারে বারে পেয়েছেন এবং এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসাবেই এই ভারতবর্ষই বারে বারে অবতারপুরুষকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। অন্যান্য দেশেও যদি ভারতবর্ষের মত 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' বিষয়ক গবেষণা করা হত, তবে সে ক্ষেত্রে তাঁরাও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সফলতা অর্জন করতেন। যে মাটিতে চাষ হয়, সেই মাটিতেই ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্যত্র নয়। ভারতীয় ঋষিগণের অনুসন্ধান বা গবেষণার ফলেই ভারতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত 'গীতা'র সন্ধান পাওয়া গেছে, যা আধ্যাত্মিক জগতের একটি পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান'। 'বিজ্ঞান' কখনই অনুমান-নির্ভর নয়, সম্পূর্ণ প্রমাণ-নির্ভর। আমাদের 'গীতা' সেই প্রমাণভিত্তিক 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান'।

* * *

একথা অনস্বীকার্য, সেই সংকটকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনেই সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা পেয়েছিল, আর তাঁর আগমন ঘটবে বলেই দৈবাদিষ্টা হয়ে মহিমময়ী রাণী রাসমণি সেই প্রস্তুতিপর্বের নিয়ন্ত্রারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জাতির ঘোর দুর্দিনে ধর্মকে রক্ষার জন্য সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্বধর্ম সমন্বয়-যজ্ঞে'র প্রধান রূপকারিনী ছিলেন এই রাণী রাসমণি। তিনি যে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন, সেই ক্ষেত্রটির ফসলরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাই রাণী রাসমণিকে বাদ দিলে, আধুনিক 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা'র গোড়াপত্তনের ইতিহাস থাকে অসম্পূর্ণ এবং রাণী রাসমণিও তাঁর প্রাপ্য ও যোগ্য সম্মান থেকে হন বঞ্চিতা,—যা সমগ্র জাতির কাছে লজ্জাকর ও অপরাধমূলক কাজ।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জাতিকে রক্ষা ক'রেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়ে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছেন এই মহিয়সী রাণী রাসমণি। আবার, রাণী রাসমণির প্রচ্ছন্ন ভাগবতী শক্তির পুণ্যফলের মাধ্যমেই বিশ্বভূত সত্ত্বা ও বিশেষ ব্যক্তরূপ নিয়ে নরদেহে প্রকট হয়েছিলেন পরমেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হবে ব'লেই প্রস্তুতিপর্বের জন্য রাণী রাসমণির সর্বাগ্রে আবির্ভাব ; এক্ষেত্রে, উভয়ের জীবনই পরোক্ষভাবে পরস্পরের পরিপূরক—একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই।

॥ ৩ ॥

মা-জগদম্বার অষ্টসখীর অন্যতমা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ-তৃতীয় খণ্ড, গুরুভাব-পূর্বার্ধ পঞ্চম অধ্যায়—স্বামী সারদানন্দ)। রাণী রাসমণি সম্পর্কে ঠাকুরের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

মা-জগদম্বার এই 'সখীতত্ত্ব' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য ও ভক্তিসাধনার অন্যতম প্রথিতকীর্তি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি-ভারতী-ভাগিরথী মহোদয় তাঁর 'লোকমাতা রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৫) শাস্ত্রসম্মতভাবে যা বিশ্লেষণ করেছেন, সেটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে হুবহু উল্লেখ করা হ'ল ঃ—

"রাণী রাসমণি মায়ের অষ্টসখীদের অন্যতমা। তাঁহার এই স্বরূপটি কেমন ? বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধারাণী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি-স্বরূপিনী। ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী এবং সুদেবী—এই আটজন তাঁহার অষ্টসখী। পরমপুরুষ এবং পরমা বা মূলা প্রকৃতি উভয়ের অভেদত্বে প্রমূর্ত্ত অখিলরসামৃত মূর্তিই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সখীগণকে নিজাভীষ্টস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াই মূলা প্রকৃতির সহিত লীলায়িত শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য অদ্বয়রসে আস্বাদন করিতে হয়। এই আস্বাদনটি মানবজীবনের পক্ষে পরম প্রয়োজন এবং ইহাতেই মানবজন্মের সার্থকতা ঘটে।"

"মাতৃভাবের সাধনার ধারাও ইহাই। পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি এই দুইয়ে মিলিয়াই সদানন্দময়ী বিশ্ববিধাত্রী জননীর সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধের উজ্জীবন ঘটে। সখীগণ মায়ের কায়ব্যূহস্বরূপিনী। ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই মায়ের সন্তানস্নেহ অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করে। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কত ? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। মায়ের সখীগণও কোটি কোটি। তিনি কোটি-পরিবৃতা। এই কোটি সখীর মধ্যে ৬৪ জন প্রধানা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আবার আটজন প্রধানতমা। তাঁহারা হইলেন—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রানী, চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী। এই আটজন প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মাতৃগণের সমষ্টি স্বরূপিনী। মা হইলেন নিঃশেষ-দেবগণের সমূহ-মূর্তি ! গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।' দেবগণের শক্তি ব্যূহরূপে আমাদের মন, বুদ্ধি এবং অহংকারকে

আবৃত করিয়া রহিয়াছে। এই শক্তি নিঃশেষিত হইলে, তবে আমরা অদ্বয় চিন্ময় আনন্দের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হই। আমাদের সহিত সমাত্মসম্বন্ধ উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যেই অসুরনাশিনী, দনুজদলনীরূপে মায়ের খেলা শুরু হয়। মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। প্রকৃতপক্ষে মায়ের শুভঙ্করী নিত্যস্বরূপের বীর্য্য এবং মাধুর্য্যই এই রূপের মধ্যে সত্য এবং নিত্যভাবে বিরাজ করে। সন্তানকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইবার জন্যই তাঁহাকে উন্মাদিনী হইতে হয়। ডাকিনী যোগিনীগণ তখন তাঁহার সঙ্গিনী। মায়ের এমন প্রগাঢ় মমতার তাপ আমরা বুঝিতে পারিনা, উপলব্ধি করিতে পারিনা আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের ভাবটি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রুদ্রারূপে মায়ের এই খেলাটির তত্ত্ব ভেদ করিবার জন্য আমরা জ্ঞানবিচারে প্রবৃত্ত হই।"

"প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি রুদ্রারূপে আমাদের অনুভূতিতে জাগিয়াছিলেন—তিনিই নিত্যা, গৌরী এবং ধাত্রীস্বরূপে উজ্জল তাঁহার মুখের মাধুরীতে শারদ-চন্দ্রের জ্যোৎস্না-ধারা ছড়াইয়া আমাদের কাছে প্রকটিত হন। সন্তান 'সুখায়ৈ সততং নমঃ' বলিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করে। এই অবস্থায় সখীগণ—পরিবেষ্টিতা মায়ের মূর্তিটি কেমন? মাতৃমাধুর্য্যের সমূহরূপিনী ইঁহাদের আচরণই বা কিরূপ? দেবীভাগবতে বেদব্যাসের উক্তিতে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার মুখে আমরা ব্রহ্মলোকের ঊর্ধে মায়ের চিন্তামণি ভূমিময় ধামে অষ্টসখী পরিসেবিতা মায়ের লীলার পরিচয় পাই। মহামুনি বেদব্যাস এই আটজনকে মায়ের দূতী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সখী এবং দূতী এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, সেবিকাস্বরূপে মায়ের সেবাতে নিযুক্ত থাকাই দূতীগণের স্বভাব। ইঁহারা কেহ মাকে তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে তৎপরা থাকেন. কেহ-বা সুধাপূর্ণ পানপাত্র হস্তে লইয়া মায়ের সেবার জন্য অপেক্ষা করেন; কেহ তাম্বুলপাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কেহ ছত্র, চামর ধারণ করিয়া সেবা করেন; কেহ আয়না, কেহ কুঙ্কুম লইয়া অপেক্ষা করেন, কেহ-বা পাদসংবাহনরতা রহেন। ইঁহাদের নাম অনঙ্গরূপা, অনঙ্গমদনা, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবন-পালিকা, সর্ব্বশিশিরা, অনঙ্গবেদনা এবং অনঙ্গমেখলা। ইঁহারা সকলেই মায়ের কার্যে সর্ববিধ কুশলসম্পন্না। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তবিদ্‌গণ উল্লিখিত আটজনের সহিত তাঁহাদের সাধ্যস্বরূপ সর্বোত্তম সারতত্ত্বের সম্পৃক্ত ভাবটির অদ্বয় চিন্ময়রসে ব্যূঢ়ত্ব রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিবেন। এই মাধুর্য্যরসের সংস্পর্শেই ভগবৎ-প্রীতি আমাদের অন্তরে পরিস্ফূর্তি লাভ করে।"

"প্রকৃত প্রস্তাবে রাণী রাসমণি মাতৃশক্তির বিগ্রহস্বরূপিনী—মাতৃশক্তির সমূহ-মূর্তি। আমাদের জন্য মায়ের মায়াই তাঁহার জীবনে আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমূহবীজই আবার মায়াবীজ। আমাদিগকে এই সত্য অন্তর দিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মায়ের সন্তান আমরা। আমরা মাকে পাইলে বিশ্বজগৎ মাকে পাইবে। অপ্রাকৃত ধামে মায়ের সখীদের লীলার পরিচয় আমরা পূর্বে

দিয়াছি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহাদের সংযোগের কথা বলিয়াছি; কিন্তু প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের, অন্যকথায় আমাদের এই জগতের সহিত মায়ের সখীগণের সম্বন্ধ কি, এইটি আমাদের জানা দরকার। তাহা হইলেই বিশ্বজগতের কল্যাণের মহাব্রত লইয়া মায়ের সখী বা দূতীস্বরূপ রাণী আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার এই স্বরূপের পরিচয় পাইব।"

অতঃপর ঐ গ্রন্থেরই একস্থানে (পৃঃ—১৪২) উল্লেখ করা হয়েছে ঃ— "প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সর্ববিধ দুর্গতির কারণ এই যে, আমরা মাকে ভুলিয়াছি। কিন্তু আমাদের জন্য মায়ের কাজ প্রতিনিয়ত চলিতেছে, চলিতেছে প্রতিব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার সখীদের দ্বারা। বস্তুতঃ সখী আর দূতী একই। সখীগণ সর্বভাবে মায়ের সহিত সমধর্মবিশিষ্টা। বিশ্বজননী নিজেই সখীরূপে বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য নিজের স্নেহ-সম্পর্কটি জাগ্রত রাখিতেছেন, রাখিতেছেন নিজবীজে নিজের অব্যবহিত একত্বে।"

পরিশেষে ঐ গ্রন্থেই (পৃঃ—১৫১) রাণী রাসমণির মাতৃস্নেহের ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে—"এইভাবে বাংলাদেশে শক্তি-সাধনায় মায়ের প্রেমের খেলাকেই প্রমূর্ত্ত এবং পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলাই রাণী রাসমণির জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য অবদান। তিনি তাঁহার জীবন-সাধনায় এবং আদর্শে শক্তিসাধনার অপভ্রংশ-জনিত অনেক জটিল গ্রন্থি হইতে বাংলার সমাজ-জীবনকে মুক্ত করিয়াছেন, ধরাইয়া দিয়াছেন তিনি সোজাসুজি মাকে। অব্যবহিত একাত্মতায় মাতৃভাবের স্বভাবধর্ম আমাদের জীবনে নিষ্ঠিত করার মধ্যে তাঁহার সাধনার বীর্য্য এবং মাধুর্য্য নিহিত ছিল। সেই বীর্য্য এবং মাধুর্য্যে ক্লৈব্যনাশিনী এবং কামরূপিনী মা বাঙালীর চিত্তে জাগিলেন, বাঙালীকে বল দিলেন। বাংলায় নবযুগের উদ্বোধন ঘটিল। মায়ের এই মাধুরী এবং চাতুরী পরবর্তীযুগে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

* * *

মহাসাধিকা রাসমণি দেবীর জীবনের আলোচনাসূত্রে তাঁর অলৌকিক সত্ত্বার পরিচিতির জন্যই বিশদভাবে শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেনের ন্যায় এই বিষয়ে এত সুন্দর ও সরল ব্যাখ্যা আর কোথাও পাইনি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে রাণীমা ছিলেন ৺মা জগদম্বার অষ্টসখীর একজন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি। ঠাকুরের এই উক্তিগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্য প্রথমেই রাণীমা'র সেই দেবী-সত্ত্বার ব্যাখ্যা সংগ্রহ করার পর, এবার আমরা তাঁর মানবী-সত্ত্বার ঐতিহাসিক জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিত হবো।

॥ ৪ ॥

পিতৃকুল, জন্ম ও বাল্যজীবন

রাণী রাসমণির পিতৃবংশ পরিচিতি দেওয়ার আগে, প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন কোন গ্রন্থে রাণী রাসমণির পিতৃকুলকে 'কৈবর্ত্য-বংশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে ! এই বিষয়ে রাণী রাসমণির প্রবীণ বংশধর, শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয়* বলেন, 'চলিত 'কৃষি-কৈবর্ত্য' ভাষাটির জন্য কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ রাণী রাসমণিকে "কৈবর্ত্য জাতীয়া' ব'লে উল্লেখ করলেও, প্রকৃতপক্ষে রাণীর পিতা ছিলেন 'মাহিষ্যবংশীয়'। কৈবর্ত্য সম্প্রদায়কে 'মৎসজীবি' ও মাহিষ্য সম্প্রদায়কে 'কৃষিজীবি' রূপে অভিহিত করা হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণ পৃথক ব'লে তাঁদের মধ্যে বিবাহাদিও হয় না। উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই তৎকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুর চাইতে অনুন্নত ছিলেন এবং পণ্ডিত রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব' অনুযায়ী পরবর্তীকালে শূদ্ররূপে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার রাণী রাসমণি একদা উৎপীড়িত ধীবর সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন ক'রে তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ফলে, অনেকেই রাণী রাসমণিকে ধীবর বা জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ সম্পূর্ণ ভ্রমবশতঃ চিহ্নিত করতেন। কিন্তু কৈবর্ত্য ও মাহিষ্য যে দুটী পৃথক সম্প্রদায়, এই প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না বা এখনও অনেকে অবহিত নন। তাছাড়া, মাহিষ্য সম্প্রদায়কে যে রঘুনন্দন শূদ্রজাতিতে পরিণত ক'রেছিলেন, এ তথ্যও অনেকে জানেন না।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে রাণী রাসমণিকে 'কৈবর্ত্য' ব'লে উল্লেখ করলেও, পরবর্তীকালে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা"-গ্রন্থের ২য় খণ্ডে রাণী রাসমণিকে 'মাহিষ্য' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীদাসের উপরোক্ত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'মাহিষ্য সম্প্রদায়' ও 'শূদ্রবর্ণ' সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

* * *

'মাহিষ্য সম্প্রদায়' সম্পর্কে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অভিমতগুলি প্রণিধান-যোগ্য। অতি সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

পুরাণ ও মহাভারতের মতানুযায়ী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তির সূত্র—তাঁরা 'চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।' পরবর্তীকালে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ

---

* রাণী রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির প্রপৌত্র, দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের ভূতপূর্ব ট্রাষ্টি ও বর্তমান সেবায়েত, এবং আশীর উর্ধ-বয়স্ক প্রবীণ আইনজীবি শ্রীআশুতোষ দাস,—বি, এল।এই গ্রন্থে মাঝে মাঝেই তাঁর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর প্রদত্ত পারিবারিক তথ্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।—লেখক

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসও তাঁর 'ভারত বিবরণ'-গ্রন্থে সমগ্র বঙ্গবাসীকে একমাত্র 'কলিঙ্গ জাতি' নামে উল্লেখ ক'রেছেন ; কারণ, তাঁরা সকলেই চন্দ্রবংশীয় রাজা মহিষ্মাণের বংশধররূপে "মাহিষ্য' নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় অপর রাজা বলি তাঁর পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্রের মধ্যে তাঁর নিজের রাজ্য ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন এবং সেই পুত্রগণের নামানুসারেই এই পাঁচটি দেশ গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পুণ্ড্রদেশ 'গৌড়' নামে পরিচিত হয় এবং ভারত বিভাগের পূর্বে অঙ্গদেশের কিছু অংশ বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গদেশের কিছু অংশ নিয়ে বৃহৎ বঙ্গদেশ গঠিত হয়। (বর্তমানে অবশ্য এটি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত)। কিন্তু তৎকালীন প্রবল পরাক্রান্তশালী রাজা কলিঙ্গের নামে বঙ্গের সমগ্র মাহিষ্যগণের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'কলিঙ্গ জাতি' নামে পরিচিত হয়। এই জন্যই মেগাস্থিনিস সমগ্র দেশবাসীকে 'কলিঙ্গ জাতি' ব'লেই উল্লেখ ক'রেছিলেন। এই সব মাহিষীবংশীয় মাহিষ্যক্ষত্রিয়গণ, জগৎপ্রসিদ্ধ মাহিষ্য-রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের রাজত্বকাল থেকে কৃষিকর্ম ও গোপালন করতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী এই কলিঙ্গজাতিই বর্তমানকালের মাহিষ্যগণের পূর্বপুরুষ ছিলেন। এই কলিঙ্গী বা কলিঙ্গ জাতির বাসস্থান বঙ্গ ও উড়িষ্যায় ছিল, যদিও বর্তমানে এই 'কলিঙ্গী' নামে কোন জাতি নেই। মেগাস্থিনিস্ সমুদ্রতীরবর্তী গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্রহ্মের পশ্চিমে এবং গোদাবরী নদীর পূর্বে একমাত্র মাহিষ্য বা কলিঙ্গ জাতিকে বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ছাড়াও রাজকার্যে ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন।

বঙ্গদেশে এবং কলিঙ্গ রাজ্যে বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়গণকে ঋক্‌বেদে যে মণ্ডলপতি, জনপতি এবং বিশপতি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, তা একমাত্র মাহিষ্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে নেই। এই ক্ষত্রিয় কলিঙ্গ জাতিই যে বর্তমান মাহিষ্যগণের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন, তার বিশেষ প্রমাণ হ'ল তাঁদের মধ্যে প্রচলিত উপাধিগুলি। ঋক্‌বেদে বর্ণিত তৎকালীন উপাধিগুলি বর্তমানে কিছু মৌলিক ছাড়া অধিকাংশই অপভ্রংশ হয়ে অন্য নামে পরিচিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়—

পূর্ব উপাধি	বর্তমান উপাধি
১ সামন্ত চক্রের অধিপতি 'সামন্ত রাজ' বা 'সামন্ত রায়'	১। সাতরা বা সামন্ত
২। দিগ্বিজয়ী রাজগণ 'মহারাণা'	২। মান্না
৩। মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী 'মহাপাত্র'	৩। মহাপাত্র
৪। অন্যান্য মন্ত্রী 'পাত্র'	৪। পাত্র
৫। বিচার পরিষদের প্রধান 'মণ্ডলেশ্বর'	৫। মণ্ডল
৬। বিচার পরিষদের সাহায্যকারী 'ধারক'	৬। ধর, ধারা বা ধাড়া

পূর্ব উপাধি	বর্তমান উপাধি
৭। নগররক্ষাকারী 'নগরপাল'	৭। পাল
৮। জমি রক্ষাকারী 'ক্ষেত্রপাল'	৮। খাটুয়া
৯। শাসন কাজের সহায়ক 'শাসনমল্ল'	৯। শাসমল
১০। সরকারী ভবন রক্ষাকারী 'প্রতিহার'	১০। পড়েল
১১। সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক 'সেনাপতি'	১১। সেনাপতি
১২। এক হাজার সৈন্যের অধিপতি 'হাজরা'	১২। হাজরা
১৩। একশো সৈন্যের অধিপতি 'সেনানায়ক'	১৩। সেনানায়ক, সেন, সেনা ও সেনী
১৪। পঁচিশ জন সৈন্যের পরিচালক 'নায়ক'	১৪। নায়ক
১৫। নায়কের সাহায্যকারী 'পট্টনায়ক'	১৫। পট্টনায়ক
১৬। হস্তীবাহিনীর সেনাপতি 'গজপতি'	১৬। গজেন্দার, গজেন্দ্র
১৭। হস্তীবাহিনীর সৈন্যগণ 'হস্তিশূর'	১৭। হাতি, হাইত ও হাটি
১৮। অশ্ববাহিনীর অধিনায়ক 'ঘোড়পতি' বা 'ঘোড়পাণ্ডে'	১৮। ঘোড়ফড়ে, ঘোড়াই, ঘোড়া
১৯। কুঠারধারী সৈন্যগণ 'কুঠারী'	১৯। কুটী, কুঁইতি, কুতিরূপ
২০। রাজার আদেশ পাঠে 'পাঠক'	২০। পড়ুয়া বা পাড়ুই
২১। রাজার আদেশ প্রচারে 'বাগ্মী'	২১। বাগ
২২। রাজার দেহরক্ষী 'বীররায়'	২২। বেরা বা বেহারা
২৩। রাজ্যরক্ষা বাহিনীর 'দলপতি' বা 'দালাই'	২৩। দলুই
২৪। রাজ দরবারের মহৎ কর্মচারী 'মহোত্তর'	২৪। মাইতি
২৫। হিসাবাদি লেখক 'পুরকায়স্থ'	২৫। পুরকাইত

(রাজকার্যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, সেই সব সাধারণ মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণেরও নানাপ্রকার পদবী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন 'দাস।' শ্রীভগবদ্ভক্তির 'দাস্য' মন্ত্রে দীক্ষিত মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দাস জ্ঞান করতেন এবং নামের শেষে 'দাস' পদবী ব্যবহার করতেন। রাণী রাসমণির পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল এই 'দাস' পদবীভুক্ত ছিলেন। অবশ্য অন্যান্য অনেক

'অ-ব্রাহ্মণও' 'দাস' পদবীতে ভূষিত আছেন বা তাঁদের বর্তমান কোন কোন পদবীর সঙ্গে মাহিষ্যগণের পদবীরও মিল আছে, যদিও তাঁরা মাহিষ্য নন।)

মাহিষ্যদের এ রকম উপাধি অনেক আছে, যাঁরা পূর্বে ক্ষাত্রিয় এবং শাসক জাতি ছিলেন। ক্ষাত্রবীর্যে শক্তিশালী মাহিষ্যগণকে অবনত করার উদ্দেশ্যে, পরবর্তীকালে বাংলার সুচতুর সুলতান সৈয়দ হোশেন শাহ, পণ্ডিত রঘুনন্দনের দ্বারা কৌশলে অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব রচনা করান, যাতে বিধান থাকে যে, বঙ্গদেশে আর ক্ষাত্রিয় এবং বৈশ্য সম্প্রদায় থাকবে না ; কেবল মাত্র দুটী সম্প্রদায় বা বর্ণ থাক্‌বে—একটি 'ব্রাহ্মণ' ও অপরটি শূদ্র'। এইভাবে রঘুনন্দনের কলমের খোঁচায় মুসলমান রাজত্বে ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই শূদ্ররূপে পরিণত হন* এবং গীতায় নির্দিষ্ট বর্ণচতুষ্টয়কে উপেক্ষা করা হয়।

* * * *

শাস্ত্রমতে 'শূদ্রবর্ণ' সম্পর্কে জানা যায় যে, গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলেছেন, 'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করেছি।' টীকাকারগণ বলেন যে, 'গুণ' বল্‌তে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ বোঝায়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ—তাঁদের কাজ অধ্যাপনাদি ; অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট রজঃ প্রধান ক্ষাত্রিয়—তাঁদের কাজ যুদ্ধাদি ; অল্প তমোগুণবিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্য—তাঁদের কাজ কৃষি-বাণিজ্যাদি, তমঃ প্রধান শূদ্র—তাঁদের কাজ অন্য তিন বর্ণের সেবা করা। এই ভাবেই গুণানুসারে কাজের ভাগের দ্বারা চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচকগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—প্রাচীন বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ছিলনা। পরবর্তী বৈদিক যুগে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কর্মভেদের প্রয়োজনে এটির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ এই বর্ণভেদও বংশগত ছিলনা,—কর্মগত ছিল। এক পরিবারের কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষাত্রিয়, কেউ বৈশ্য বা কেউ শূদ্রের কাজ করতেন। পৌরাণিক যুগে সেটি বংশগত হয়েছে। মূলতঃ জাতিভেদ বংশগত নয়—গুণ ও কর্মগত।**

'পদ্মপুরাণের স্বর্গ খণ্ডে' উল্লিখিত আছে যে, একদা সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা, মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যখন জন্মের পূর্বে কর্ম সম্ভব নয়, তখন ভগবান কিভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে ছোট বড় ক'রে মানব সৃষ্টি করলেন। তার উত্তরে নারদ বলেন যে, পূর্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্মদ্বারা বর্ণপ্রাপ্ত হয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ ধর্ম ত্যাগের জন্য ক্ষাত্রিয় হন। যাঁরা গোপালনে বা কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, স্বধর্ম ত্যাগের জন্য তাঁরা বৈশ্য হন। আর যাঁরা সকলপ্রকার কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন ক'রেছিলেন, তাঁরা শূদ্ররূপে পরিগণিত হন।

* **শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার কবিরত্ন রচিত 'বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস' অবলম্বনে।**

** **গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' অবলম্বনে।**

আবার, 'মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত অজাগর পর্বে' উল্লেখ আছে—সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, অনৃশংসতা, তপস্যা ও (পাপকে) ঘৃণা—এই সবগুণ যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। জন্মগত শূদ্র হলেও শূদ্র হয়না, অথবা ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণ হয়না। যাঁর মধ্যে ঐ সবগুণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং উক্তরূপ আচরণ না থাক্‌লে তিনি শূদ্র।

আধুনিক কালে মানবজাতির জন্ম ও বর্ণতত্ত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা স্মরণ করা যেতে পারে। স্বামীজী বলছেন—"সত্ত্ব, রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে, কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহার মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হওয়ার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে।…একটা লোক যখন চাকরী করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু'পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য। আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ।"

(স্বামীজীর বানী ও রচনা, নবম খণ্ড,—পৃষ্ঠা ৪১০)

স্বামীজীর দর্শন অনুযায়ী, শূদ্রও কর্মের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারী। সুতরাং তথাকথিত শূদ্রানী রাসমণি দেবীকে আমরা শাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনের মাধ্যমেই তাঁর 'ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন সত্ত্বাকে' মর্যাদা দিতে যেন কার্পণ্য না করি। রাণী রাসমণির জাতি, বর্ণ সম্পর্কে নানালোকে নানা প্রশ্ন তোলায়, তাঁর প্রকৃত পরিচয়টি এখানে বিবৃত হল।

এই জাত-পাতের বিষয়ে সকলক্ষেত্রেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমূল্য উক্তিটি স্মর্ত্তব্য। ঠাকুর বলছেন—"এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়ে যায়।…ভক্তি না থাক্‌লে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাক্‌লে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাক্‌লে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।"

(কথামৃত—৫ম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

এই বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত কথা, পরমভক্তিমতী, মহাসাধিকা রাণী রাসমণি দেবী সম্পর্কেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

রাণী রাসমণির জাতি পরিচিতির বিষয়ে আর বেশী অন্য আলোচনা না ক'রে, এবার তাঁরই বংশের আর একজনের অভিমত জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব, যেমন শুরু ক'রেছি তাঁর অন্যতম বংশধর-শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাসের বিবরণ দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে রাণী রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর অন্যতম বংশধর (প্রপৌত্র কিরণকুমারের পুত্র), বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ দেবপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ.; পি. এইচ. ডি (লণ্ডন), মহাশয়ের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ লিখিত বিবরণটি প্রকাশ করা হ'ল ঃ—

"এই মহিয়সী নারীর জাতি নিয়ে বিতর্ক আজ নিতান্তই অবান্তর হতে পারত। কিন্তু এই প্রসঙ্গ আজকের দিনেও তুলতে হচ্ছে এই কারণে যে, হিন্দু সমাজ আজও জাতপাতের লজ্জাজনক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ রয়েছে এবং বিশেষতঃ রাণীর অক্ষয় পুণ্য কীর্তি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় প্রচণ্ড বাধা এসেছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের থেকে তাঁর জাতির প্রশ্নে। পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছিলেন, তিনি শূদ্রানী এবং সেজন্য মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁর অধিকার নেই। ঠিক এই ধরণের অর্বাচীন আপত্তি পরবর্তীকালে তোলা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যাপারে, কারণ তিনি কায়স্থ অর্থাৎ শূদ্র এবং সে কারণে সন্ন্যাসে তাঁর অধিকার নেই। এখন প্রশ্ন, রাণী কি সত্যই শূদ্রানী ছিলেন? আমরা জানি যে, তিনি মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ছিলেন। সুতরাং বিচার করতে হবে মাহিষ্যরা শূদ্র কিনা!

প্রথমতঃ এটা ঠিক যে, মাহিষ্যদের মধ্যে অনেকেই কৃষিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্রানুযায়ী কৃষি বৈশ্যের কাজ, শূদ্রের নয়। তাছাড়া, কৃষিজীবি-ভারতবর্ষে আবহমানকাল কৃষিতে সকল সম্প্রদায়েরই মানুষ কম বেশী লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং কৃষিকাজ শূদ্রত্বের কোন অভ্রান্ত প্রমাণ নয়। তা না হলে, রাজর্ষি জনককে শূদ্র ব'লে স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি আমরা ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করি, তা হলেও দেখব, মাহিষ্যরা প্রকৃতপক্ষে 'শস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয়'। আজকের দিনেও সৈনিকবৃত্তি নির্দেশক যত পদবী মাহিষ্যদের মধ্যে আছে, তা আর কোন বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। যথা—সামন্ত, সেনাপতি, রাণা, নায়ক, খাঁড়া, হাজরা, মল্ল, ইত্যাদি। এই ধরণের পদবী আবার বিশেষ ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাহিষ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেখানে গ্রীক ঐতিহাসিকদের দ্বারা বর্ণিত বিখ্যাত গঙ্গারিডিদের (গঙ্গাহৃদি) রাজত্ব ছিল এবং যাদের পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর বিবরণ শুনে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে সাহস পাননি। অনুমান করলে বোধ হয় খুব ভুল হবেনা যে, এই গঙ্গারিডি সেনাদের অধিকাংশই ছিলেন পরবর্তীকালের সৈনিকবৃত্তিধারী মাহিষ্যদের পূর্বপুরুষ।

তৃতীয়তঃ, আমাদের শাস্ত্র-পুরাণাদি পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়দের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল, ব্রাহ্মণদের রক্ষা ও প্রতিপালন করা। ভারতের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা যদি আমরা মনে রাখি, তা হলে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে যে, অতি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশ জাত ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষায়িত্রী রাণী রাসমণির পক্ষে কি শূদ্রানী হওয়া সম্ভব?

চতুর্থতঃ, মহাভারতের বনপর্বে অজগররূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির যা বলে ছিলেন[৪], এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা ব'লেছিলেন ("চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"), তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, মানুষের বর্ণ,—গুণ ও কর্মের ওপর নির্ভর করে,

৪. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—লেখক।

জন্মের ওপর নয়। রাণী রাসমণির জীবন ও চরিত্র আলোচনা করলে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরানুরাগ, দয়া, তেজ ও প্রখর বাস্তববুদ্ধি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুণই দেখা যায়, শূদ্রোচিত কোন গুণই দেখা যায় না।

এই সব প্রমাণ ও বিশ্লেষণের আলোকে রাণীকে শূদ্রাণী বলা মূর্খের কাজ হবে।"

* * *

উপরোক্ত সত্যকে স্বীকার ক'রে, এবার আমরা এই মহিয়সী বঙ্গললনা, তথা ভারতললনার পিতৃকুল, জন্ম ও বাল্যজীবন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি সমৃদ্ধ আলোচনার পথে অগ্রসর হবো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্বকূলে প্রসিদ্ধ হালিসহরের কাছেই 'কোনা' একটি গণ্ডগ্রাম। বহুকাল আগে 'বাঘের খাল' থেকে 'ইছাপুর-নবাবগঞ্জের খাল' অবধি হালিসহর সেই সময় 'হাবেলিসহর পরগণা' নামে পরিচিত ছিল; পরবর্তীকালে এটি চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভূত হয়।

এই হালিসহর আগে 'কুমারহট্ট' নামে পরিচিত ছিল, যেখানে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেনের বাস্তুভিটা। ভক্ত রামপ্রসাদের প্রাণের টানে জগজ্জননী এইখানেই তাঁর কন্যার বেশে আবির্ভূতা হয়ে ভক্তের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই হালিসহরের সঙ্গে ভক্ত রামপ্রসাদের নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং রামপ্রসাদী গানের অপূর্ব ভাবমণ্ডিত সুর প্রতিটি ভক্তের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন—'রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে'।

এই কুমারহট্ট বা হালিসহরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, যেখানে মহাপ্রভু নিজে এসে প্রেমরসে কীর্তনানন্দে মগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর গুরুদেবের জন্মস্থান থেকে মাটি তুলে তিলক ধারণের উদ্দেশ্যে কৌপীনে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'ঈশ্বরপুরীর ডোবা' নামে সেই পবিত্র স্থানটি এখনও বর্তমান।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মস্থানও এইখানে। মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীবাস,—নবদ্বীপ থেকে এখানে এসে বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং সেই বাসস্থানেও মহাপ্রভু পদার্পণ করেন।

আবার, হালিসহরের লাগোয়া গ্রাম কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেন এবং তাঁর পুত্র কবি কর্ণপুর গোস্বামীও জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন।

সুতরাং, এই অঞ্চলটি সে সময় একত্রে শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবে ভাবিত ছিল, কিন্তু পরস্পর বিরোধী ছিল না।

* * *

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার এই হালিসহর সংলগ্ন 'কোনা' গ্রামেই আমাদের রাণী রাসমণি দেবীর জন্মস্থান। ১২০০ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন, বুধবার প্রাতঃকাল (১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে) এক দরিদ্র মাহিষ্যবংশের বৈষ্ণব-দম্পতির গৃহে রাসমণি দেবীর জন্ম। পিতার নাম—হরেকৃষ্ণ দাস এবং মাতার নাম—রামপ্রিয়া দেবী।

রাসমণি দেবীর পিতামহের নাম—জগমোহন দাস। তিনি একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন। তাঁরই একমাত্র পুত্রের নাম হরেকৃষ্ণ দাস এবং একটি কন্যার নাম ক্ষেমঙ্করী দেবী। এই একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছাড়া জগমোহন দাসের আর কোন সন্তানাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কোনা গ্রামেরই রামপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে হরেকৃষ্ণ দাসের বিবাহ হয়। তাই হরেকৃষ্ণ দাসের শ্বশুরালয়ও এই কোনা গ্রামেই ছিল।

হরেকৃষ্ণ দাসের মোট তিনটি সন্তান; প্রথমটি পুত্র—নাম রামচন্দ্র; দ্বিতীয়টিও পুত্র—নাম গোবিন্দ এবং তৃতীয় সন্তানটি কন্যা—নাম রাসমণি। পুত্রকন্যারা ছাড়াও হরেকৃষ্ণ দাসের সংসারে তাঁর বাল্যবিধবা নিঃসন্তান ভগ্নী ক্ষেমঙ্করী দেবীও বাস করতেন।

হরেকৃষ্ণ দাসের দুটী পুত্র সন্তানের পর বহুদিন বাদে প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁর স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী গর্ভধারণ করায়, হরেকৃষ্ণ দাস তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর সুপ্রসবের জন্য জনৈকা গ্রাম্যধাত্রীকে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে প্রসবে বিলম্ব হতে থাকায়, হরেকৃষ্ণ দাস বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং দেবতার কাছে অঘটন নিবারণের জন্য কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন। এমন সময় তাঁর বিধবা ভগ্নী তাঁকে আনন্দের সঙ্গে খবর দেন যে, তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এই সংবাদে হরেকৃষ্ণ দাস প্রতিবেশীদের পুত্রকন্যাদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনে সদ্যজাতা কন্যার শুভকামনায় দেবতার উদ্দেশে 'হরিরলুঠ' দেন এবং তাদের সমবেত কণ্ঠে হরিনামের উচ্চরোলে বাড়িটি মুখরিত হয়।

* * *

হরেকৃষ্ণ দাসও পিতার মত কৃষিজীবি ছিলেন। তাঁর দরিদ্র পিতা দারিদ্র্য ছাড়া পুত্রের জন্য আর কিছুই রেখে যাননি। হরেকৃষ্ণ দাসও তাই ছিলেন দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান। তাঁর কয়েক বিঘা ধানজমি ও কিছু বাগানে তিনি নিজেই চাষ-আবাদ করতেন এবং বাকী সময়ে ঘর তৈরীর ঘরামির কাজ করতেন। এজন্য গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি 'হারু ঘরামী' নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। এইভাবে অতিকষ্টে তাঁর সংসার চলত।

কোনা গ্রামে তাঁর বাড়িটি ছিল মাটির তৈরী এবং মাথায় খড়ের চালা। ৪ খানি ঘরের মধ্যে ২ খানি ছিল শোওয়ার ঘর, ১ খানি রান্না ও ভাঁড়ার ঘর এবং অপর খানি ছিল গোয়াল ঘর—তাতে একটি সবৎসা গাভী। বাইরে বসার জন্য একটি দাওয়া ছিল। বাড়ির পাশে দক্ষিণ দিকে ছিল একটি বাগান ও

পুকুর! বাগানে ছিল কয়েকটি ফল ও ফুলের গাছ। প্রচুর কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য যা আয় হত, তার দ্বারাই হরেকৃষ্ণ দাস তাঁর নিজ সংসারের ৬ জন প্রাণীর অতিকষ্টে কোন প্রকারে অন্নসংস্থান করতেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই বাস্তুভিটার কোন চিহ্ন নেই।)

* * *

হরেকৃষ্ণ দাস প্রকৃত ধার্মিক ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। পরোপকারী, সহৃদয়, সরল, সত্যবাদী ও সৎরূপে গ্রামে ও আশে পাশে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বিবাদে তিনি যেমন সকলের পিছনে থাকতেন, বিপদে তেমন তিনি সকলের আগেই উপস্থিত হতেন। সেজন্য পল্লীবাসীর কাছে 'হারু ঘরামী' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

এত দারিদ্রের মধ্যেও হরেকৃষ্ণ দাসের লেখাপড়ায় ছিল বিশেষ আগ্রহ। সে সময় গ্রামে তেমন শিক্ষার বিস্তার না হলেও, হরেকৃষ্ণ দাস নিজ চেষ্টায় অপরের সাহায্যে কিছু বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন। ফলে, সারাদিন কাজের পর, তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে ব'সে রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের কিছু কিছু অংশ মিষ্ট সুর ক'রে পাঠ করতেন এবং তাঁর সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাড়ার প্রতিবেশিরা তাঁর বাড়িতে দল বেঁধে এসে সেই পাঠ উপভোগ করত। এইভাবে অর্থাভাবের সংসারে স্বভাবতঃই একটি পরমার্থ পরিবেশের সৃষ্টি হত।

রাসমণি দেবীর জন্মের ৭ বছর বাদেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (১২০৭ বঙ্গাব্দে) হরেকৃষ্ণ দাসের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। রাসমণি দেবী অতঃপর পিতৃস্নেহে বড় হতে থাকেন এবং পিতার কাছেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে থাকেন। এমনকি, সংসারের কাজে পিসিমাতা ক্ষেমঙ্করী দেবীও তাঁর ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ দাসকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। শেষ বয়সে বিপত্নীক হরেকৃষ্ণ দাস কোনা গ্রাম ত্যাগ ক'রে প্রায় তিন মাইল দূরে গোলাবাড়ি গ্রামে গিয়ে বাস করতেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে (১২১১ বঙ্গাব্দে) কন্যা রাসমণি দেবীর বিবাহ দেওয়ার প্রায় ১৯ বছর বাদে (সম্ভবতঃ গোলাবাড়ি গ্রামের বাড়িতেই) হরেকৃষ্ণ দাস ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে (১২৩০ বঙ্গাব্দে) দেহত্যাগ ক'রেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ দাসের বাসস্থান সম্পর্কে শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় তাঁর 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ ক'রেছেন—"কেউ কেউ বলেন, গোলাবাড়িতেই হরেকৃষ্ণ দাসের আদি বাস ছিল এবং এখানেই তিনি বরাবর বাস করতেন। কোনায় ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। রাণী কোনায় তাঁর মাতুলালয়ে জন্মেছিলেন। রাণীর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় পিত্রালয় গোলাবাড়িতে এবং এই গোলাবাড়িরই গঙ্গার ঘাটে একদিন স্নান করবার সময় রাণী, রাজচন্দ্র দাসের চোখে প'ড়েছিলেন" (গ্রন্থটি দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের পক্ষে শ্রীগোপীনাথ দাস কর্তৃক জ্যৈষ্ঠ - ১৩৬০/জুন—১৯৫৩ প্রকাশিত)

* * *

রাসমণি দেবীর মাতা রামপ্রিয়া দেবীও খুব ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন এবং প্রকৃত অর্থে স্বামীর সহধর্মিনী ছিলেন। দেবদ্বিজে রামপ্রিয়া দেবীর অসীম ভক্তি ছিল এবং সংসারে সকল কর্তব্য পালনের মধ্যেও নানা প্রকার বার-ব্রত ও পূজাদিতে তিনি যুক্ত থাকতেন। এ ছাড়া সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট। নিজে দরিদ্র হয়েও, রামপ্রিয়া দেবী প্রতিদিন অন্ততঃ একজনকে অতিথিরূপে আহার না করিয়ে নিজে অন্নগ্রহণ করতেন না—এই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যতম ধর্মানুষ্ঠান। এই মাতৃপ্রভাব যে পরবর্তীকালে কন্যা রাসমণি দেবীকে বিশেষভাবে বিকশিত ক'রেছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

পরম কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ দম্পতি হরেকৃষ্ণ দাস ও রামপ্রিয়া দেবী যখন কোশাকোশী নিয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি, নাম-কীর্তন ও তিলক ধারণ করতেন, বালিকা রাসমণি দেবীও তাঁদের অনুকরণে তিলক ধারণ, নাম-কীর্তন প্রভৃতি করতেন, আবার কখনও-বা শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে দণ্ডায়মান হ'য়ে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে আপন মনে দেবার্চনা করতেন। এইভাবেই বাল্যকাল থেকেই রাসমণি দেবী পিতামাতার ভগবদ্ভক্তির মহাধনের প্রকৃত অধিকারিণী হন। গৃহকর্ম ও অন্যান্য বিষয়েও মাতা রামপ্রিয়া দেবী বালিকা কন্যাকে যথাযথ শিক্ষা দিতেন। মাতার অনন্ত উৎসাহের প্রেরণায় বালিকা কন্যার চিত্তে মাতৃ-প্রতিরূপ সৃষ্টি হত এবং মাতা ও কন্যার মধ্যে মাতৃযোগে একটি মধুর সম্বন্ধও স্থাপিত হত।

মাতা রামপ্রিয়া দেবীই আদর ক'রে তাঁর কন্যার নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'রাণী'। দেড় বছর বাদে তাঁর নাম রাখেন 'রাসমণি'। কিন্তু লোকে অনেক সময় তাঁর দুটি নাম একত্র ক'রে 'রাণী রাসমণি' ব'লে ডেকে স্নেহ প্রকাশ করত। পরবর্তীকালে দানশীলা ও অভয়দাত্রীরূপে তিনি জগতের কাছেও 'রাণী রাসমণি' নামে অভিহিতা হন এবং সরকারী খেতাব ছাড়াই ইতিহাসে 'রাণী রাসমণি' নামে পরিচিতা হন।

তাঁর 'রাসমণি' নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, একদিন রাত্রে তাঁর মাতা রামপ্রিয়া দেবী একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা চলছে এবং গোপীরা কৃষ্ণচন্দ্রকে ঘিরে নৃত্য করছেন। কালোরূপের সঙ্গে বিজলীর তরঙ্গ মিলে চারদিক আলোকিত ক'রে রেখেছে। এমন সময় একটি বালিকা নৃত্যরতা অবস্থায় রামপ্রিয়া দেবীর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বয়ং শ্রীভগবানের এই রাসলীলা দর্শন এবং সেই বালিকাটিকে নিজ কোলে গ্রহণ করার পরেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দিব্যানুভূতিতে তিনি ডুবে থাকেন। রাসলীলার রস-রহস্যের স্মৃতিরূপে পরবর্তীকালে রামপ্রিয়া দেবী তাঁর কন্যার নাম রাখেন 'রাসমণি'।

বাল্যজীবনে পিতার কাছে লেখাপড়া এবং মাতার কাছে গৃহস্থালী কাজ শেখা ছাড়াও রাসমণি দেবী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে নানাপ্রকার খেলাধূলাও

করতেন। তাঁদের খেলার মধ্যে প্রধান খেলা ছিল দোলনায় দোল খাওয়া। বাড়ির পাশের বাগানে একটি আমগাছের ডালে দাঁড় ঝুলিয়ে দোলনা প্রস্তুত করা হত এবং পর্যায়ক্রমে একে একে সকলেই তাতে দোল খেতেন।

কথিত আছে, একদিন বৈশাখ মাসের দুপুরে রাসমণি দেবী সেখানকার দোলনায় দুলে একটি ডুমুর গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করার সময় লক্ষ্য করেন যে, একটি ডুমুরগুচ্ছের মধ্যে দু-তিনটি ডুমুরের ফুল ফুটে আছে। রাসমণি দেবী তাঁর মাতার কাছে শুনেছিলেন যে, ডুমুরের ফুল দেখা যায় না, তবে যদি কেউ দেখতে পায়, নিশ্চয়ই ধনী ও সুখী হয়। রাসমণি দেবী তাঁর সহচরীদের কাছে এই ডুমুরের ফুল দেখার কাহিনী বিবৃত করলে, কেউই সেকথা বিশ্বাস করেনি। তখন রাসমণি দেবী তাদের নিয়ে সেখানে গিয়ে, আঙুল দেখিয়ে ডুমুর-ফুলগুলি দেখালেও তারা কিন্তু কেউই সেগুলি চাক্ষুস দেখতে পায়নি ; বরং তার জন্য রাসমণি দেবীর কথায় তাদের অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনায় রাসমণি দেবী মনে প্রচণ্ড আঘাত পান এবং ডুমুর-ফুল দর্শনের কথা বাড়িতে এসে তাঁর মাতার কাছে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। মাতা রামপ্রিয়া দেবী তখন বালিকা কন্যার কথাই বিশ্বাস ক'রে রাসমণি দেবীকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন—"মা, তুমি রাজরাণী হবে।" বলা বাহুল্য, মাতার এই আশীর্বাদ রাসমণি দেবীর জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, এই মাতৃ পরিবেশ রাসমণি দেবীর ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসমণি দেবীর বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখন তাঁর মাতা রামপ্রিয়া দেবী ১২০৭ বঙ্গাব্দে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) মাত্র ৮ দিন জ্বরে ভুগে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন।

মাতৃবিয়োগই রাসমণি দেবীর জীবনে প্রথম শোক। বয়সে বালিকা হলেও, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বপূর্ণ সংসারের একটি শাশ্বত চিত্র তাঁর মানসপটে ফুটে ওঠে। অকালে মাতৃবিয়োগের ফলে এবং হঠাৎ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বালিকার বেদনাহত-হৃদয়ে যে গভীর শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূর্ণ করার ক্ষমতা অবশ্য কারুরই ছিল না। পত্নীহারা হরেকৃষ্ণ দাস, মাতৃহারা রাসমণি দেবীকে আরও নিবিড়ভাবে স্নেহ বন্ধনে বাঁধলেও এবং মাতৃস্থানীয়া পিসিমাতা ক্ষেমঙ্করী দেবী বালিকার পরিচর্যায় আরও বেশী উদ্যোগী হলেও, রাসমণি দেবীর কোমল অন্তরের নিভৃতস্থানে এমন পটভূমির সৃষ্টি হয়, যার ফলে সহনশীলতা ও দৃঢ়তার গুণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আত্মগঠনের সুযোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে নির্ভরশীল পিতার সাহচর্য লাভ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসমণি দেবীরও ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

* * *

খুবই দুঃখের বিষয় যে রাসমণি দেবীর পিতামাতার সম্যক পরিচয় পাওয়া গেলেও, তাঁর অপর দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতা—রামচন্দ্র ও গোবিন্দের তৎকালীন বা

পরবর্তী জীবনধারা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতা রামপ্রিয়া দেবীর মৃত্যুকালীন পর্বেও এই দুই পুত্রের কোন কথাই কোথাও উল্লেখ নেই। তবে কোন কোন গ্রন্থে এইটুকু উল্লেখ আছে যে, পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ও পিসিমাতা ক্ষেমঙ্করী দেবীর মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তাঁদের একমাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী রাসমণি দেবীর কলকাতার জানবাজারের বাড়িতে কিছুদিন বাস ক'রেছিলেন; কিন্তু এরপরে তাঁদের সম্পর্কে আর কোন তথ্য কেউই দিতে পারেন নি। পূর্বে উল্লিখিত রাণী রাসমণির প্রবীণতম বংশধর শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় একদা কোনাগ্রাম পরিদর্শনকালে সেখানকার প্রাচীন ব্যক্তিদের সহায়তায় বহু চেষ্টা করেও রাসমণি দেবীর পিতৃকুল বা মাতৃকুলের কোন ব্যক্তির সন্ধান পাননি। সুতরাং, রাণী রাসমণি দেবীর ভ্রাতৃবংশের অধ্যায়টি জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

॥ ৫ ॥

রাণী রাসমণি দেবীর পিতৃবংশ তালিকা

॥ ৬ ॥
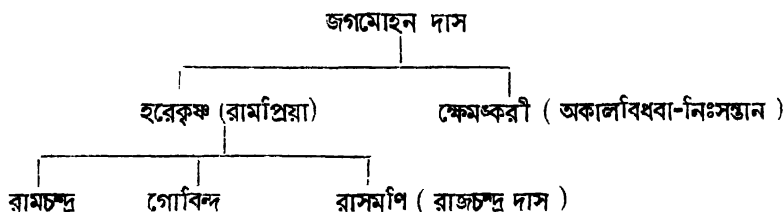
শ্বশুরকুল ও বিবাহ

কলকাতার এক প্রাচীন মাহিষ্যবংশীয় ধনাঢ্য জমিদার বাড়িতে রাণী রাসমণি দেবীর বিবাহ হয়েছিল। স্বামীর নাম শ্রীরাজচন্দ্র দাস। পরে তিনি 'রায়' উপাধি পাওয়ায়, "রায় রাজচন্দ্র দাস" নামে অভিহিত হতেন।

রাজচন্দ্র দাসের পিতামহের নাম কৃষ্ণরাম দাস এবং পিতার নাম প্রীতিরাম (ওরফে প্রীতরাম) দাস। হাওড়া জেলার খোশালপুর গ্রামে ছিল তাঁদের আদি নিবাস।

কৃষ্ণরামের ৩ পুত্র, যথা—প্রীতিরাম, রামতনু ও কালীচরণ। পলাশী যুদ্ধের চার বছর পূর্বে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (১১৬০ বঙ্গাব্দে) প্রীতিরাম জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প- বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে (১১৭৪ বঙ্গাব্দে) বর্গীর হাঙ্গামার সময়, মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রীতিরাম তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা—রামতনু ও কালীচরণকে নিয়ে হাওড়ার বাসস্থান ত্যাগ ক'রে কলকাতায় চলে আসেন এবং তাঁর পিসিমাতা বিন্দুবালা দেবীর শ্বশুরালয়ে, অর্থাৎ জানবাজারের তদানীন্তন প্রখ্যাত জমিদার মান্নাবাবুদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জানবাজারে বসবাসের আগে মান্নাবাবুদের আদি বাড়ি ছিল কলকাতার 'গড়-গোবিন্দপুর' নামক স্থানে, যেখানে ইংরাজদের 'ফোর্ট- উইলিয়াম' দুর্গ ছিল।

এই মান্নাবংশের দরিদ্রবৎসল, উদার হৃদয় দুই জমিদার ভ্রাতা—যুগলকিশোর ও অক্রুরচন্দ্র, কুটুম্বসম্পর্কীয় এই পিতৃমাতৃহীন, নিরাশ্রয় বালক প্রীতিরামকে সেই দুর্দিনে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর ও দুটী ভ্রাতা রামতনু ও কালীচরণের ভরণপোষণের সমুদয় ভার সহ তাঁদের সবাইকে নিজেদের বাড়ির লোক হিসাবেই আপন ক'রে নিয়েছিলেন। অতঃপর প্রীতিরাম মান্নাবাবুদের স্নেহের ছায়ায় যেমন বড় হতে লাগলেন, তেমনি বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও করতে লাগলেন। নিজের মেধাবলে প্রীতিরাম অল্প- দিনের মধ্যেই যেমন ভালভাবে বাংলা শিখেছিলেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে কাজ চালাবার মত কিছু কিছু ইংরাজীও শিখেছিলেন। (এখানে বলা প্রয়োজন যে, যেহেতু রাসমণি দেবী প্রীতিরামেরই পুত্রবধূ ছিলেন, সেজন্য প্রীতিরাম ছাড়া প্রীতিরামের অপর দুই ভ্রাতার কথা এখানে অনুল্লেখ থাকছে।)

*   *   *   *

এই সময় অক্রুরচন্দ্র মান্না নিজেদের জমিদারী পরিচালনা ছাড়াও, কলকাতায় জনৈক 'ডার্নাকিন' নামক এক সাহেবের অফিসে একটি বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রীতিরামের লেখাপড়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর, তাঁকে কোন কাজে নিযুক্ত করার

ইচ্ছা ছিল অক্রুরচন্দ্রের মনে। কলকাতার বেলেঘাটায় উপরোক্ত ডানকিন সাহেবের একটি লবণের কারবারও ছিল। অক্রুরচন্দ্রের চেষ্টায় প্রীতিরাম সেখানেই সামান্য বেতনে মুহুরির কাজে নিযুক্ত হন।

প্রীতিরামের নির্লোভ স্বভাব ও কর্মনিপুণতার জন্য, গুণমুগ্ধ ডানকিন সাহেব তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে চাকরীতে উৎসাহ দানের জন্য এবং বাড়তি আয়ের জন্য লবণ বিক্রয়ের ওপর তাঁর 'বাটা' পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে, প্রীতিরাম যত বেশী মাল বিক্রী করতেন, তত উপরি 'বাটা' পেতেন। এজন্য সাহেবের ব্যবসায়ে যত লাভ হতে লাগল, প্রীতিরামেরও মাহিনা ছাড়াও আরও বেশী রোজগার হতে লাগল। এইভাবে সেই সময় প্রীতিরাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু ডানকিন সাহেবের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে সেই লবণের কারবার বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক কারণে প্রীতিরাম কর্মহীন হয়ে পড়েন।

দিন যায়! প্রীতিরাম আবার চাকরীর সন্ধান পান। সেই সময় পূর্ববঙ্গের যশোহরের জনৈক ইংরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসে মান্নাবাবুদের একটি বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে থাকায়, একদিন যুগলকিশোর মান্না প্রীতিরামকে নিয়ে সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রীতিরামের একটি চাকরীর জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। কিছু ইংরাজী জানা, ১৮ বছর বয়স্ক প্রিয়দর্শন মেধাবী যুবক প্রীতিরামের পরিচয় জ্ঞাত হয়ে, যুগলকিশোরের অনুরোধ মত সেই ইংরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতিরামকে যশোহরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সেরেস্তায় একটি চাকরীও ক'রে দিয়েছিলেন। কিছুদিন যশোহরে চাকরী করার পর, উক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যখন ঢাকায় বদলী হয়ে যান, তখন প্রীতিরাম-কেও ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে পুনরায় সেখানে একটি চাকরী ক'রে দেন। এই সময়ে নাটোরের তদানীন্তন রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে প্রীতিরাম পরিচিত হন এবং তাঁর সচ্চরিত্রতা, কার্যকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে রাজা রামকান্ত তাঁকে নিজ এস্টেটের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সাহেবটি প্রীতিরামের মত দক্ষ কর্মচারীকে ছাড়তে না চাওয়ায়, রাজা রামকান্ত রায় তখনকার মত প্রীতিরামকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য কিছুদিন বাদেই সেই সাহেব কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করায়, রাজা রামকান্ত রায়ের বিশেষ আহ্বানে প্রীতিরাম নাটোরে গিয়ে তাঁর এস্টেটের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে বিশেষ যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর, রাজা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হলে, প্রীতিরাম আবার ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে) ২৪ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং আশ্রয়দাতা যুগলকিশোর মান্নার বাড়িতেই আগের মত যথারীতি বাস করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে প্রীতিরাম পূর্ববঙ্গের জনৈক মহাজনের সঙ্গে মিলে কলকাতার বেলেঘাটায় একটি বাঁশের আড়ত স্থাপন করেন এবং বাঁশ বিক্রীর ব্যবসা শুরু

করেন। অনেকগুলি বাঁশ একসঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে একস্থান থেকে অন্য-স্থানে নিয়ে যাওয়াকে 'বাঁশের মাড়' বলা হত। এই মাড়ের ব্যবসা করতেন ব'লেই প্রীতিরাম ও তাঁর বংশধরগণ 'মাড়' নামে পরিচিত ছিলেন। (কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে, বাঁশের বিকৃত নির্যাস, অর্থাৎ 'মণ্ড' বা 'মাড়' বিক্রয় করতেন ব'লেই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের 'মাড়' বলা হ'ত।) এই 'মাড় বংশ' কলকাতার অন্যতম অভিজাত বংশ।

যাই হোক, 'দাস' পদবী ছাড়াও তাঁরা যে তৎকালে 'মাড়' নামে পরিচিত ছিলেন, এটি সর্বজন বিদিত। পরে অবশ্য এই 'মাড়' উপাধি বর্জন ক'রে, প্রকৃত পদবী 'দাস' নামেই তাঁরা পরিচিত হন। এই বাঁশের ব্যবসা ছাড়াও প্রীতিরাম কলকাতার টালা থেকে নীলামে সস্তায় সৌখিন দ্রব্যাদি কিনে সাহেবদের কাছে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রী করতেন এবং তার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের ইংরাজ সৈন্যদের রসদ যোগানোর কাজও করতেন। ফলে, নানাভাবে প্রীতিরামের প্রচুর অর্থ উপার্জন হত।

স্বীয় উদ্যমে প্রীতিরামের স্বচ্ছল অবস্থা লক্ষ্য ক'রে, জমিদার অক্রূরচন্দ্র মান্নার ভ্রাতা, জমিদার যুগলকিশোর মান্না তাঁর আশ্রিত প্রীতিরামকে উপযুক্ত পাত্ররূপে বিবেচনা করেন এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দেই (১১৮৩ বঙ্গাব্দে) ২৪ বছর বয়স্ক প্রীতিরামের সঙ্গে তাঁর ১১ বছরের কন্যা যোগমায়া দেবীর বিবাহ দেন। বিবাহে যৌতুকস্বরূপ জমিদার যুগলকিশোর মান্না তাঁর জামাতা প্রীতিরামকে কলকাতায় কয়েক খণ্ডে ১৬ বিঘা জমি দান করেন এবং এই জমিরই একাংশে পরবর্তীকালে প্রীতিরাম নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করেন।

* * * *

নাটোরে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করার সময় প্রীতিরামের নিজেরও একটি জমিদারী করার ইচ্ছা ছিল। প্রীতিরামের নিজের বিভিন্ন ব্যবসা ও চাকরীতে উপার্জিত অর্থ এবং বিবাহে যৌতুকাদি সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থই তিনি মান্না-বাবুদের কাছেই গচ্ছিত রেখেছিলেন। মান্নাবাবুরাও প্রীতিরামের অর্জিত ও গচ্ছিত অর্থ অটুটভাবেই রক্ষা ক'রেছিলেন। কোনদিনই সেই অর্থ থেকে তাঁরা একটি পয়সাও খরচ করেন নি। মান্নাবাবুদের কাছে গচ্ছিত সেই প্রচুর অর্থ থেকেই প্রীতিরাম জমিদারী কিনতে আগ্রহী হন।

অবশেষে প্রীতিরামের ভাগ্যে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নাটোর এষ্টেটের কয়েকটি তালুক নীলামে ওঠে। সেই সময় ঐ এষ্টেটের দেওয়ানের পদে ছিলেন জনৈক শিবরাম সান্যাল। শিবরামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সাতোর পরগণা এবং মকিমপুর পরগণার তালুক দুটী প্রথমে প্রীতিরামের নামেই খরিদ করা হয়; পরে শিবরাম সান্যাল সাতোর পরগণা নিজের নামে রেখে, অনুর্বর অসমতল মকিমপুর পরগণা ১৯ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রীতিরামকে ছেড়ে দেন।

এই সময় প্রীতিরাম বেলেঘাটায় বাঁশের আড়ত ছাড়াও আরেকটি আড়ত খোলেন, যেখানে মকিমপুর তালুকের উৎপাদিত জিনিস বিক্রয় হত। প্রথমাবস্থায় প্রায় ৪।৫ বছর ঐ তালুক থেকে ধান্যাদি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে বন্যা হওয়ার ফলে, সেখানে পলি পড়তে থাকে এবং অসমতল জমি ক্রমে সমতলে পরিণত হয়; জলগুলিও বড় বড় দীঘিতে পরিণত হয় এবং অনুর্বর স্থানগুলিও উর্বর হয়ে ওঠে। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই সেই তালুকে ধান, পাট, মুগ, মুসুর, বাঁশ, গুড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকায়, তিনি তালুক থেকে প্রভূত আয় করতে সক্ষম হন। এই সময় বেলেঘাটায় তিনি চালের ব্যবসাও শুরু করেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনুকম্পায় তিনি একদিনেই চালের ব্যবসায়ে পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ব্যবসায়ে লক্ষপতি হয়ে তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত মাধবপুর পরগণা কিনে জমিদার শ্রেণী ভুক্ত হন।

বিবাহে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত জমিতে প্রীতিরাম যে বাড়ি তৈরী করেছিলেন, শ্বশুরালয় ত্যাগ ক'রে, অর্থাৎ মান্নাবাবুদের বাড়ি ত্যাগ ক'রে অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রী যোগমায়া দেবী এবং দুটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন।

*   *   *

প্রীতিরামের দুটি পুত্র—হরচন্দ্র ও রামচন্দ্র এবং দুটি কন্যা দয়াময়ী ও বিশ্বময়ী। জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্রের জন্ম ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে (১১৮৬ বঙ্গাব্দে) এবং কনিষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের জন্ম ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে (১১৯০-৯১ বঙ্গাব্দে।) পুত্র দুটির জন্মের পর যথাক্রমে দয়াময়ী ও বিশ্বময়ী কন্যাদ্বয়ের জন্ম হয়। দয়াময়ীর সঙ্গে রাজচন্দ্র দালাল এবং বিশ্বময়ীর সঙ্গে রামরতন দাসের বিবাহ হয়।

প্রীতিরাম দুই পুত্রেরই যথাযোগ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন এবং দুজনেরই যৌবনে বিবাহ দিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের বিবাহ হয় হুগলী নিবাসী জগুদাসের কন্যা আনন্দময়ী দেবীর সঙ্গে। কিন্তু হরচন্দ্র ১৮০১ খৃষ্টাব্দে (১২০৮ বঙ্গাব্দে) প্রীতিরামের জীবদ্দশাতেই নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর বিধবা পত্নীকে রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। পরে সে পত্নীরও মৃত্যু হয়।

জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, প্রীতিরাম তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহ দেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে (১২০৯ বঙ্গাব্দে) চব্বিশপরগণা জেলার চানক নামক স্থানে (বর্তমানে ব্যারাকপুর) রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। (স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের সেই বছরের মধ্যেই রাজচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগ হয়। অতঃপর প্রীতিরাম রাজচন্দ্রের দ্বিতীয়বার শীঘ্রই বিবাহ দেন। (স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত)। দুঃখের বিষয়, এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরও কিছুদিন পরে অকাল মৃত্যু হয়। রাজচন্দ্রের দুই স্ত্রীরই কোন সন্তানাদি হয়নি।

অল্পদিনের মধ্যেই উপর্যুপরি দু-দুবার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায়, রাজচন্দ্রের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং তিনি আর বিবাহ না করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রীতিরাম বংশলোপের আশঙ্কায় রাজচন্দ্রকে আবার বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকায়, রাজচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, যদি কোথাও সুলক্ষণা ও ধর্মস্বভাবা কোন পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি পিতার আশা পূরণের জন্য আবার বিবাহ করতে রাজী আছেন।

* * *

দিন যায়! অতঃপর কালক্রমে সেই শুভ বিবাহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

রাজচন্দ্র নৌকাযোগে মাঝে মাঝে ত্রিবেণীতে পুণ্যপর্বাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য যেতেন। রাসমণি দেবীর কোনা গ্রামটি গঙ্গার তীরেই অবস্থিত। তাই কোনার অন্যান্য বাসিন্দাদের মত রাসমণি দেবীও গঙ্গার ঘাটে নিত্যস্নান করতে যেতেন, তবে তাঁর সঙ্গে তাঁর পিসিমাতা বা পাড়ার কোন বর্ষীয়সী মহিলা থাকতেন। কারণ, মাত্র ১১ বছর বয়সেই রাসমণি দেবীর বাড়ন্ত গড়ন ও অপূর্ব দেহ-সৌন্দর্যের জন্য সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপরেই আগে পড়ত। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসমণি দেবীর স্বাস্থ্য যেমন সুন্দর ছিল, তেমনি তিনি সুলক্ষণাও ছিলেন। তাঁর দেহের রঙ ছিল দুধে-আলতার মত, নাক ও মুখের গড়ন ছিল নিখুঁত ও মাধুর্যভরা ; মাথায় কালো রঙের কেশরাশি ছিল নিতম্ব-চুম্বিত। প্রকৃতপক্ষে, রাসমণি দেবীকে এককথায় প্রিয়দর্শিনী বলা যায়।

এ হেন রাসমণি দেবীকে, একদা ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানের জন্য নৌকাযোগে যাওয়ার সময় গঙ্গার ঘাটে রাজচন্দ্র প্রথম দর্শন করেন এবং তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য ও অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য দর্শন ক'রে রাজচন্দ্র মুগ্ধ হন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গী-বন্ধুদের দ্বারা পাত্রীর পরিচয় জানার জন্য উদ্গ্রীব হন এবং বন্ধুরাও যথাকালে পাত্রীর সমুদয় পরিচয় সংগ্রহ ক'রে রাজচন্দ্রকে জানান। পাত্রী স্বজাতীয়া, অশেষ গুণবতী, সুলক্ষণা ও ধর্মস্বভাবা জানতে পেরে রাজচন্দ্র বলেন যে, পাত্রীর পিতা যদি তাঁর সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহ দিতে রাজী থাকেন, তবে তৃতীয়বার বিবাহ ক'রে তিনি পিতৃ-আশা পূরণ করবেন।

রাজচন্দ্রের বন্ধুরা উদ্বিগ্ন প্রীতিরামকে সেই আশাপ্রদ শুভসংবাদ জানালে, প্রীতিরাম তৎক্ষণাৎ কোনায় পাত্রী রাসমণি দেবীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের কাছে ঘটক পাঠিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

কলকাতার জানবাজারের অতবড় নামী জমিদার বাড়ির তরফ থেকে স্বেচ্ছায় রাসমণি দেবীর বিবাহের প্রস্তাব আসায়, দরিদ্র হরেকৃষ্ণ দাস আনন্দে আত্মহারা হন এবং ভগ্নী ক্ষেমঙ্করী দেবীর সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। কন্যার বয়স বাড়তে থাকলেও, দারিদ্র ও অর্থাভাবের দরুণ হরেকৃষ্ণ দাস তাঁর অতি আদরের মাতৃহারা কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করতেই পারতেন না। এবার অযাচিতভাবে এই অকল্পনীয় বিবাহের প্রস্তাব আসায়, ঈশ্বরবিশ্বাসী পরম বৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ দাস

এটিকে ঈশ্বরের কৃপা ব'লেই গণ্য করেন এবং নিজে কলকাতার জানবাজারে গিয়ে জমিদার প্রীতিরামের সঙ্গে দেখা ক'রে কন্যার বিবাহের কথা পাকা ক'রে আসেন।

নিঃসম্বল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের দরিদ্র অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে, উদার হৃদয় প্রীতিরাম হরেকৃষ্ণ দাসকে সপরিবারে নিজ বাড়ির কাছে গোয়ালটুলীর মান্নাবাবুদের বাড়িতে সাদরে নিয়ে আসেন এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সেই বাড়িতেই ১২১১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল) রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণি দেবীর বিনা আড়ম্বরে বিবাহ হয়।

রাসমণি দেবী রাজচন্দ্র দাসের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহের সময় রাজচন্দ্রের বয়স ছিল ২১ বছর এবং রাসমণি দেবীর বয়স ১১ বছর। বিবাহের পরেই রাসমণি দেবী মান্নাবাবুদের বাড়ি থেকে নিজ শ্বশুরালয়—প্রীতিরামের বাড়ীতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

॥ ৭ ॥

রাণী রাসমণি দেবীর শ্বশুরবংশ তালিকা

॥ ৮ ॥
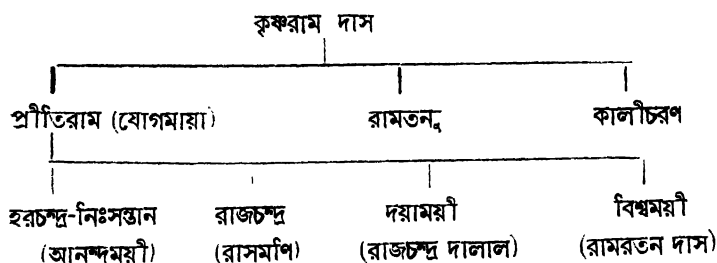
দাম্পত্য জীবন

অতি দরিদ্র পরিবার থেকে এসে, একেবারে অতি ধনশালী জমিদার বাড়ির গৃহিনীরূপে রাসমণি দেবী সকল কিছুই মানিয়ে নিয়েছিলেন নিজের গুণে। এক পরিচিত সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক অপরিচিত সামাজিক পরিবেশে আত্মপ্রকাশের দ্বারা রাসমণি দেবী বাস্তব জীবনের সত্য আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং অনভ্যস্ত আচরণকে অভ্যাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসমণি দেবীর জীবনের ভাগবত-চেতনাগত শুদ্ধতার স্পর্শে তাঁর শ্বশুরালয় যেমন ঐশ্বর্যের সাথে মাধুর্যমণ্ডিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিল, তেমনি তাঁর শ্বশুরালয়ও তাঁকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ ক'রে তাঁর দুর্বার প্রভাবকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। শ্বশুরালয়ের সবাই—শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন এবং অন্যান্য আত্মীয়জন—রাসমণি দেবীর চালচলনে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দেব-দ্বিজে অপরিসীম ভক্তি, পূজা-আহ্নিকে গভীর নিষ্ঠা, অতিথিসেবা ও দীন-দুঃখীর অভাবমোচনে সতত আগ্রহ প্রভৃতি নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রাসমণি দেবী সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহে ভরপুর ছিলেন। প্রীতিরাম শেষজীবনে এমন গুণময়ী, সুলক্ষণা পুত্রবধূর স্বমহিমায় অধিষ্ঠানের দৃশ্য দর্শন ক'রে অতি মাত্রায় সুখী হ'য়েছিলেন। প্রীতিরাম তাঁর পুত্রবধূকে এত স্নেহ করতেন যে, কন্যাসমা বৌমা রাসমণিকে না দেখলে, বা তাঁকে কাছে না পেলে তিনি অধীর হয়ে পড়তেন। শ্বশুরের এই পরম স্নেহ তাঁকে নিজের পিতার অনুপস্থিতির কথা ভুলিয়ে দিত। আবার, প্রীতিরামের সংসারে পুত্র-বধূরূপে রাসমণি দেবীর আগমনের পর থেকেই, প্রীতিরামের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারীর আয় ক্রমশঃ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সুলক্ষণা পুত্রবধূর আগমনের দরুনই এই অর্থাগম—এই ধারণায় রাসমণি দেবীর প্রতি প্রীতিরামের একটি বিশেষ টানও ছিল।

যেদিন থেকে রাসমণি দেবী শ্বশুরালয়ে এসেছিলেন, সেদিন থেকেই তিনি প্রত্যহ শ্বশুর-শাশুড়ীর পাদোদক পান ক'রে, তবে অন্নগ্রহণ করতেন। আবার 'পতি পরম গুরু' জ্ঞানে রাসমণি দেবী সর্বদাই স্বামী রাজচন্দ্রের সেবা করতেন। পিত্রালয়ে থাকার সময় রাসমণি দেবী সকল প্রকার গৃহকর্মেই সুনিপুণা হয়ে উঠেছিলেন; তাই শ্বশুরালয়ে এসেও তিনি এখানকার সব কাজের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত ক'রেছিলেন। ফলে, সকাল থেকে গভীর রাত অবধি তাঁর কাজের বিরাম থাকত না। ঠাকুর-ঘর পরিস্কার, ফুল তোলা থেকে শুরু ক'রে রান্নাঘরে গিয়েও তিনি রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করতেন। বাড়িতে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও সব কাজেই রাসমণি দেবী ব্যস্ত থাকতেন বলে স্নেহময়ী শাশুড়ীও তাঁর কষ্ট-

লাঘবের উদ্দেশ্যে এ সব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু সংসারের কাজকে সেবার মনোভাব নিয়ে করার দরুন, রাসমণি দেবী কারুর নিষেধই শুনতেন না। এই ভাবে সব কাজ তত্ত্বাবধানের মাঝেও রাসমণি দেবী প্রতিদিন নিয়মিতভাবেই পূজাহ্নিক ক'রে যেতেন। বাড়ির দাসদাসীদেরও রাসমণি দেবী খুব আদরযত্ন করতেন এবং তারাও তাদের রাণীমাকে 'রাণী'র মতই সম্মান করত। তাদের যা কিছু আব্দার, অভিযোগ—সমস্তই তারা তাদের রাণীমার কাছে পেশ করত এবং তিনিও ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের সব কথা শুনে যথাসাধ্য তাদের আব্দার পূরণ করতেন। স্বামী রাজচন্দ্রও রাসমণি দেবীকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। এইভাবেই শ্বশুরালয়ে রাসমণি দেবী তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীর জীবদ্দশাতেই সকল কর্তৃত্বের অধিকারিণী হয়ে, কাজের দ্বারা অন্তরের পুষ্টির আনন্দে ধীরে ধীরে নিজেকে আরো শ্রীময়ী ক'রে তোলার সুযোগ পান।

রাসমণি দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর থেকে রাজচন্দ্রেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অজস্র অর্থাগম শুরু হয়। একবার 'এক্সচেঞ্জ' অফিসের নীলামে নিজের বুদ্ধিবলে তিনি একদিনেই ৫০ হাজার টাকা লাভ করেছিলেন। এভাবে প্রায়ই প্রভূত অর্থ উপার্জন হোত। এ ছাড়াও, তাঁর জমিদারীর আয় ও ব্যবসায়ের আয়ও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

রাসমণি দেবীর সঙ্গে বিবাহের পর রাজচন্দ্র বাণিজ্য-সম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলি কিনে ব্যাবসা করার ফলে অতুল ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। যেদিন ২০/২৫ হাজার টাকা লাভ না হত, সেদিন তাঁর আয় অতি অল্প হ'ল ব'লে তিনি মনে করতেন। কোন কোনদিন তিনি লক্ষাধিক টাকাও আয় করতেন। তাঁর যা কিছু ঐশ্বর্য সবই তাঁর বুদ্ধিবলে,—অপরকে ঠকিয়ে কোনদিন অর্থ রোজগারের চেষ্টা তিনি করেননি। রাজচন্দ্রের এই প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তির মূলে তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী স্ত্রী রাসমণি দেবীর সুলক্ষণ সমূহকে তিনি স্বীকার করতেন এবং সেইমত তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন।

এই সময় রাজচন্দ্র কলকাতার মধ্যে যে সব জমি ও বাড়ি কিনেছিলেন বা প্রস্তুত করিয়েছিলেন, নীচে তার তালিকা দেওয়া হ'ল ঃ—

স্থান	কুঠী ও জমি	পরিমাণ
১২, রাসেল ষ্ট্রীট	দোতলা কুঠী সমেত	৯/১।।৵০
২, পোলক ষ্ট্রীট	ঐ	৮২৮৶০
৭৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট	ঐ	১৮০৶০
৭৫, " "	ঐ	১।৪।।৵০
৭৫।১, " "	কুঠী আস্তাবল	৴২৮৵০

স্থান	কুঠী ও জমি	পরিমাণ
৭৬, ,, ,,	দোতলা কুঠী	১॥০৸/০
৭৭, ,, ,,	জমি	১॥৪৸/০
৩, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট	জমি	———
৪, ,,	দোকান	/০॥/০
৫১, ,,	দোকান কুঠী সমেত	১/২৸০
৭১, ,,	কুঠী	৬।৩
৭২, ,,	দোকান	———
১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট	দোতলা কুঠী	১।৪৸৶/০
১৬, মার্কেট ষ্ট্রীট	জমি	॥৪৸০
১৭, ,, ,,	দোতলা কুঠী সমেত	॥০/০
৩৮,৩৯,৪০, মার্কেট ষ্ট্রীট	জমি	১॥০॥৶/০
৮, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট	জমি	৩৸৩॥৶/০
২৫, ,, ,,	জমি ও দোকান	১৸২
২৬, ,,	জমি	২॥০॥০
২৪, চৌরঙ্গী	দোতলা বাড়ি	২।০৵/০
১২, মার্কুইস ষ্ট্রীট	দোকান	১।৶/০
২, কীড ষ্ট্রীট	তিনতলা বাড়ি	৫॥৪॥৵০
৩, কোবার্ণ লেন	জমি	।২॥/০
১৫, মট্‌স্ লেন	ঐ	।১।৵০
৪৫, ,,	কুঠী	১।২
৪, গোয়ালটুলী	জমি	/৪৶/০
৫, ,,	বস্তি	/৩॥৶/০
৪, উমাচরণ দাসের লেন	জমি	।৩।C
৭, ,,	ঐ	৸৩॥৶/০
৩৬, নীলমণি হালদার লেন	গুদাম	॥৪
১২, কোড়া বরদার লেন	বস্তি	।৩।০
৯, দত্ত লেন	ঐ	।০/০
৬৪, ডাক্তার লেন	দোতলা বাড়ি	২/৪
১, রামহরি মিস্ত্রী লেন	জমি	/১।৵C
১৬, মিশ্রী খানসামা লেন	ঐ	।৪৶/C
১২, শাঁখারীটোলা লেন	ঐ	/২।৵C
১০, মির্জাপুর লেন	গুদাম	॥১৸C
৪৭, মনোহর দাস ষ্ট্রীট	কুঠি	/০।৵C
১, মুন্সী সদরুদ্দী লেন	জমি	/৪৸৵C

স্থান	কুঠী ও জমি	পরিমাণ
১, সরিফ দপ্তরী	বস্তি	।০৸০
২০১-২০৫, পুরাতন চীনাবাজার	দোতলা বাড়ি	১/২৸৶০
৯, তালতলা	বস্তি	/২৷০
৮৭, ,,	ঐ	।৪
১৮, জানবাজার	দোকান	/১৷৶০
৩৭, ,,	বস্তি	———
৪৬, ,,	ঐ	৯৸০৶০
১১২, ,,	ঐ	।৩৶০
১১৫, ,,	ঐ	/৩৶০
৬৪, জানবাজার ষ্ট্রীট	জমি	।২।০
৯৯, ,,	কুঠী	১/২।/০
১২৫, ,,	জমি	৷০।০
১৩০, ,,	ঐ	/২৶০
বেলেঘাটা	বাজার, বাগান, কুঠী, জমি, পুষ্করিণী	২৫/৩
ভবানীপুর	যদুবাবুর বাজার	৩/০
কালীঘাট	বাগান, কুঠী, পুষ্করিণী, গঙ্গার ঘাট	২/০
সিঁথি	বাগান, পুষ্করিণী	৩/৪

উপরোক্ত জমি ও কুঠীর মধ্যে অনেকগুলি আবার অত্যাধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছিল। যেমন, রাসেল ষ্ট্রীটের জমি ও কুঠী সেই সময় প্রায় দু-লক্ষ টাকায় গভর্ণমেণ্ট কিনেছিল। এ ছাড়াও, মফঃস্বলের ঘিপুকুর, জগন্নাথপুর, মকিমপুর ও কলরা হোসেনপুর—এই চারটি মহলের আয়ও প্রচুর ছিল। সুতরাং শ্বশুরালয়ে রাসমণি দেবী সত্যই 'রাণীর মর্যাদা নিয়েই' 'রাণী' হয়ে ব'সেছিলেন।

* * *

প্রীতিরামের জীবদ্দশাতেই রাসমণি দেবীর তিনটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমা কন্যা পদ্মমণির জন্ম ১২১৩ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর জন্ম ১২১৮ বঙ্গাব্দে এবং তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর জন্ম ১২২৩ বঙ্গাব্দে। ১২২৪ বঙ্গাব্দে প্রীতিরামের দেহ ত্যাগের পর ১২২৬ বঙ্গাব্দে রাসমণি দেবীর একটি মৃত পুত্র হয়; রাসমণি দেবীর চতুর্থা, তথা কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার জন্ম হয় ১২৩০ বঙ্গাব্দে।

প্রীতিরাম ১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) মৃত্যুকালে সাড়ে ছ-লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি ও জমিদারী রেখে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া দেবী জীবিতা ছিলেন। প্রীতিরামের মৃত্যু উপলক্ষে পুত্র রাজচন্দ্র বহু আড়ম্বরে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করেছিলেন। নানাস্থান থেকে আগত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভাটভিখারী, অনাথ, আতুর প্রভৃতিকে তিনি দান, পান, ভোজন ও সামাজিক বিদায়ে পরিতুষ্ট করেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে রাজচন্দ্রের মাতা যোগমায়া দেবীরও মৃত্যু হয় এবং একই-ভাবে মহাধুমধাম ও আড়ম্বরের মধ্যে তাঁরও শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী-কালে, মাতা যোগমায়া দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে রাজচন্দ্র কলকাতার আহিরীটোলায় একটি স্নানঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন।

পিতা প্রীতিরামের মৃত্যুর পর একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্ররূপে কৃতবিদ্য রাজচন্দ্রের ওপর যেমন সমগ্র জমিদারী ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, শাশুড়ী যোগমায়া দেবীর মৃত্যুর পরেও তেমনি সংসারের যাবতীয় কর্তব্য কর্মের ভার সুযোগ্যা পুত্রবধু রাসমণি দেবীর ওপর বর্তায় এবং উভয়েই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

* * * *

রাসমণি দেবীর বিবাহের পর থেকেই জানবাজারের জমিদার বাড়িতে বিত্ত-উপবিত্ত বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বদান্যতায় রাজচন্দ্র শীঘ্রই কলকাতার তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিগণিত হন। এই সময় প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, জোড়াসাঁকোর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, সুতানটীর রায় রাজ বল্লভ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, অক্রুর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা হয়। এমনকি, লর্ড অকল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

এই সময় রাসমণি দেবীর অসীম 'প্রাণধারার অনুপ্রেরণার প্রভাবে রাজচন্দ্র বহুবিধ সৎকাজের অনুষ্ঠান ক'রেছিলেন।

১২৩০ বঙ্গাব্দে রাসমণি দেবীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের মৃত্যু উপলক্ষে পরলোকগত পিতার 'চতুর্থী' করার জন্য রাসমণি দেবী বাড়ির কাছের গঙ্গার তীরে গিয়ে লক্ষ্য ক'রেছিলেন যে, সেখানকার ঘাটটি অতিশয় পঙ্কিল,—ভাঙাইঁট ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং স্নান করার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। তবুও সেখানেই পরলোকগত পিতার চতুর্থীর কাজ কোন প্রকারে সম্পন্ন ক'রে, বাড়িতে ফিরে এসে রাসমণি দেবী তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যাতে ঐ ঘাটটি স্নানার্থীদের জন্য উপযুক্তরূপে নির্মাণ করা হয়। পরদুঃখেকাতরা স্ত্রী রাসমণি দেবীর বিশেষ আগ্রহেই রাজচন্দ্র সেখানকার তৎকালীন কর্তৃপক্ষ গ্যারিসন অফিসারের (Garrison Officer) সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেন এবং

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বহু অর্থব্যয়ে সেই গঙ্গার তীরে 'বাবুঘাট' নির্মাণ করিয়ে দেন। এই ঘাটনির্মাণের দু-বছরের মধ্যেই আবার নিজ বাড়ি থেকে গঙ্গাতীর অবধি তৎকালীন কাঁচা রাস্তার বদলে নিজ ব্যয়ে প্রশস্ত পাকা রাস্তা—'বাবুরোড'ও নির্মাণ করেন। (বাবুরোডের কিছু অংশকে এখন 'রাণী রাসমণি রোড' বলা হয়।)।

ছত্রিশটি থাম ও চাঁদনী দ্বারা শোভিত এই বাবুঘাটের দেওয়ালের ওপর একটি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে ঃ—

"The Right Honorable Lord William Cavendish Bentinck, G. C. B. & G. C. H. Governor General, &C, &C, &C. with a view to encourage the direction of private munificence to works of public utility has been pleased to determine that this Ghaut constructed in the year 1830 at the expense of Baboo Raj Chandra Doss shall hereafter be called Baboo Raj Chandra Doss's Ghuat."

বলা বাহুল্য, এমনি ভাবেই রাসমণি দেবীর বিশেষ প্রেরণায় রাজচন্দ্র আরো নানা মহৎ ও সৎকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১২৩০ বঙ্গাব্দে প্রচণ্ড বন্যার সময় রাসমণি দেবীর অনুরোধে রাজচন্দ্র তাঁর বাড়িতে দুর্গতদের আশ্রয় দেন এবং তাদের আহারাদির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

আহিরীটোলায় পরলোকগতা মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থব্যয়ে স্নানঘাট নির্মাণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য গৃহনির্মাণ রাজচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি। গঙ্গাযাত্রীদের নিদারুণ কষ্ট অনুভব ক'রে, রাসমণি দেবী রাজচন্দ্রের দ্বারা এখানে মুমূর্ষুদের সেবা-শুশ্রূষার কাজের জন্য নিজব্যয়ে ১টি গৃহ নির্মাণ করিয়ে, একজন দারোয়ান, দু-জন ভৃত্য এবং একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। (বর্তমানে এই গৃহটি পোর্টট্রাস্ট রেলের পাশে প'ড়ে আছে)।

মেটকাফ হলে গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে রাজচন্দ্র এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

বেলেঘাটায় খালের ওপর 'পুল' তৈরীর আগে, জনসাধারণ যাতে বিনা ব্যয়ে পারাপার করতে পারে, তার জন্য রাজচন্দ্র বেলেঘাটার নিজ জমি গভর্ণমেণ্টকে দান করেছিলেন। জনগণের স্বার্থে তিনি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এজন্য কোন মূল্য গ্রহণ করেননি।

ব্যারাকপুরের চাণকের তালপুকুরটি অন্যলোকের ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে রাজচন্দ্র নিজ ব্যয়ে অপরের সেই তালপুকুরটী খনন করিয়ে সেখানকার জলাভাব দূর করেন।

কলকাতায় হিন্দু-কলেজ স্থাপনের সময়ও রাজচন্দ্র বিশেষ আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

রাজচন্দ্রের জমিদারীর মধ্যে চাষবাসের সুবিধার জন্য চাষীদের স্বার্থে দীঘি ও পুকুর প্রতিষ্ঠাও তাঁর মহত্বের পরিচয় বহন করে।

এ ছাড়া, বহু দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের জন্যও রাজচন্দ্র নিয়মিত অর্থ ব্যয় করতেন।

উপরোক্ত বহু জনহিতকর কাজের জন্য ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজচন্দ্র দাসকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বহু গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, রাজচন্দ্র 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন ; কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে, এটি ভুল তথ্য। কারণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হত না,— 'রায়' উপাধি দেওয়া হত। রাজচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 'রায়' উপাধিই পেয়েছিলেন,—'রায় বাহাদুর' নয়। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পর বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণের পর 'রায় বাহাদুর' উপাধির প্রবর্তন হয় এবং 'রায়' উপাধিটিও 'রায় বাহাদুর' সমতুল্য হয়।)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক রায় রাজচন্দ্র দাসকে সম্মানসূচক 'অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট' বা অবৈতনিক বিচারক পদেও নিযুক্ত করা হয়।

রাজচন্দ্র এমনই সত্যনিষ্ঠ ও বাঙ্‌নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন যে, 'হুক্ ডেভিড্‌সন এণ্ড কোম্পানী' (মতান্তরে বার্ণাড কোম্পানী) নামক এক ইংরাজ সদাগর অফিসকে দেউলিয়া জানা সত্বেও, তাঁর পূর্ব অঙ্গীকার মত সত্যরক্ষার্থে একলক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন এবং ঋণ পাওয়ার পরের দিনই গ্রহীতা বণিক সাহেব রাজচন্দ্রের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে বিলাত চলে গিয়েছিলেন। বাক্যের সততা রক্ষার জন্য রাজচন্দ্র সেদিন প্রকৃতপক্ষে অনেক নামীলোকের সমতুল্য কাজই ক'রেছিলেন, যা ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ করার মত দৃষ্টান্ত।

রাজচন্দ্র সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও, জনহিতকর সমাজ বিপ্লবের সমর্থক হওয়ায়, লর্ড বেণ্টিকের শাসনকালে সতীদাহ নিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন এবং তাঁর সাধ্যমত সহযোগিতা করেন। এ বিষয়ে রাজচন্দ্র সকল প্রকার হিন্দু গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে উঠে দেশবাসীর কল্যাণে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

* * *

যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে এখানেই রাজত্ব স্থাপন ক'রেছিলেন, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই একজন প্রধান অভিজাত অংশীদার এবং ইংলণ্ডের অন্যতম ধনকুবের জন্ বেব একবার কলকাতায় এলে, রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। এটি অবশ্য অনেক আগেকার ঘটনা। সেই সময় রাজচন্দ্রের উদার ভাব, জনহিতকর কার্যাদি ও অগাধ সম্পত্তির

পরিচয় জেনে বেব সাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গে আজীবন বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হন। বিলাতে ফিরে গিয়েও বেব সাহেব রাজচন্দ্রের কথা মনে রেখে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ একটি স্বর্ণঘড়ি বিলাত থেকে রাজচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। ঐ ঘড়িটি এখনও রাজচন্দ্র এবং রাণী রাসমণির বাড়িতে রক্ষিত আছে। ঘড়িটিতে লেখা আছে ঃ—

A TOKEN OF ESTEEM
Sent by
JOHN BEBB ESQ. of London
TO HIS FRIEND
Babu RAJ CHANDRA DAS,
January 1826

কথিত আছে, ভারতবর্ষের বড়লাট বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজচন্দ্র দাসের উদ্যানে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রেছিলেন। কলকাতায় অবস্থানকারী বহু ইংরাজের সঙ্গে রাজচন্দ্রের হৃদ্যতা থাকায়, অনেকেই তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে পদার্পণ করতেন। এইভাবে একেবারে নীচুতলার দীন দরিদ্র থেকে উপর মহলের রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে নিরহঙ্কার রাজচন্দ্র সমভাবে মিলিত হতেন এবং তাঁর এই উদার ভাবের জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতেন।

* * *

রাজচন্দ্র ইতিপূর্বে ৭১ নং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের পৈতৃক দোতলা বাড়িতে বাস করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর এই বাড়ির সংলগ্ন সাড়ে ছয় বিঘা জমির ওপর এক বিরাট দোতলা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদটি তৈরী হতে প্রায় ৮ বছর (১২২০-১২২৮ বঙ্গাব্দ) সময় লেগেছিল এবং প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এইটাই বর্তমানে 'রাণী রাসমণির বাড়ী' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অনেক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই বিশাল প্রাসাদটির নাম-'রাসমণি কুঠি' এবং এটির নামকরণ ক'রেছিলেন স্বয়ং রাজচন্দ্র দাস তাঁর পত্নীর নামে। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রাসাদটির নাম 'রাসমণি কুঠি'ও নয় এবং এরকম কোন নামকরণও রাজচন্দ্র ক'রে যাননি। কলকাতার বুকে এই বিশাল প্রাসাদটি দেখে এবং এটিতে স্বনামধন্যা রাণী রাসমণি বাস করতেন ব'লেই, জনসাধারণ সম্ভবতঃ এটিকে 'রাসমণি-কুঠি' নামেই চিহ্নিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটির নাম 'রাসমণি-কুঠি' নয়। তবে এই বিশাল প্রাসাদের অপর প্রান্তে 'রাণী রাসমণি ভবন' নামাঙ্কিত যে বাড়িটি বিদ্যমান, সেটি রাসমণি দেবীর দেহত্যাগের বহুকাল পরে নির্মিত হয় এবং নির্মাণ করেন রাসমণি দেবীর অন্যতম বংশধর নৃত্যগোপাল বিশ্বাস।)

যাই হোক, তখনকার দিনে একজন বাঙালীর পক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই

বিশাল সাত মহল প্রাসাদ (১টি পুস্করিণী, ৬টি প্রাঙ্গণ এবং ৩০০টি ঘর সমেত) নির্মাণ করা যে কতটা কৃতিত্বের পরিচয় এবং বাঙালীর পক্ষে এটি যে কত বড় গৌরবের বিষয়, একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। রাসমণি দেবীর যেমন অমর কীর্তি—'দক্ষিণেশ্বর দেবালয়', রাজচন্দ্রের তেমন অমর কীর্তি এই বিশাল প্রাসাদ। এই প্রাসাদে নিজেদের বসবাস ছাড়াও, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, দেওয়ানখানা, কাছারী ঘর, অতিথিশালা, গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতিও ছিল। বর্তমানে এই প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ ভাগের অনেক পরিবর্তন হলেও, মূল প্রাসাদটি তৎকালীন সৌখীন আসবাবপত্রে সুসজ্জিতরূপে আজও বিদ্যমান।

এই ঐতিহ্যময় প্রাসাদ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা, তাঁর রচিত ও ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, সেটি উল্লেখ না করলে তৎকালীন সেই প্রাসাদ সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা হবে না। তাই সাঁতরা মহাশয়ের সেই বিশদ ও সুন্দর বিবরণটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল। যথা ঃ—

"এখন যে দেউড়িতে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দিকে দ্বারবান্‌গণ বসিয়া থাকে, উহাই আদি সিংহদ্বার ও প্রবেশদ্বার। বৃহদাকার প্রকারের বৃহদাকার তোরণ। বৃহৎ কপাটের বক্ষে লৌহগুলি বসানো। ঐ বৃহৎ কপাটের অধোভাগে আবার একটি ক্ষুদ্রায়তন কপাট আছে। রাত্রি ১০ টার পর বৃহদ্বার বন্ধ হইবার নিয়ম। বৃহদ্বার বন্ধ হইয়া গেলে, ঐ ক্ষুদ্র দ্বার আগম নির্গমের জন্য ব্যবহৃত হইত। অবশ্য উৎসবে বৃহদ্বার সারা রাত্রি উন্মুক্ত থাকে। সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দুই ধারে দ্বারবানদিগের বিশ্রামাগার, শয়নাগার, প্রহরার স্থান। সেই সকল স্থানের ভিত্তি গাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইত, উহাতে ঢাল, তরবারি, সড়কি, বন্দুক, রৌপ্যনির্মিত শঙ্কর মৎস্যের পুচ্ছ, বল্লম, বর্শা, ভোজালি, খেটক, খর্পর, টাঙ্গী, পিতলের গুল বাঁধানো ভিতরে শিশা ঢালা মোটা মোটা পাকা বাঁশের লাঠি ; আবার স্থানে স্থানে ঢোলক, ডুগডুগী, ডম্বরু, সারঙ্গী, সেতার, ঝাঁঝ, খঞ্জনী, করতাল, বাঁশের বাঁশী ইত্যাদি প্রমোদোপযোগী, দৌবারিকদের হোলী ও বাসনের সম্বল, আবার তাহার পার্শ্বই মুদ্গর, লৌহ গোলক, লৌহ ধনুক, কাঠের বল পরীক্ষার পাপড়ী, গদ্সা কালসারের শৃঙ্গনির্মিত রৌপ্যমণ্ডিত আততায়ীর আক্রমণ-রোধী হাতিয়ার, বলবৃদ্ধির পরিচায়ক অস্ত্রগুলি সজ্জিত আছে। আবার তার পার্শ্বেই পাগড়ী, মুরাঠা, উষ্ণীষ, তাজ, কোমরবন্ধ, বুকবন্ধ, চাপরাশ ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। তারপর একধারে কতকগুলি ভাং প্রস্তুতের কুণ্ড ও নিম্বদণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ ঘোটনদণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে। দণ্ডগুলি যেন এক একটি বংশদণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মধ্যে মধ্যে উপরে একটি আলোকাধার।"

"একজন দ্বারবানের কি বিশাল বক্ষ, পেশী সমন্বিত ভুজযুগ, গলদেশে স্বর্ণমণ্ডিত কামরাঙ্গা ফলের হাসুলী, হাতে রূপার বলয়, কর্ণে বীরবৌলী, অঙ্গুলে অঙ্গুরীয়। অন্য একটি দ্বারবান ভয়ানক মূর্ত্তি—গজস্কন্ধ, গজচক্ষু, দেহ স্থূল

ও মাংসল, পেশী দৃঢ় ও সরল, উচ্চতায় সকল দ্বৌবারিক অপেক্ষা কনিষ্ঠ, বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, কেশ-বিরল মস্তক, ঐটা কুস্তিগীর, সহসা দেখিলে মনে হয় যেন কুম্ভকর্ণের প্রদৌহিত্র, কি বৃকোদরের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা। এইরূপ ২৫৩০ জন দ্বৌবারিক তোরণ-রক্ষক। অল্প অগ্রসর হইলেই দুই ধারেই চলন পথ। চলন পথ পার হইলেই দুইধারে উপরে যাইবার দুইটী সোপান শ্রেণী। বামদিকের সোপান শ্রেণী দিয়া উপরে অন্তঃপুরে যাইতে পারা যায় ও দক্ষিণদিকের সোপান শ্রেণী দিয়া উপরে বৈঠকখানায় যাইতে পারা যায়। অগ্রে নিম্নতলার কথাই বলা যাইতেছে। এই চলন পথ তিন দিক ব্যাপিয়া। উত্তরভাগে দেবতার স্থান, ঠাকুর দালান। মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে বাঁধা কাঠগড়া। তিন দিককার চলন পথের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। কোনটি দেওয়ানখানা, কোনটি গোলামস্তার, কোনটি সরকারের, কোনটি পাচক ব্রাহ্মণের, কোনটি পূজক ব্রাহ্মণের, কোনটি গৃহ-শিক্ষকের, কোনটি ভাণ্ডারির, কোনটি ফরাসের, কোনটি বাতিঘর, কোনটি ভৃত্যের আবাস, কোনটি ঢাকী ও ঢুলির জন্য, কোনটি প্রতিমা-নির্মাতা কুম্ভকারের জন্য, কটি ঘড়িঘর, উহাতে একটি কাঁসার বড় পেটা ঘড়ি থাকিত ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাদিত হইয়া সময় ঘোষণা করিত। উহা এখনও আছে। পূর্বদিকের গৃহগুলিতে উৎসবে, পার্বণে, আহারীয় দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে রাখা হইত। কোনটিতে রথ, রথের আসবাব সরঞ্জাম, ঘোড়া, সারথি, পতাকা, রজ্জু ও আশাসোটা ইত্যাদি থাকিত। কোনটি উদ্বোধনে ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্য ব্যবহৃত হইত। কোনটি দাশু রায়, গোবিন্দ অধিকারী ও আর আর সম্প্রদায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইত। কোনটি পূজার সময় পূজোপকরণ সজ্জিত হইত। কোনটিতে দোলের সময়কার আবির, কুমকুম্, ফাগ, রং, পিচকারী, মঠ, ফুলের মালা ইত্যাদি রাখা হইত। কোনটিতে আড়ালি, স্বর্ণছত্র, রৌপ্যছত্র রাখা হইত।"

"উত্তরদিকে তিন মহল ঠাকুর দালান, শেষ মহলে ঠাকুরের স্থান। উপরে ৩২ ডালের ঝাড়, দুই পার্শ্বে ২৫ ডালের করিয়া দুইটি ঝাড়, নীচে ঠাকুরের কাছে সেজ জ্বলিত হইত। উহাই দুর্গা প্রদীপ। ঠাকুর দালানটি সমস্তই পঙ্কের কাজ করা। থামে দেওয়ালগিরী ও চিত্রপট শোভা পাইত। উপরে বহুমূল্যের চাঁদোয়া। মধ্যমহলে ষোড়শোপচারে পূজোপকরণ রাখিবার ও ব্রাহ্মণদিগের বসিবার স্থান। শেষ মহলে দর্শকদিগের স্থান। শেষ মহলের পরেই কতিপয় সোপান শ্রেণী, পরে প্রাঙ্গণ বলিদানের স্থান, দক্ষিণ দিকের গৃহগুলি পার হইলেই ফুলবাগান, তাহা এখন স্থানাভাবে পাকশালা, অশ্বশালা, গোশালা এবং যানবাহন রক্ষার স্থান হইয়াছে। উপরে, বৈঠকখানা, উপরে ঝাড়লণ্ঠন, সেজ, দেওয়াল-গিরির বেল লণ্ঠনে গৃহ আলোকিত হইত। বড় বড় মুকুরে গৃহ প্রাচীর শোভিত ছিল। মহিষের বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ, মৃগশৃঙ্গ ও চর্ম, কালসারের শৃঙ্গ ও চর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম ও মৃজাপুরী কারুকার্য খচিত গালিচায় শোভা পাইত।"

"পূর্বদিকে দরদালান ও রঘুনাথ জীউর স্থান। এটি প্রথম মহল। প্রথম

মহল পার হইলেই দ্বিতীয় মহল। নীচে উপরে দুইটি চলনপথ প্রথম মহল হইতে দ্বিতীয় মহলে লইয়া গিয়াছে। ইহার নীচে ও উপরে অনেকগুলি গৃহ সজ্জিত। তাহা এখন ৺যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রগণের অংশে পড়িয়াছে। সদর ও মফঃস্বলে বিভক্ত করিয়া পঞ্চভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের মত প্রিয় পরিজন, পুত্রকন্যা লইয়া বাস করিতেছেন। অধুনা ইঁহারাই যেন রাণীর গৌরব কতকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় মহল। দ্বিতীয় মহলে ছাদে যাইবার একটি গোল সিঁড়ি আছে। ইহার পরেই তৃতীয় মহল। ইহাতে ১টি প্রাঙ্গণ ও নীচে উপরে অনেকগুলি গৃহ আছে। ইহা গণেশবাবুর অংশে পড়িয়াছে। তারপরেই ৪র্থ ও ৫ম মহল। ইহা বলাইবাবুর অংশে ছিল, তিনি স্বেচ্ছায় উহা সীতানাথবাবুকে বিক্রয় করিয়া ইটালীতে যাইয়া পৃথক বাটি নির্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।"

"ষষ্ঠ মহলে একটি পুষ্করিণী ছিল। তাহা মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া এখন উহাতে গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। সপ্তম মহলের অংশবিশেষ গৃহ ও অশ্বশালা হইয়াছে। ইহাতে ন্যূন্যাধিক ৩ শত গৃহ, ৬টি প্রাঙ্গণ আছে। ১২২০ সালে ইহার নির্মাণকার্য আরব্ধ হইয়া ১২২৮ সালে শেষ হয়। ইহাই রাসমণি-কুঠি নামে অভিহিত।"

"এতদ্ব্যতীত উমাচরণ দাসের লেনে রাণী যদুনাথবাবুর জন্য স্বতন্ত্র একটি বাটি নির্মাণ করান। দুঃখের বিষয়, জীবদ্দশায় যদুনাথবাবুকে ঐ বাটিতে বাস করিতে হয় নাই। ইহার বহু বৎসর পরে, রাণীর ৪র্থ কন্যা জগদম্বা দাসী ১৫নং মার্কেট স্ট্রীটে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বাটি প্রস্তুত করান। তাহাতে এখন ৺দ্বারিকাবাবুর সন্তানেরা বাস করিতেছেন।"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা কর্তৃক উক্ত বিবরণে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এই গ্রন্থে রাসমণি দেবীর বংশধর পরিচিতিতে তাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে। শ্রীসাঁতরার গ্রন্থটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এর পরে এই প্রাসাদটি ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে বর্তমানে ৪টি পৃথক নম্বরে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯ নং এস, এন, ব্যানার্জী রোডের অংশে রাসমণি দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির পুত্র গণেশচন্দ্র দাসের বংশধরগণ থাকেন এবং ২০, ২০এ ও ২০বি নং এস, এন, ব্যানার্জী রোডের অংশে শ্রীমতী পদ্মমণির অপর পুত্র সীতানাথ দাসের বংশধরগণ থাকেন।

১৮।৩এ, এস, এন, ব্যানার্জী রোডের অংশে রাসমণি দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর পুত্র যদুনাথ চৌধুরীর বংশধরগণ থাকেন।

১৩নং রাণী রাসমণি রোডের অংশে রাসমণি দেবীর চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের উত্তরাধিকারীগণ থাকেন।

অবশ্য রাসমণি দেবীর কয়েকজন বংশধর ঐ বাড়িতে বাস না ক'রে, বর্তমানে ব্যারাকপুর, আগড়পাড়া, সিঁথি প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এবং

ঐ প্রাসাদের কাছাকাছি ও কলকাতার নানাস্থানে নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৩নং রাণী রাসমণি রোডের অংশে (পূর্বে ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট) যখন রাসমণি দেবীর অন্যতম জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস বাস করতেন, তখন তাঁর একান্ত আগ্রহে, রাসমণি দেবীর অবর্তমানে, এই বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকবার আগমন বা অবস্থান ঘটেছিল। রাসমণি দেবী অপুত্রক থাকায় এবং তাঁর অপর দুই জামাতা অধিকাংশ সময় নিজ নিজ বাড়িতে বাস করায়, একমাত্র মথুরমোহনই তখন এই বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করতেন ও রাসমণি দেবীর সম্পত্তির তদারকি করতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরম ভক্ত মথুরমোহনের নিবিড় সম্পর্কের ফলে, রাসমণি দেবীর বাড়ির অন্দর মহলেও ঠাকুরের অবাধ গতি ছিল ; এমন কি, মথুরমোহনের শয়ন ঘরেও তিনি মথুরমোহন-দম্পতির কাছে বালকের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে একসঙ্গে শয়ন করতেন এবং তাঁরাও ঠাকুরকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত অন্যতম লীলাস্থলরূপে এই বাড়িটির সম্পর্কে বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করা একান্ত প্রয়োজন।

রাসমণি দেবীর এই বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন বা অবস্থান সম্পর্কে, স্বামী সারদানন্দ রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ"-গ্রন্থে বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। তার মধ্যে দু-একটি এই প্রকার ঃ—

"এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে লাগিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব— এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ নির্বন্ধ করিয়া জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ—তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)

"বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন। বাবা সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্দর অবধি গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি ? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি ?—বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকলপ্রকার মনোভাব যে জানেন, ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ-মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থ বিশেষ বলিলেও চলে। অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের ছেলে।" (লীলাপ্রসঙ্গ —তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)

এই সম্পর্কে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"-গ্রন্থে ঠাকুরের নিজ মুখের উক্তি— "সেজোবাবু আর সেজোগিন্নী যে ঘরে শুতো, সেই ঘরে আমিও শুতাম। তারা

ঠিক ছেলেটির মতন যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজোবাবু বলতো, 'বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুনতে পাও? আমি বলতাম, 'পাই'।" (কথামৃত—৪র্থ ভাগ, দশম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)*

এইভাবে দুর্গাপুজোয় বিশেষ বিশেষ ঘটনাসহ, ঠাকুরের নানা ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে রাসমণি দেবীর এই বাড়ির সঙ্গে; কিন্তু সবগুলির উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয় বা প্রয়োজনও নেই। অবশ্য সবগুলিই মধুর নয়, একটি অপ্রিয় ঘটনাও এই বাড়িতে ঘটেছিল। সেই ঘটনার কথাটি ব'লেই রাসমণি দেবীর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গটি শেষ করা হবে।

কালীঘাটের জনৈক হালদার বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন মথুরমোহন বিশ্বাসের কুলপুরোহিত। নাম 'চন্দ্র হালদার'; কিন্তু তিনি 'হালদার পুরোহিত' নামেই পরিচিত ছিলেন।

পরমভক্ত মথুরমোহন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং তাঁর প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শন করেন দেখে, হালদার-পুরোহিতের মন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। তিনি মনে মনে ধারণা করেন যে, ঠাকুর বুঝি কোন প্রকার বশীকরণ ক্রিয়ার দ্বারা বড়লোক মথুরমোহনকে নিজের অনুগত ক'রে রেখেছেন এবং সকল প্রকার সুবিধা আদায় ক'রে নিচ্ছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লোভী হালদার পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করেছিলেন।

একদা জানবাজারের বাড়িতে ঠাকুরের থাকাকালীন এক সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একাকী অর্ধবাহ্য অবস্থায় নিরালায় ব'সে থাকতে দেখে, হালদার-পুরোহিত তাঁর কাছে উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ধাক্কা দিতে দিতে বার বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কী উপায়ে ঠাকুর মথুরমোহনকে বশ ক'রেছেন। ভাবস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে হালদার-পুরোহিত এত ক্রুদ্ধ হন যে, ঠাকুরকে সজোরে পদাঘাত ক'রে তিনি অন্যত্র চ'লে যান। কিন্তু পরম করুণাময় ও ক্ষমাপরায়ণ ঠাকুর তাঁকে মনে মনে মার্জনা করেন এবং পাছে এই ঘটনা জানালে ভক্ত মথুরমোহন হালদার-পুরোহিতকে কঠিন দণ্ড দেন, সেজন্য ঠাকুর সেকথা তখন কারুকেই জানাননি। কিন্তু পাপের পরিণতি স্বরূপ কিছুদিন বাদেই ঘটনাচক্রে অপর এক অপরাধের জন্য মথুরমোহন কর্তৃক হালদার-পুরোহিত বিতাড়িত হন। পরবর্তীকালে, হালদার পুরোহিতের পদাঘাতের ঘটনা মথুরমোহনের কাছে ঠাকুর বিবৃত করায়, মথুরমোহন অত্যন্ত

*ঘটনাটি রাণীমার কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার আমলে। শ্রীমতী জগদম্বা ছিলেন রাণীমার চতুর্থা, তথা কনিষ্ঠা কন্যা। মথুরমোহনের সঙ্গে তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর প্রথম বিবাহ হওয়ায়, মথুরমোহন 'সেজবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। তাই কনিষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী জগদম্বার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হলেও, 'সেজবাবু' নামটি তাঁর বহাল ছিল। সেই হিসাবে সম্ভবতঃ ঠাকুর সেজবাবুর সঙ্গে শ্রীমতী জগদম্বাকেও সেজগিন্নী রূপে উল্লেখ ক'রে থাকতে পারেন।

ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন যে, এই কথা সেই সময় ঠাকুর তাঁকে জানালে, তিনি হালদার-পুরোহিতের মুণ্ডচ্ছেদন করতেন।

এই প্রাসাদটি ঠাকুরের অন্যতম লীলাস্থল ব'লেই প্রাসাদ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই সব কথার উল্লেখ করা হ'ল।

এই প্রাসাদটি দোতলা এবং হলুদ রঙের। পুরাতন ঐতিহ্যবাহী এই বাড়ির যে অংশে প্রধানতঃ ঠাকুরের আগমন ঘটত, সেটি পশ্চিম-দুয়ারী এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বর্তমানে বাড়ির বাইরের অংশে বহু দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। বাড়ির ভেতরে টিনের শেড্ দেওয়া বিরাট উঠান, যেখানে বর্তমানে বাড়ির গাড়ীগুলি থাকে। উঠানের বামদিকে মস্তবড় চণ্ডীমণ্ডপ,—আগে এখানে এই বাড়ির যাবতীয় পূজাদি হত—বর্তমানেও সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি হয়। এই চণ্ডীমণ্ডপেই শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চামর দিয়ে প্রতিমাকে ব্যজন করেছিলেন। এই অংশটি আগে বাড়ির বাহির-মহল নামে পরিচিত ছিল,—এরই সংলগ্ন লাল রঙের পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত একই ধরণের বাড়িটি অন্দরমহল নামে পরিচিত ছিল এবং সেই অংশেই রাসমণি দেবী বাস করতেন ও তাঁর পূজার ঘর ছিল। এই ১৩ নং বাড়ির দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত খাট, যাতে মথুরমোহনও সস্ত্রীক শয়ন করতেন, এবং ঠাকুরের ব্যবহৃত অন্যান্য কিছু জিনিস রক্ষিত আছে। বাড়ির এই অংশে ঢুকে ডানদিকের রোয়াক বরাবর দোতলায় যাওয়ার কাঠের সিঁড়ি আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল বলতে মূলতঃ এই বাড়িটি চিহ্নিত, যদিও বাড়ির অন্যান্য অংশেও তাঁর পদার্পণ হয়েছিল।

আগে এই বাড়ির ঠিকানা ছিল—৭১ নং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩। বর্তমানে এটির ঠিকানা—১৩নং রাণী রাসমণি রোড, কলকাতা-৮৭। মধ্য কলকাতার ধর্মতলার ট্রাম রাস্তার পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণমুখী রাস্তা—রাণী রাসমণি রোড ধ'রে কিছুটা গেলেই পূর্ব-পশ্চিমমুখী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড; এই রাস্তাটি অতিক্রম করলেই বামদিকে রাস্তার ওপরেই রাণী রাসমণি রোড ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের সংযোগস্থলে হলুদরঙের বিরাট এই দোতলা বাড়ি। এস্প্ল্যানেডের দিক থেকে জওহরলাল নেহরু রোড দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে প্রবেশ ক'রে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে, রাণী রাসমণি রোডের ওপর ডানদিকে পড়ে এই ১৩ং বাড়ি।

* * * *

বৈষয়িক, সামাজিক প্রভৃতি কাজকর্ম ছাড়াও ধর্মপ্রাণ রাজচন্দ্র নিজে বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করতেন এবং এজন্যও যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করতেন।

একদিন বৈশাখ মাসের দুপুরে রাজচন্দ্র নিদ্রা যাওয়ার সময় জনৈক সন্ন্যাসী অযাচিত ভাবে তাঁর বাড়িতে গলদ্ঘর্ম অবস্থায় উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর দেহটি

কৃশ হলেও বেশ উন্নত ও বলিষ্ঠ ছিল ; পরিধানে গৈরিকবস্ত্র ও ধূলিমাখা নগ্নপদ। সন্ন্যাসী দেউড়ীতে এসে দ্বারবানদের জানান যে, তিনি জমিদার রাজচন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু দ্বারবানেরা এই অসময়ে রাজচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে অনুমতি না দেওয়ায়, সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাদের প্রথমাবস্থায় খুব বাক্‌বিতণ্ডা হয়। অবশেষে সন্ন্যাসীর বিশেষ পীড়াপীড়িতে বাড়ির দাসীর দ্বারা অন্দরমহলে রাজচন্দ্রের কাছে এই সংবাদ পাঠানো হয়। অতঃপর রাজচন্দ্র দোতলার বৈঠকখানায় এসে সন্ন্যাসীকে সেখানে আনার নির্দেশ করায়, সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজচন্দ্রকে বলেন, 'আমার কাছে রঘুনাথ জিউ শিলা আছেন, আপনাকে দেবো, আপনি তাঁর সেবা করবেন, আপনার মঙ্গল হবে। আমি বহুদূরে তীর্থদর্শনে যাব ; ফিরব কিনা সন্দেহ।' এরপরেও আরও কিছু কথাবার্তার পর সেই অপরিচিত সন্ন্যাসী, রাজচন্দ্রকে রঘুনাথ-শিলাটি অর্পণ করেন ; কিন্তু বিনিময়ে রাজচন্দ্র কিছু দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সন্ন্যাসী সে প্রস্তাব প্রত্যাখান ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করেন। এই রঘুনাথজীউকে রাজচন্দ্র বাড়ির অন্দর মহলের ঠাকুর ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং রামচন্দ্রকে স্মরণে রেখে রাজচন্দ্র ঐ শিলাটির পাশে একটি রৌপ্যনির্মিত হনুমান মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঘুনাথ জীউ জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার পরিবারের 'কুলদেবতা', যাঁকে রাসমণি দেবী একদা নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও গোরাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জনৈক সন্ন্যাসী একটি অর্ধহস্তপরিমাণ 'বিষ্ণুমূর্তি' রাজচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে, সেটি কোন মূর্তি ছিলনা ; সেটি ছিল একটি 'রামশিলা', যা 'রঘুনাথজীউ' নামে অভিহিত। অতএব 'বিষ্ণুমূর্তি' উপহারের তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। পূর্বে সেটি পালাক্রমে শরিকদের বাড়িতে পূজা হত ; ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে সেটি দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাকান্তের মন্দিরে রেখে পূজা করা হচ্ছে।

* * * *

রাজচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁর কন্যাদের বিবাহ হয়। উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার সিঁথিগ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির বিবাহ হয় ; খুলনা জেলার সোনাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর বিবাহ হয় এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বিথারী গ্রাম নিবাসী মথুরমোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর বিবাহ হয় ; কিন্তু বিবাহের কয়েক বছর বাদেই একটি সন্তান রেখে করুণাময়ীর মৃত্যু হ'লে, চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার সঙ্গে মথুরমোহনের পুনরায় বিবাহ হয়।

এই জামাতাদের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে, কন্যাদের প্রতিটি বিবাহেই রাসমণি দেবীর সম্মতি ছিল এবং তাঁদের গুণাগুণ রাসমণি দেবী নিজেই বিবেচনা করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস সম্ভ্রান্ত বংশীয় মাহিষ্য-কুলীন হওয়ায় রাসমণি দেবী তাঁর বংশমর্যাদা বিবেচনা ক'রে, তাঁর সঙ্গে জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির বিবাহ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় জামাতা প্যারীমোহনও কুলীন মাহিষ্য বংশীয় জমিদার ছাড়াও অতিশয় রূপবান ছিলেন; তাই তাঁর অনিন্দসুন্দর রূপের মর্যাদায় তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর সঙ্গে রাসমণি দেবী বিবাহ দিয়েছিলেন। আর তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসও কুলীন মাহিষ্য বংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত হওয়ায়, শিক্ষার মর্যাদায় তাঁর সঙ্গে তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর বিবাহ দিয়েছিলেন; শ্রীমতী করুণাময়ীর মৃত্যুর পর এই শিক্ষিত জামাতাকে হাতছাড়া না করার অভিপ্রায়ে চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার পুনরায় মথুরমোহনের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ রাসমণি দেবীর বিবেচনায় বংশ, রূপ ও শিক্ষা—তিনটিরই মর্যাদা রক্ষিত হয়েছিল, যদিও সকল জামাতাই সদ্‌বংশজাত ও গুণবান ছিলেন।

* * * *

রাজচন্দ্র দাসের জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র ও দ্বিতীয় জামাতা প্যারীমোহন যথাক্রমে সিঁথি ও চৌরঙ্গীর নিজ নিজ বাড়িতে সস্ত্রীক বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে এসেও বাস করতেন। কিন্তু তৃতীয় জামাতা মথুর-মোহন বরাবরই শ্বশুরালয়ে রাসমণি দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় বাস করতেন। রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর অবশ্য অপর দুই জামাতাও শ্বশুরালয়ে চলে এসেছিলেন এবং বিধবা শাশুড়ী রাসমণি দেবীকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বিষয়-কর্ম দেখাশোনার ব্যাপারে রাসমণি দেবী অপর জামাতাগণের চাইতে মথুরমোহনের ওপরই বেশী নির্ভরশীলা হওয়ায়, প্রকৃতপক্ষে রাসমণি দেবীর আজ্ঞাবহরূপে মথুরমোহনই তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে বিষয়-কর্মাদি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, যদিও কর্তব্যবুদ্ধিতে রাসমণি দেবী এই অগাধ সম্পত্তি নিজেই বাড়িতে বসে পরিচালনা করতেন।

* * * *

রাসমণি দেবী যখন দাম্পত্যজীবনে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে অবস্থিতা, ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ তাঁর জীবনে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়।

একদিন রাজচন্দ্র গাড়ী ক'রে ভ্রমণের সময় গাড়ীর ভেতরেই অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে (Stroke) আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইঙ্গিতে গাড়ীর চালককে বাড়িতে ফিরে যাবার নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞাশূন্য হন। সেই অবস্থায় অনতিবিলম্বে রাজচন্দ্রের সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে বাড়িতে গাড়িটি এসে পৌঁছালে, দ্বারবান, কর্মচারী প্রভৃতি শশব্যস্তে এসে রাজচন্দ্রের সংজ্ঞাহীন দেহ বহন করে

ওপরের ঘরের পালঙ্কে শুইয়ে দেন এবং সকলকে এই বিপদের সংবাদ দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায়, সহরের মান্য, গণ্য, সম্ভ্রান্ত, ধনী ও পরিচিত ব্যক্তিরা সকলেই এসে রাজচন্দ্রের শয্যাপাশে উপস্থিত হন। রাসমণি দেবী তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে, সহরের বড় বড় ডাক্তারকে রাজচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। অনেকেই অনেক উপায় বা নানা ঔষধ নির্বাচন করলেন। রাস্তায়, বাড়ির সামনে, সিঁড়ির নীচে-ওপরে ঘাস, বিচালী, সতরঞ্চ, গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হ'ল, যাতে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে বা পায়ের শব্দে রোগীর রোগ না বাড়তে পারে। কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল চিকিৎসা ব্যর্থ করে রাজচন্দ্র ১২৪৩ বঙ্গাব্দে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন) মাত্র ৫৩ বছর বয়সে অজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। রাসমণি দেবীর বয়স তখন ৪৪ বছর। মৃত্যুকালে রাজচন্দ্র ৩ কন্যা, ৩ জামাতা, ৪'৫ টি দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও পত্নী রাসমণিকে রেখে গেলেন; আর রেখে গেলেন স্বোপার্জিত নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা, ৮ লক্ষ টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শেয়ার, ২ লক্ষ টাকা প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেওয়া ঋণ এবং ১ লক্ষ টাকা 'হুক ডেভিডসন এণ্ড কোম্পানীকে' দেওয়া ঋণ। এ ছাড়া নানা স্থানে স্থাবর-অস্থাবর বিষয়-সম্পত্তি, প্রাসাদ প্রভৃতিতো ছিলই। রাজচন্দ্রের কোন পুত্র না থাকায় তৎকালীন আইনানুযায়ী বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হয়েছিলেন তাঁর পত্নী রাসমণি দেবী।

* * *

স্বামীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে রাসমণি দেবী মাটিতে আছড়ে পড়েছিলেন এবং যুগ্মজীবনের বিচ্ছেদ ব্যথায় প্রথমাবস্থায় একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। স্বামী সোহাগিনী স্ত্রীর এই সময়কার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া কঠিন! স্বামীর অকাল মৃত্যুর তীব্র বেদনায় রাসমণি দেবী তিন দিন তিন রাত্রি অনশনে কাটিয়েছেন এবং মাটিতেই শয়ন করেছেন। এ শুধু রাসমণি দেবীর ব্যক্তিগত শোক নয়, জানবাজার প্রাসাদের সকলেরই সমান ও সমবেত শোক। তবু এই শোকের বিরহাতুর অন্তরে অপরদের চাইতে রাসমণি দেবী যে ব্যতিক্রম, সে কথা বলাই বাহুল্য। রাজচন্দ্ররূপ সমুদ্রকে আশ্রয় ক'রেই রাসমণি-তরঙ্গের লীলা, আবার সেই রাসমণি-তরঙ্গকে আশ্রয় ক'রেই রাজচন্দ্র-সমুদ্রের বিভূতি! আত্মিক বন্ধনে দুজনেই ছিলেন পরস্পর যুক্ত। সেই বন্ধনটি আজ ছিন্ন হয়ে গেল—মিলনানন্দের হ'ল অবসান! আর লৌকিক জগতে পরমপ্রিয় রাজচন্দ্রের সাক্ষাৎ মিলবে না—এখন থেকে শুরু হ'ল মানস সাক্ষাৎকার! মিলনে যা সংক্ষিপ্ত, বিরহে তা পরিব্যাপ্ত। মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা,—আবার বিরহে মিলনের আকাঙ্ক্ষা; মিলনে শুধু সঙ্গলাভ—বিরহে সর্বাত্মক স্মৃতি,—নিবিড় ধ্যান! এই অবস্থা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব; কারণ, এটি গভীর অনুভূতির বিষয়। তবুও ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীলা এই পুণ্যবতী, সতীসাধ্বী মহিলা—জগতের জন্ম-মৃত্যুকে স্বীকার ক'রেই এবং এটিও ঈশ্বরের ইচ্ছা—এই কথা স্মরণ ক'রে

নিজের শোক প্রশমিত করেন এবং পরলোকগত স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য রাজচন্দ্র-স্মৃতির অনন্ত সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অমৃতময়ী হয়ে ওঠেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসের অনাদি, অব্যক্ত চিৎশক্তি রাসমণি দেবীকে পুরাতন জীবনের ধ্বংসাবশেষের ওপর আবার নতুন জীবনের সৃষ্টি করল—'রাজরাণী রাসমণি'র অবলুপ্তি ঘটল—'তপস্বিনী রাসমণি'র আবির্ভাব হ'ল। রাসমণি দেবীর দাম্পত্য জীবনের এখানেই সমাপ্তি এবং এখান থেকেই বৈধব্য জীবনের শুরু।

॥ ৯ ॥

বৈধব্য জীবন

স্বামী রাজচন্দ্র দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে রাসমণি দেবী গভীর শোক পেলেও, স্বামীর শ্রাদ্ধ কার্য যাতে শাস্ত্রানুযায়ী এবং আড়ম্বরপূর্ণ হয়, তার জন্য বিশেষ আয়োজন করেছিলেন।

কলকাতার বাগবাজার নিবাসী কুলগুরু রামসুন্দর চক্রবর্তী এবং পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে তিনি সুচারুরূপে পরলোকগত স্বামীর "দান সাগর শ্রাদ্ধ" সম্পন্ন করেন এবং এই উপলক্ষে তাঁর ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

শ্রাদ্ধের দিনে সোনার ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ ও তিলকাঞ্চন ইত্যাদি সমাধার পর, একটি বৃষকে চিহ্নিত ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সংকীর্তনসহ বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পোতা হয়। নানা স্থান থেকে আগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই কাজে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বহু বনাত, কম্বল, তৈজস, বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে তিন দিন ধরে এই 'দান সাগর শ্রাদ্ধ' কাজের জের চলে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা তাঁর রচিত 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থের একস্থানে শ্রাদ্ধের বিশদ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ—

"প্রথম দিন শ্রাদ্ধের উপকরণদিগর সজ্জিত হইলে, প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল; ব্রাহ্মণেরা যে যাহার কার্য করিতে লাগিলেন। যাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল। পর দিবস ব্রাহ্মণ ভোজন, মহাকোলাহলে রাজ অট্টালিকা আকুলিত করিয়া তুলিল। ভোজন শেষ হইলে, বিদায়ের সময় আসিল। মিষ্টান্ন, সঘৃত গোধুমচূর্ণ-পেটিকা, দধি, ক্ষীর, ব্যঞ্জন এক এক জনে প্রচুর লইলেন। রাণীর অনুজ্ঞা ছিল যে, কেহ যেন মনঃক্ষুন্ন না হয়; তাহাই হইল। ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্তরূপ দক্ষিণা ও দান করা হইল। ব্রাহ্মণ বিদায়ের পর কাঙালী বিদায় আরম্ভ হইল। সেও এক বিষম ব্যাপার। তাহাও সম্পন্ন হইল। তারপর

দিবস নিয়মভঙ্গ। উহাও সমারোহে শেষ হইল। সকল কার্য্য সমাধা হইলে, আবার কাঙালী-বিদায়ের ঘোষণা হইল। না জানি, কত লোকেরই সেদিন সমাবেশ হইয়াছিল। অন্ধ, আতুর, অতিথি, খঞ্জ, দীন, দুঃস্থ, দুঃখী, বধির, ভাট, ভিক্ষু, পঙ্গু, ইত্যাদি ইত্যাদি কতই না আসিল। আনুমানিক ২৫।৩০ হাজার কাঙালী সমাবেশ হইল। জানবাজার, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, সমস্ত স্থানে বংশদণ্ড ও রজ্জুর সাহায্যে বন্ধনী দেওয়া হইল। বাটিতে কোথাও স্তুপাকার লুচি সজ্জিত রহিয়াছে, কোথাও স্তুপাকার বস্ত্র, কোথাও মিণ্টান্ন, কোথাও ব্যঞ্জন, কোথাও মৃৎপাত্র, কোথাও মৃন্ময় ভাণ্ড, কোথাও কদলীপত্র ইত্যাদির সমাবেশ রহিয়াছে।"

"তৎপর উষাকালে কাঙালী-বিদায় আরম্ভ হইল। ১টি মৃন্ময় পাত্রে করিয়া লুচি, সন্দেশ ও মিণ্টান্ন, অন্য মৃৎ-ভাণ্ডে করিয়া ব্যঞ্জন, ১ খানি বস্ত্র ও অর্ধ মুদ্রা করিয়া সকলকে দান করা হইল। ইহার মধ্যে ইতর বিশেষ ছিল না। বাল-বৃদ্ধ-যুবা-প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলকেই সমানভাবে দান করা হইল। সারাদিন ও সারারাত্রি সমভাবে দান কার্য্য চলিল। পরদিন প্রায় দেড় প্রহরের সময় দান-কার্য্য শেষ হইল। সকলেই রাণীর জয় জয়কার করিতে করিতে ও আন্তরিক আশীর্বাদ করিতে করিতে আপনাপনস্থানে চলিয়া গেল।"

"ইহার পর দিবস রাণী 'তুলট' করেন। তাঁহার দেহের ওজনে তৌলদণ্ডে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ করা হয়। মোট ৬০১৭ৎ টাকা রাণীর দেহের পরিমাণে হয়। এই মুদ্রা ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয়।'

"একে একে ব্রাহ্মণগণ বিদায় লইলেন। শেষে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। ইনি আর কেহই নহেন, যিনি রাজচন্দ্র বাবুর জীবদ্দশায় অকস্মাৎ দর্শন দিয়া, অযাচিতভাবে 'রঘুনাথজী' ঠাকুর দিয়া গিয়াছিলেন। রাণী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সন্ন্যাসী পরিচয় দিলে, রাণী বিশেষ সমাদর করেন। রাণী তাঁহাকে বলেন যে, তিনি তাঁহাকে কিছু না দিলে যেন তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি হয় না। তাহাতে সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন যে, "দো চিজ্ হাম্‌কো দেনা, লোটা, আউর কম্বল।" সন্ন্যাসীর অনাসক্তি দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। একটি লোটা ও একটি কম্বল তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি রাণীকে আশীর্বাদ করিলেন ও রঘুনাথ জীউ দর্শন করিতে চাহিলেন। রাণী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে রঘুনাথ জীউ দর্শন করাইয়া প্রণত হইলে আশীর্বাদ করতঃ সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন।"

"শ্রাদ্ধের সমারোহ ব্যাপার নির্বাহ হইল। দধিদুগ্ধে, পায়সে, ক্ষীরে, ব্যঞ্জনে, মিষ্টান্নে বৃহৎ রাজ অট্টালিকা বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল। পুনরায় সংস্কার করা হইল। দাস, দাসী, দ্বৌবারিক, দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, সরকার, কারকুন, ভাণ্ডারী, পাচক ব্রাহ্মণেরা বহু পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লইল।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটি পরিষ্কার ধারণা হয় যে, উপযুক্ত 'রাজসদৃশ'

স্বামীর উপযুক্ত 'রাণী সদৃশা' সহধর্মিনীরূপে পরলোকগত মহাজীবনের প্রীত্যর্থে রাজকীয় সমারোহে তাঁর শ্রাদ্ধাদি কাজে রাসমণি দেবী সেদিন নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন।

* * *

স্বামীর দেহত্যাগের পর থেকেই রাসমণি দেবীর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং 'ভোগিনী' থেকে 'যোগিনী'তে রূপান্তরিতা হ'য়ে তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য-জীবন শুরু করেন। গার্হস্থ-সন্ন্যাসের মাধ্যমে এই সময় থেকে এই সতীসাধ্বী মহিলা তাঁর দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতেন।

সকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাধার পর পট্টবস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় প্রতিদিন কুলদেবতা রঘুনাথ জীউকে প্রণাম ক'রে স্ফটিকের মালা নিয়ে জপে বসতেন। অতঃপর কোন ব্রাহ্মণকে একটি মুদ্রা প্রণামী দিয়ে স্বহস্তে প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত দুর্গা নাম লিখতেন। একটি মোটা ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করতেন; তার নীচেই কেবলমাত্র একগাছি সোনার হার শোভা পেত।

এরপর জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ, কাগজপত্রে স্বাক্ষর, কর্মচারী নিয়োগ, হিসাবাদি বুঝে নেওয়া প্রভৃতি নিয়মিত কাজগুলি তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন এবং প্রয়োজনে জামাতা মথুরমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এই সময় কোন দৌহিত্র তাঁকে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ ক'রে শোনাতেন ও এইভাবে তিনি দেশের সকল খবর অবহিত হতেন।

এ সব কাজ সেরে, দুপুরে তিনি স্নানের পর দীনদরিদ্রদের ১২টি মুদ্রা দান করতেন ও কুলদেবতার প্রসাদী ফলমূল সহ হবিষ্যান্ন আহারের পর বিশ্রাম করতেন।

বিকালে আবার বিষয় কর্মের আলোচনা সেরে, সন্ধ্যার সময় তিনি দেবার্চনায় নিযুক্তা হতেন। এই সময় করজোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেববিগ্রহের পূজারতি দর্শন করতেন এবং সেগুলির তত্ত্বাবধানও করতেন।

আর্য্য-শাস্ত্রের আলোচনা, পুরাণাদি পাঠ ও কথকথা শুনতে তিনি বিশেষ আগ্রহী থাকায়, প্রায়ই তাঁর বাড়িতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আগমন হত এবং ঐ সব ধর্মীয় আলোচনা ছাড়াও নামগান ও কীর্তনাদিও অনুষ্ঠিত হত। তিনি নিজেও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মীয় পুস্তকগুলি নিয়মিত পাঠ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তিনি বারব্রত, পূজা পার্বণ ও আচার-নিষ্ঠা সহ প্রকৃত ব্রহ্মচারিনীর মত জীবন যাপন করলেও, স্বামীর রেখে যাওয়া স্মৃতি স্বরূপ বিশাল সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তিনি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে পালন করতেন। ঘরে ব'সেই তিনি জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির সমস্ত খোঁজ রাখতেন এবং যেখানে গোলমাল দেখতেন, সেখানে একটা সুষ্ঠু সমাধানও ক'রে দিতেন। কেবলমাত্র জমিদারীর বাইরের কাজগুলির জন্য তিনি জামাতা মথুর-মোহনের সাহায্য নিতেন।

ধর্ম বিষয়ে রাসমণির মনে কোন গোঁড়ামি না থাকায়, তিনি কুলদেবতা রঘুনাথজীকে যেমন পূজা করতেন, জগন্মাতা কালিকাদেবীর প্রতিও তিনি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করতেন। তাই জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য তিনি যে শীল-মোহর তৈরী করিয়েছিলেন, তাতে—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীরাসমণি দাসী"—এই নামটি খোদিত ছিল।

স্বামীর মৃত্যু হলেও, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকর্মাদি রাসমণি দেবী কোনদিনও বন্ধ করেন নি, বরং উত্তরোত্তর সেই অনুষ্ঠানগুলির বৃদ্ধিই ঘটেছিল এবং নতুন নতুন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। এমনকি, পরলোকগত স্বামী রাজচন্দ্রের আমলে পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিও রাসমণি দেবী স্বামীর অবর্তমানে বাতিল করেন নি। ফলে, রাজচন্দ্রহীন প্রাসাদে রাজচন্দ্রের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং প্রাসাদটি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায়ই মুখরিত থাকত। পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রাসমণি দেবীর শ্বশুর প্রীতিরামের বাৎসরিক কাজ, শাশুড়ী যোগমায়া দেবীর বাৎসরিক কাজ, পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের বাৎসরিক কাজ, মাতা রামপ্রিয়া দেবীর বাৎসরিক কাজ, কোন মাসে কোন কন্যার সাধভক্ষণ, কারো-বা অন্নপ্রাসন, কারো-বা নামকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাসমণি দেবী তাঁর স্বামীর অভাবের কথা কারুকে বুঝতে দিতেন না। এইভাবে প্রায় ১২ মাসে ১৩ পার্বন তাঁর বাড়িতে লেগেই থাকত

এ ছাড়া অন্নদান, জলদান, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানাদির দ্বারা রাসমণি দেবী তাঁর বৈধব্য জীবনে পবিত্রতার জোয়ার আনেন। অবশেষে দেবসেবায় সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে ও দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈধব্য জীবনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের 'রাণী' রূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করেন।

॥ ১০ ॥

রথযাত্রা উৎসব

রাসমণি দেবী শক্তি আরাধনা করলেও মূলতঃ তিনি পিতৃসূত্রে বৈষ্ণবভাবাপন্না ছিলেন এবং শ্বশুরালয়েও 'রঘুনাথ জীউ' পরবর্তীকালে গৃহদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তবে, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর রচিত 'দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২১) উল্লেখ করেছেন যে, রাণী রাসমণি বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর শ্বশুরালয় ছিল শৈবপরিবার এবং সেজন্য তাঁর ধর্মমত ছিল সমুদার।

স্বামী রাজচন্দ্র দাসের জীবদ্দশায় বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও, রথযাত্রা উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান হত না। স্বামীর মৃত্যুর পর রাসমণি দেবী রথযাত্রা উৎসব করতে এবং সেই রথে গৃহদেবতা রঘুনাথ জীউকে বসাতে মনস্থ করেন। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ খৃঃ) রাসমণি

দেবী প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষে রথনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা কাজে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং গৃহদেবতা রঘুনাথ জীউকে সেই রথে বসিয়ে নিজ মানসিক অভিলাষ পূরণ করেন।

বাংলার নানাস্থানে নানাপ্রকার রথ হত, কিন্তু রাসমণি দেবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কাঠের রথের বদলে রূপার রথ করাবেন। কলকাতার অভিজাত পরিবারদের কাছে বিলাতী জহুরী হিসাবে 'হ্যামিল্টন কোম্পানী'র তখন খুব খ্যাতি ছিল। রাসমণি দেবীর অন্যতম জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের ইচ্ছা ছিল যে, এমন দামী রূপার রথ ঐ বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে তৈরী করানো হক এবং তিনি সেইমত তাঁর ইচ্ছা রাসমণি দেবীর কাছে প্রকাশও করেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস রাসমণি দেবীকে পরামর্শ দেন যে, উপযুক্ত দেশীয় কারিগর থাকতে বিদেশীর হাতে দেবকার্যের ভার দেওয়া সমীচিন নয়; তাছাড়া এই কাজের পারিশ্রমিক দেশীয় কারিগরেরা পেলে যেমন তাদের অভাব কিছুটা লাঘব হবে, তেমনি এই সব কাজের দ্বারা তারা তাদের কাজে উৎসাহও পাবে।

জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাসের যুক্তি মেনে নিয়ে রাসমণি দেবী দেশী কারিগর মারফৎই রথ তৈরী করা সাব্যস্ত করেন এবং সিঁথি, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বাছাইকরা কয়েকজন কারিগরকে এনে, তাদের বেতন দিয়ে বাড়িতে রেখে রথ প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়। দিনরাত পরিশ্রমের ফলে আষাঢ় মাসেই রথ তৈরীর কাজ শেষ হয়। রথটি রূপার হলেও, ৪টি চাকা ছিল কাঠের

* * *

রাসমণি দেবী প্রতি বছরেই মহা আড়ম্বরের সঙ্গে রথযাত্রা উৎসব পালন করতেন। রথযাত্রার সময় ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া, নাকাড়া, বাঁশী, জগঝম্প প্রভৃতি নানারকমের বাজনা তিনি আনাতেন এই বাজনা ও কীর্তনের দলগুলি রথের পেছনে পেছনে, পরপর সব যেতো। রূপার রথ ও এত রকমের বাজনা ও গানের দল থাকায়, লোকে দলে দলে 'রাণীর রথ' দেখতে আসতো। এমনকি, কলকাতা ছাড়াও দেশবিদেশের বহুলোক এই রথযাত্রা উৎসব দেখতে এসে আনন্দ লাভ করত।

এই রথযাত্রা উপলক্ষে রাসমণি দেবী তাঁর নিজের নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-কুটুম্বদেরও নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের বাড়িতে আনাতেন। তাঁরা সকলেই রাসমণি দেবীর বাড়িতে বাস ক'রে কয়েকদিন আনন্দ পেতেন। এজন্য রাসমণি দেবীর প্রতিবছর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ৮৷১০ হাজার টাকা খরচ হোত। একবার তিনি তাঁর রথযাত্রা উৎসব দেখার জন্য কলকাতার সব সাহেবদেরও আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন।

রাসমণি দেবীর এই প্রখ্যাত রথযাত্রা উৎসব সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরার অপূর্ব বর্ণনা সংগ্রহ করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তিনি তাঁর 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে রথযাত্রার বর্ণনায় লিখেছেন ঃ—

"স্নান যাত্রার দিন মহাধূমধামে রথ প্রতিষ্ঠা করা হইল। বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ও বিদায় দেওয়া হইল। মোট ১০২২০১১৫৲ (এক লক্ষ বাইশ হাজার একশত পনের) টাকা ব্যয় হইল। মহা সমারোহে মহানগরী কলিকাতার রাজপথে জনসাধারণের নয়নানন্দকর রৌপ্যময় রথ বাহির হইল। রাণীর জীবনকালে কয়েক বৎসর খুব ধুমধামে উৎসব হইয়াছিল।"

"গোযানে রৌসন চৌকি, সানাই, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, বাঁশী, জগঝম্প ইত্যাদি শতাধিক বাদ্যকরগণ শব্দে দিক মুখরিত করিয়া চলিত। শতাধিক উড়িষ্যা দেশবাসীর সুমিলিত সঙ্গীত ও তৎপশ্চাতে বাউলের দল, যাত্রার দল, বালক সঙ্গীতের দল, সংকীর্তন সম্প্রদায়, ভাঁড়ের দল, নানাবিধ রং তামাসা, পুত্তলিকা নাচানির দল: তৎপরে বাগবাজারের সখের নাম গান। বাগবাজারের হাফ আকড়াইয়ের দলের নামজাদা দোহারগণ আসিতেন। ইহাদের জন্য মাসাবধি কাল পূর্ব্ব হইতে বাটীতে গান সাধা যাতায়াতের, জলযোগের, তাম্বুল, তাম্রকূট ইত্যাদির ব্যয় বহন করা হইত। তাহার পশ্চাতেই গোয়ালটুলীর সখের দলের নাম গান। মধুসূদন দাস ও লোকনাথ হোড় প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে এই সখের দল বাহির হইত। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২॥ হইতে ৩ মণ হিসাবে যুঁই ফুলের মালা (গড়ে) খরিদ করা হইত। উহা হরি সংকীর্তন ও সখের দলের গায়কদিগকে দেওয়া হইত। তারপর, রথের সম্মুখে রাণীর গুরুদেব স্বর্ণচ্ছত্রতলে নগ্নপাদ জামাতাদিগের সমভিব্যাহারে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্ঠিত, গরদ ও চেলী পরিবৃত ও উপবীতাকারে উত্তরীয় বক্ষে বিলম্বিত, বদনে কপালে চন্দন-চর্চ্চিত, গলায় ফুলমালা, তুলসীমালা, স্বর্ণহার শোভিত হইয়া চলিতেন। তাঁহাদের পশ্চাতে নায়েব, দেওয়ান, সরকার, গোমস্তা, ঐরূপ যাইতেন; সঙ্গে সঙ্গে দাসগণ আড়ানিতে ব্যজন করিতে করিতে যাইতেন। তাঁহারাও নববস্ত্র পরিহিত, নব উষ্ণীষ শোভিত হইয়া প্রসন্নমনে চলিতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ-পাশ গোলাপ-বারি উদ্গীরণ করিয়া সৌরভে দিক আমোদিত ও দেহে পতিত হইয়া দেহমস্তক সিগ্ধ করিত। ৪।৫ শত লোক রথরজ্জু ধরিয়া রথ বহন করিত, রঘুনাথ জীউ রথে আসীন হইতেন। তাহারই পশ্চাতে দ্বিচক্র-যান, চতুশ্চক্র-যান, ঘুড়ী-চৌঘুড়ী, নানাবিধ যানে রানীর দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ নগ্নপাদ, নববস্ত্র-ফুলমালা-শোভিত, তিলক-খচিত, চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া যাইতেন। সারি সারি গোযানে করিয়া এরণ্ড তৈল, শুষ্ক নারিকেল শস্য, রাত্রে আলোকের জন্য আলোকাধার, প্রস্তুত তাম্বুল, তাম্রকূট, হুকা, গড়গড়া, ফরসী ও একটি বৃহৎ মৃৎপাত্রে করিয়া অগ্নিবাহিত হইত। এতদর্থে ১০।১২ খানি গোযান চলিত। সকল যানের পার্শ্বেই দৌবারিক উলঙ্গ তরবার, বংশযষ্টি লইয়া সাবধানে প্রহরায় নিযুক্ত। পুরোভাগ হইতে অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত স্থূল রজ্জুবদ্ধ বংশদণ্ড সমন্বিত, হরিনামাঙ্কিত লোহিত পতাকা পত্‌পত্‌ রবে উড্ডীয়মান থাকিত। এইভাবে অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী পথ জুড়িয়া রথ চলিত। সঙ্গীতে, বাদ্যে, কোলাহলে,

হরিবোলে দিক মুখরিত হইত। মধ্যে মধ্যে বিরাম ও শ্রমপোনদন, তাম্বুল ও তাম্রকূট সেবন, নামগান হইত, পুনরায় চলিত। রথ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চক্র চতুষ্টয় ব্যতীত সকলই রৌপ্যময়। সুতরাং অভিনব সামগ্রী দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে লোক সমাগম হইত। তখনকার দিনে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে অষ্টাহকাল ব্যাপী উৎসবে রাণী ন্যূনপক্ষে আট হাজার টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন। এই উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্ব সকলকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করা হইত ও পরম পরিতোষ সহকারে অষ্টাহকাল পান ভোজনে তুষ্ট করা হইত।"

"এক বৎসর রাণী সহরের সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ভোজ দেন ও পরিপাটীরূপে বাটী সজ্জিত করেন। সাহেব, মেম, সকলে বাটী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—Our eyes never met such a gorgeous, pompous extraordinary Occasion like this."

এইভাবে রাসমণি দেবী তাঁর প্রকৃতিগত ধর্মভাবকে প্রকৃত রুচিবোধ ও আচার-নিষ্ঠা পালনের মাধ্যমে জাগ্রত ক'রে সবাইকে আনন্দদান করতেন।

* * *

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাসমণি দেবীর দেহত্যাগের পর, তাঁর সেই রুপার রথ তাঁর অন্যতম দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস (শ্রীমতী জগদম্বা ও মথুরমোহন বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র) নিজের বাড়ির অংশে রাখেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাসমণি দেবীর আর এক দৌহিত্র বলরাম দাস (শ্রীমতী পদ্মমণি ও রামচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় পুত্র) ২৯৪ নং মামলায় রথ ও দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে ত্রৈলোক্যের নামে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রথের মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং ঐ বছরে রথের প্রথম পালা বলরাম দাস প্রাপ্ত হন। রাসমণি দেবীর পাঁচজন দৌহিত্রের মধ্যে পালাক্রমে তাঁর রুপার রথটির ভার পড়ে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রুপার রথের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায়, বলরাম দাস অন্যান্য অংশীদারগণকে রথখানি ভেঙে তার পরিবর্তে একটি নতুন রথ প্রস্তুত করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু সেই বিষয়ে কেউ সাড়া না দেওয়ায়, কেবলমাত্র অমৃতনাথ দাস (শ্রীমতী পদ্মমণি ও রামচন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র সীতানাথের একমাত্র পুত্র) এবং স্বয়ং বলরাম দাস—দুজনে মিলে ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে পুরানো রথের অনুরূপ আর একটি নতুন রথ নির্মাণ করান এবং নিজেরাই তাঁদের নিজ গৃহদেবতা 'বামনদেব জীউ'কে সেই রথে বসিয়ে রথোৎসব পালন শুরু করেন। এই সময় রাসমণি দেবীর রথের সঙ্গেই এটি একত্রে রাস্তায় বার হত। পরবর্তীকালে, এই রথটিও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় এবং এই রথোৎসবও বন্ধ হয়ে যায়। রাসমণি দেবীর রুপার রথটি বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আছে।

॥ ১১ ॥

দুর্গোৎসব

রাজচন্দ্র দাসের জীবদ্দশাতেই তাঁদের বাড়িতে দুর্গোৎসব হতো। কিন্তু রাসমণি দেবী বিধবা হওয়ার পর থেকে, বাঙালীর প্রধান উৎসব—'দুর্গোৎসব' আরো জাঁকজমক ও ধূমধামের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে পালিত হত।

রাসমণি দেবীর বাড়িতে সমস্ত পূজা-উৎসবাদির মধ্যে দুর্গাপূজাই ছিল বিশেষ সমারোহের অনুষ্ঠান। পূজার নৈবেদ্য, উপকরণ প্রভৃতিতে তিনি যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন, তেমনি পূজা উপলক্ষে লোকজন খাওয়ানো, দান-ধ্যান প্রভৃতিতেও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করতেন। পূজার কদিন আগে থেকে শুরু ক'রে কয়েকদিন পর পর্যন্ত রাসমণি দেবী নানা ধরণের যাত্রা ও গানের দল এনে আনন্দময়ীর আগমনকে সত্যই মহানন্দে পরিণত করতেন।

এই দুর্গোৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা, তাঁর রচিত 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ ক'রেছেন ঃ—

"পূর্ববঙ্গে রাণী ভবানীর দুর্গোৎসব ব্যতিরেকে দক্ষিণবঙ্গে রাণী রাসমণির দুর্গোৎসবের মত দুর্গোৎসব বোধ হয় আর কোথাও হইত না। পূজার বস্ত্রাদি, ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের জন্য বেনারসি জোড়,—কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রীদিগের জন্য নব বস্ত্র উত্তরীয় ; সরকার, গোমস্তা, নায়েব, দেওয়ান, কারকুন, চোপদার, দৌবারিক, ফরাস, ভাণ্ডারী, দাস-দাসী, পাচক, পূজারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য যথাযোগ্য বস্ত্র, উত্তরীয়, অঙ্গমার্জনী, মুরাঠা, তাজ, সাটী ; আত্মীয়া-কুটুম্বিনী-দিগের জন্য সাটী, সিঁদুর ; কুমারী, সধবাদিগের জন্য সাটী শাঁখা, সিন্দুর ; বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ বালকদিগের জন্য ধুতি, উড়ানি, বহুল পরিমাণে ক্রয় করা হইত। দৌবারিকদিগকে বক্সিস দেওয়া, অধস্তন কর্মচারীদিগকে প্রতিমার দক্ষিণাদানের জন্য টাকা দেওয়া হইত, দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগকেও প্রণামী দেবার জন্য টাকা দেওয়া হইত। ২২।২৩ হাজার টাকার বস্ত্রাদি খরিদ করা হইত। প্রতিমার পূজায় ১০ হইতে ১৫ হাজার টাকার বস্ত্রাদি খরিদ করা হইত। ৫।৭ শত সধবাদিগকে সাটী শাঁখা, সিন্দুর দেওয়া হইত। কুমারীদিগকে (সংখ্যায় ১০০০। ১২০০ হইবে) নববস্ত্র পরাইয়া পরিতোষ পূর্বক ভোজন করানো হইত। জগজ্জননীর আগমনে, আনন্দময়ীর অধিষ্ঠানে—দিবসত্রয় ব্যাপিয়া বাদ্যরোলে, দাসদাসীর কোলাহলে, দৌহিত্রদিগের আনন্দরোলে, ব্রাহ্মণদিগের 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে, নিমন্ত্রিতদিগের আগমনে, বৃহৎ ভবন হিল্লোলে প্রবাহিত হইত। পূজার পূর্ব হইতে একপক্ষকাল বোধন হইত ; দেবীর পূজাবসানে অষ্টাহ ব্যাপী আমোদ ব্যসনে পর্যবসিত হইত। কোনদিন দাশরথী রায়ের পাঁচালী, কোনদিন গোবিন্দচন্দ্র অধিকারীর যাত্রা, কোনদিন হাফ্ আকড়াই, কোনদিন ফুল আকড়াই, কোনদিন বালক সঙ্গীত

ইত্যাদি প্রকার নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইত।...দশমীর দিন বহুদূর হইতে কুস্তিগীর আসিত। বল পরীক্ষা করা হইত। তাহাতে ১০।২০।৫০্ এমনকি ২০০্ টাকা পর্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া হইত। জেতা ব্যক্তি যাহা পাইত, পরাজিত তাহার এক চতুর্থাংশ পাইত। ঘৃত ও সিন্দূর লেপন করিয়া একটি শীর্ষবিহীন ডাব ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং বলে যে সকলকে পরাজিত করিয়া লইতে পারিত, সে ১০্ টাকা পুরস্কার ও একখানি বস্ত্র পাইত। সে সময়ে কত দর্শক আসিত। কত উৎসাহ লোকের মুখে দেখা যাইত।"

এইভাবে তখনকার দিনে রাসমণি দেবী তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবে প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা খরচ করতেন এবং প্রকৃতপক্ষে এত ধুমধামের সঙ্গে পারিবারিক দুর্গাপুজা সম্ভবতঃ খুব অল্প বাড়িতেই হত। এছাড়া, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজো, কার্তিকপুজো, বাসন্তীপুজোও যেমন হত, জন্মাষ্টমী, দোল, রাস, প্রভৃতিও খুব আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। এখনও রাসমণি দেবীর বাড়ীতে দুর্গোৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়

॥ ১২ ॥

দোল, রাস ও জন্মাষ্টমী

রাসমণি দেবীর বাড়িতে রঘুনাথ জীউ থাকার জন্য দোল, রাস ও জন্মাষ্টমীর উৎসবগুলি নিয়মিতভাবে পালিত হত এবং প্রতিটি উৎসবে রাসমণি দেবী পুজা ছাড়াও দানধ্যান ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও অভাব ছিল না। উৎসব মানেই আনন্দ—সেই আনন্দ উপভোগের জন্য যা কিছু করণীয়, সবই করতেন রাসমণি দেবী।

রাসমণি দেবীর বাড়ীতে দোলোৎসবের মনোরম বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা তাঁর 'রানী রাসমণি'-গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন ঃ—

"রঘুনাথ জীউ ঠাকুরের দোল ও রাসোৎসব হইত। যে দেখে নাই সে বুঝিবে না, দোলের সময় কি বিরাট ব্যাপার হইত। গোয়ালিয়ারের বিখ্যাত গায়ক 'জেবায়ালাপ্রসাদ' আসিয়া সন্ধ্যার পর দোলের দিবস সকলকে গানে পরিতৃপ্ত ও মোহিত করিতেন। তেমন গায়ক বুঝি আর ভারতে জন্মিবেনা।"

"দোলের দিন প্রাতঃকালে রঘুনাথ জীউকে ঠাকুর দালানে আনয়ন ও মণ্ডোপরি স্থাপন করা হইত। রাণীর জামাতাগণ স্নান ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্রে অগ্রে গঙ্গাজল বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেন ও পশ্চাতে পুরোহিত 'ঠাকুর' লইয়া আসিতেন। তাঁহার অভিষেক কার্য্য সমাধা হইলে, সকলে ঠাকুর প্রণাম, ব্রাহ্মণ গুরুজনকে প্রণাম, প্রণামী প্রদান ও দোলের পার্বনী লইয়া দোল

খেলিত। ১০।১২টি গোযানে করিয়া পিচকারী, ফাগ, আবীর, কুমকুম, নানাবিধ চিনির খেলনা আসিত। নববস্ত্র, পার্ব্বনী, পিচকারী, রং সকলকে দেওয়া হইত। ফাগ, আবীর, কুমকুম, অন্দরে বাহিরে স্তরে স্তরে রাখা হইত। যাহার যত ইচ্ছা লইত, মাখিত, খেলিত, পরস্পরের অঙ্গে দিত, কাহারও নিষেধ ছিল না। কেহ কাহাকে কুমকুম মারিত, কেহ কাহাকে পিচকারি দিত, রং গোলাপজলে সিক্ত থাকাতে সৌরভে দিক আমোদ করিত। অন্তঃপুরে, বাহিরে, উপরে, নীচে, ভিত্তিগাত্রে, প্রাঙ্গণে যে দিকে দৃষ্টিপাত করো, লালে লাল হইয়া যাইত। দোলের পর মাসাবধিকাল জানবাজারের রাস্তা লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকিত। বাটীতে ভিতরে, উপরে, নীচে এত ফাগ, আবির পড়িয়া থাকিত যে, সপ্তাহকাল ফাগের উপর দিয়াই সকলে যাতায়াত করিত। কেহ কেহ বা অঞ্চল ও দুকুল ভরিয়া ফাগ লইয়া যাইত। পুনঃ সংস্কার না করিলে, বাটী বাসোপযোগী হইত না। সর্বোপরি, দৌবারিকদিগের আমোদ অত্যধিক। লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া নানাবিধ বাদ্য সহযোগে গান করিত। কোলাহলে আকুল করিত। কয়েক দিবস নিদ্রাই হইত না। মনে হইত, যেন নিবৃত্ত হইলেই রক্ষা পাওয়া যায়। দীন দরিদ্র কেহ অভুক্ত থাকিত না। রাস্তার ধারে ধারে নানাবিধ খেলনা, আহার্য্য সামগ্রী, শিশুদিগের মন ভুলানো সামগ্রীর বাজার বসিত। নাচ তামাসারও বন্দোবস্ত ছিল।"

উপরোক্ত বর্ণনায় তখনকার দিনে দোল-উৎসরের নির্দোষ আনন্দের একটি চিত্র পাওয়া যায়, যা বর্তমান কালে অনেকক্ষেত্রে কুৎসিৎ, মারাত্মক ও বিপজ্জনক আনন্দে পরিণত হয়েছে, একথা স্বীকার করা সঙ্গত মনে করি।

* * *

রাসমণি দেবীর বাড়িতে রাসোৎসবের বিশদ বর্ণনায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা তাঁর 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, সেটিরও হুবহু উদ্ধৃতি না দিলে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই হবে না। যথা ঃ—

"দোলের দিনের মত রাসের দিনও রঘুনাথ জীউকে ঠাকুর দালানে আনয়ন করা হইত। ঠাকুরের সম্মুখে নানাবিধ নয়নরঞ্জক সাজ সজ্জিত আলোকে আলোকিত, গন্ধদ্রব্যে দেবস্থান ও অট্টালিকা আমোদিত হইত। সম্মুখে প্রমাণ মোমের কদম্ব বৃক্ষ, তাহাতে মোমের ফুল ও ফল, যেন সজীব বলিয়া ভ্রম হইত। উপরে জাল দেওয়া হইত, জালে শোলার নানাবিধ কৃত্রিম পশু, পক্ষী, ফল, ফুল সজ্জিত থাকিত। উপরে ও নীচে থামের গাত্রে লাল সালুমোড়া মকমলের ফুলগাছ, তাহাতে লৌহতার বিন্যস্ত করা ; ফুল সমেত তার, মাঝে মাঝে চুমকির কাজ থাকাতে রাত্রিতে বোধ হইত যেন প্রকৃত বৃক্ষে খদ্যোত সমাবেশ হইয়াছে, দিবাভাগে খধূপ প্রকাশ পাইলে সে দৃশ্য অপসারিত হইত। হিম, বৃষ্টি, রৌদ্র জন্য আবরণ স্বরূপ উপরে লাল দেওয়া হইত। উপরে নীচে চারিদিকে নিমন্ত্রিতগণের আসনের স্থান হইত। আতর, গোলাপ, পুষ্প, মালা, তাম্বূল,

তাম্রকূট প্রভৃতি প্রদানে সকলকে পরিতোষ করা হইত ও শেষে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, সঘৃত-গোধূম-চূর্ণ-পেটিকা, দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর, মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করান হইত। বহু ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত ও ২ টাকা হইতে ১৬ টাকা পর্য্যন্ত যোগ্যতানুসারে মর্য্যাদা ও বিদায় দেওয়া হইত। একখানি করিয়া আসন, একটি সদ্বীপ দ্বীপাধার প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইত, তাঁহারা সন্ধ্যার পর হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দালানে বসিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতেন। তৎপর এক একজন ব্রাহ্মণকে এক একটি মৃন্ময় পাত্রে করিয়া জলযোগার্থে মিষ্টান্ন দেওয়া হইত। তিন দিন কাল পূজাপাঠ করিয়া চতুর্থদিনে সবলে বিদায় লইতেন। গোবিন্দ অধিকারীর এ ক্ষেত্রেও বাঁধা আসর; পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, গোষ্ঠ, মাথুর, মিলন, একে একে শুনাইয়া সকলকে আনন্দিত করিতেন। অন্যান্য নাচ তামাসাও হইত। শেষ দিন একটি খেলা হইত; বাক্সে ১০।১২ টাকা রাখিয়া প্রাঙ্গণে দুই দিকে দুইজন সুচতুর লাঠিয়াল লাঠি খেলিত, খেলিতে খেলিতে কৌশলে অন্যের গতি রোধ করিয়া যে বাক্স লইতে পারিত, তাহারই জয় হইত। জেতা ব্যক্তি বাক্স সমেত মুদ্রা পাইত। ইহা দেখিতে না জানি কত লোকেরই সমাবেশ হইত। দূর দূর হইতে সানাই, বাঁশের বাঁশী শুনাইতে বহুলোক আসিত ও পুরস্কার পাইত।”

*   *   *

রাসমণি দেবীর বাড়িতে জন্মাষ্টমীর উৎসব সম্পর্কে শ্রীসাঁতরা মহাশয় জানিয়েছেন ঃ—“জন্মাষ্টমীর পর নন্দোৎসবের দিন দধিকর্দ্দমের বিশেষ আমোদ হইত। বড় বড় পালোয়ান, খ্যাতনামা কুস্তীগীর আসিত ও বল পরীক্ষা হইত।”

এইভাবে রাসমণি দেবীর বাড়িতে যে আনন্দানুষ্ঠান হত, তাতে বাঙালীর উৎসবমুখর জীবনের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ১৩ ॥

তীর্থ ভ্রমণ

স্বামী রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর বহুকাল পরে, রাসমণি দেবী কয়েকবার তীর্থ-ভ্রমণে যান এবং এই উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) তিনি পুরুষোত্তম জগন্নাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে জলপথে নৌকা যোগে পুরী যাত্রা করেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে সাগর সঙ্গমের মুখে তাঁদের নৌকাগুলি এসে পৌঁছালে, হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় এবং নৌকাগুলিও থেমে যেতে বাধ্য হয়। ঝড়ের প্রচণ্ডবেগে নৌকাগুলি প্রায় জলমগ্ন হওয়ায় অন্যান্যদের সঙ্গে বিপন্না রাসমণি দেবীও নৌকা থেকে তীরে নেমে আশ্রয়ের খোঁজে চারিদিকে ঘুরতে থাকেন। এমন সময় দূরে

একটি কুটীর দেখতে পেয়ে তিনি একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানেই উপস্থিত হন। কুটীরটি ছিল এক দরিদ্র বিধবা ব্রাহ্মণীর। (মতান্তরে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির)। নিজের পরিচয় গোপন রেখে রাসমণি দেবী সেই দুর্যোগের রাত্রে সেখানেই বাস করেন। পরের দিন ঝড় থামলে, তিনি সেই ব্রাহ্মণীকে ১০০ টাকা প্রণামী দিয়ে আবার নৌকাযোগে পুরী যাত্রা শুরু করেন। সুবর্ণরেখা নদীর পরপারে গিয়ে তিনি দেখেন যে, পুরীধামে যাওয়ার ভাল রাস্তা নেই। পরে অবশ্য তাঁরই অর্থে সুবর্ণরেখা থেকে পুরী অবধি ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয়েছিল।

পুরীধামে গিয়ে রাসমণি দেবী দানধ্যানে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তিনটি হীরকখচিত মুকুট প্রস্তুত করিয়ে দেন; এজন্য সেই সময়েই তাঁর প্রায় ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। এছাড়া, সেখানকার পাণ্ডাদের তিনি নগদ এক হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং একছত্র ভোজনে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছিলেন।

সেই বছরেই (১২৫৭ বঙ্গাব্দে) মাঘ মাসে রাসমণি দেবী গৌরাঙ্গ-লীলা-স্মৃতি দর্শনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে যান এবং সেখানে গৌরাঙ্গ-লীলা-মহিমায় মুগ্ধ হন। সেই সময় চন্দ্রগ্রহণের শুভলগ্ন থাকায়, নবদ্বীপে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল। রাসমণি দেবী পাঁচশো খানি গরদের জোড় এনে গঙ্গার ঘাটে ব্রাহ্মণদের দান ক'রেছিলেন। তিনি সেইবার এক সপ্তাহ নবদ্বীপে বাস ক'রে-ছিলেন এবং সেই সময় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবায় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে চন্দননগরের কাছে তিনি দস্যুদের কবলে পড়েন এবং বারো হাজার টাকার বিনিময়ে উদ্ধার পান।

এর পরের বছরেই (১২৫৮ বঙ্গাব্দে / ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে) রাসমণি দেবী গঙ্গাসাগর যাত্রা করেন। সে সময়েও তাঁর সঙ্গে বহু লোক গিয়েছিল।

সেই বছরেই (১২৫৮ বঙ্গাব্দে / ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে) রাসমণি দেবী উত্তরায়ণে স্নানের জন্য ত্রিবেণী গিয়েছিলেন। সেই সময় ত্রিবেণীর তীর্থখ্যাতি বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। (তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাসও মাঝে মাঝে ত্রিবেণী যেতেন)।

ত্রিবেণী থেকে রাসমণি দেবী পুনরায় নবদ্বীপ ও অগ্রদ্বীপে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। নবদ্বীপে রাসমণি দেবী আরো কয়েকবার গিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়।

এইভাবে দীর্ঘদিন তীর্থযাত্রার দরুন রাসমণি দেবীর প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, ১২৫৭ বঙ্গাব্দে রাসমণি দেবীর পুরীতে তীর্থভ্রমণের পূর্বেই ১২৫৪ বঙ্গাব্দে তিনি কাশীযাত্রার উদ্যোগ ক'রেছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে দেবীর আদেশে তিনি কাশীযাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী ১৫ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

জন্মভূমি দর্শন

বিবাহের পর থেকে নানা কর্মব্যস্ততার দরুন রাসমণি দেবী তাঁর জন্মভূমি কোনাতে যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে, আবার পিসি-মাতা ক্ষেমঙ্করী দেবীরও মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুর পর কিছু দিনের জন্য রাসমণি দেবী তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা—রামচন্দ্র ও গোবিন্দকে নিজের কাছে আনিয়েছিলেন এবং পিত্রালয়ের জমির বাৎসরিক খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। সেখানে কেউ বাস না করার ফলে, পিতার বাস্তুভিটাটির কোন চিহ্ন ছিল না।

রাসমণি দেবীর প্রাণে খুব ইচ্ছা জাগে যে, তিনি একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যাবেন। কিন্তু সেখানে বাসস্থানের জায়গা না থাকায়, তিনি কয়েকদিন আগে সেখানে কিছু টাকা ও ২ জন লোক পাঠিয়ে বাস্তুজমির ওপর অস্থায়ীভাবে ২।৩ রাত বাস করার জন্য ২টি মাটীর ঘর সমেত একটি কুটির নির্মাণ করান। একদা উত্তরায়ণে ত্রিবেণীতে স্নান ক'রে, রাসমণি দেবী বহুকাল বাদে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) জন্মভূমি কোনাগ্রামে এসে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে মহিয়সীরূপে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায়, তাঁকে দেখার জন্য কোনা, হালিসহর, মালঞ্চ, কাঞ্চনপল্লী, জোঠ, বিজনে, হাজিনগর, নৈহাটি, কাঁঠালপাড়া, হুগলী, বংশবাটী, বন্দেল, বালী প্রভৃতি দূরের ও নিকটের বহুলোক গঙ্গার উভয়তীর থেকে দলে দলে এসে উপস্থিত হন। পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা, মাতা, পিসিমাতা ও বাল্যসখীদের কথা স্মরণ ক'রে রাসমণি দেবী শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। এই সময় বহু ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, প্রতিবেশী এসে তাঁর সঙ্গে নানা কথাবার্তা ব'লে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং কয়েকজন বাল্যসখীকে দেখেও তিনি বিশেষ আনন্দ পান। সেখানে তিন রাত্রি বাস করার সময় রাসমণি দেবী কাউকে অর্থ, কাউকে বস্ত্র, কাউকে আহার, কারোর ঋণ মুক্তি, কারোর নবজাত শিশুদের উপঢৌকন, কোন নব বিবাহিত বর-বধূকে যৌতুক দান, গ্রামের অন্ধ-আতুর-উপায়হীনদের অর্থদান প্রভৃতি নানা-ভাবে নিজেকে উজাড় করে দেন। এ ছাড়া সধবা, বিধবা, বালক-বালিকা সকলকেই তিনি আনন্দ দান করেন। এমনকি, তাঁর প্রিয় বাল্য সখী, বৃন্দাবন ঘোষের কন্যা তরুলতা কোন কারণে অভিমান ভরে তাঁর কাছে না আসায়, তিনি নিজেই তার বাড়িতে গিয়ে বাল্যকালের অভ্যাসমত তার মানভঞ্জন করেন। তরুলতাকে তিনি অর্থ বস্ত্রাদি দিয়ে এবং তার বিধবা মাতাকে একখানি দামী পট্টবস্ত্র ও কিছু অর্থ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন।

তিন রাত্রি জন্মভূমিতে বাস করার পর, বিদায়কালে রাসমণি দেবীর কাছে

গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হন এবং তাঁকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে সকলের স্নানের সুবিধার জন্য একটি স্নানঘাট নির্মাণের আবেদন রাখেন। তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাসমণি দেবী পরে তাঁর পরলোকগতা মাতা রামপ্রিয়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে ৩০/৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি পাকা স্নান ঘাট করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময় হুগলী নিবাসী কিছু লোকও হুগলীতে একটি স্নানঘাট নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়ায়, তিনি সেটিও করিয়ে দিয়েছিলেন। বাবুগঞ্জের কাছেও তিনি একটি স্নানঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন।

জন্মভূমি দর্শনের পর, হালিশহর থেকে গঙ্গাপার হয়ে রাসমণি দেবী বংশ বাটীতে 'দেবী হংসেশ্বরী' দর্শনে যান এবং সেখানে রাজা নৃসিংহ দেবরায়ের স্ত্রী ও হংসেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী শঙ্করীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসমণি দেবী বংশবাটীর ব্রাহ্মণদের কিছু অর্থদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু রাণী শঙ্করী এ বিষয়ে রাসমণি দেবীকে সম্মতি না দেওয়ায়, তিনি শুধু দেবী দর্শন ক'রেই ফিরে এসেছিলেন, কোন দানের সুযোগ পাননি।

॥ ১৫ ॥

কাশীযাত্রার উদ্যোগ ও স্বপ্নাদেশ

"কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাসমণি দাসী" বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর ধর্মমত ছিল খুব উদার এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তমতের অনুসারিণী। কোন দেবদেবীর প্রতিই তাঁর কোন ভেদাভেদ না থাকায়, ধর্ম জগতে দক্ষিণেশ্বর-রঙ্গমঞ্চের তিনিই ছিলেন প্রধান নায়িকা। বাড়িতে গৃহদেবতা রঘুনাথজীউ প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি কালীঘাটে বাগান বাড়ি, পুষ্করিণী এবং আদিগঙ্গায় পাকা ঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে তিনি প্রতিমায় কালী পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রতদানাদি অনুষ্ঠানও করতেন। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ) রাসমণি দেবী ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য কাশীযাত্রার উদ্যোগ করেন। ভারতে তখন রেল লাইন না থাকায়, স্থলপথে বা জলপথে কাশীতে যেতে হ'ত। পথের সর্বত্রই দস্যুর ভয় থাকায়, যাত্রীরা অন্ততঃ ৫০।৬০ জন একসঙ্গে দূরের তীর্থযাত্রায় বার হতেন। রাসমণি দেবীও জলপথে কাশীযাত্রায় যাওয়া স্থির করায়, সেইমত ২৫ খানি নৌকা, ৬ মাসের উপযোগী দ্রব্যাদি এবং বহু আত্মীয়, স্বজন, দাস-দাসী, দ্বারবান প্রভৃতি সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে ২৫ খানি নৌকার যে তালিকা পাওয়া যায়, তার বিবরণটি এই রকম ঃ—

নৌকা

১ খানি নিজের জন্য।	১ খানি রজকের জন্য।
৩ ,, জামাতাদের জন্য।	১ ,, ডাক্তার ও ঔষধের জন্য।
৪ ,, আত্মীয়-কুটুম্বদের জন্য।	৪ ,, চাউলের জন্য।
২ ,, আমলাদের জন্য।	৩ ,, তৈল, লবণ ইত্যাদির জন্য।
২ ,, দ্বারবানদের জন্য।	১ ,, ৪টি গাভীর জন্য।
২ ,, দাসীদের জন্য।	১ ,, বিচালীর জন্য।

এইভাবে ২৫ খানি বজরা প্রস্তুত ক'রে, যথাযথ দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে সাজানো হয় এবং পরের দিন কাশী যাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে রাসমণি দেবী রাত্রে নিজের ঘরে শুতে যান। কিন্তু ঐ দিন রাত্রেই তিনি স্বপ্নাদিষ্টা হন। স্বপ্নে জগজ্জননী তাঁকে দর্শন দিয়ে আদেশ করেন—"কাশী যাবার প্রয়োজন নেই, ভাগীরথী তীরে মনোরম স্থানে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে তোমার নিত্যপূজা গ্রহণ করব।"

মতান্তরে, রাণী রাসমণি দেবী কাশীযাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম অবধি এসে নৌকার ওপর রাত্রিবাস কালে ঐ প্রত্যাদেশ লাভ ক'রেছিলেন। সেদিন অপরাহ্ন শুভ থাকায়, অপরাহ্নেই তাঁর কাশীযাত্রা শুরু হয়। রাণীর নৌবহর যখন কলকাতা অতিক্রম ক'রে দক্ষিণেশ্বরের উপকূলে উপনীত হয়, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাণীর ইচ্ছা ছিল, পানিহাটির প্রসিদ্ধ ঘাটের কাছেই তাঁরা প্রথম রাত্রি কাটাবেন। তখন শীতকাল। দক্ষিণেশ্বরের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ শীতের শান্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এমন দুর্যোগ শুরু হয় যে, তার মধ্য দিয়ে তরঙ্গাকুল জলপথে অগ্রসর হওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন রাণীর আদেশে দুর্যোগময়ী রাত্রে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণেশ্বরেই নৌকায় নোঙ্গর ফেলে সেই রাত্রি সেখানেই কাটাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান হলেও, শুভ যাত্রায় বাধা পড়ার দরুন, সে রাত্রে সেদিনের মত যাত্রা বন্ধ থাকে এবং রাণীমা তাঁর সাত্ত্বিক আহার শেষ ক'রে নৌকাতেই শয্যায় আশ্রয় নেন। নিদ্রা যাওয়ার ঠিক আগে রাণীমা দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করেন, তাঁর যাত্রা যেন শুভ হয়।

সমস্ত অন্তর দিয়ে একান্ত ব্যাকুলভাবে এই প্রার্থনা জানাবার পর, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রায় নিমগ্না হন এবং দেবীর প্রত্যাদেশ লাভ করেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র গতিতে শয্যা থেকে উঠে তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে জগন্মাতার উদ্দেশে প্রণাম করেন এবং তাঁর আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্পা হয়ে কাশীযাত্রা বন্ধ রেখে বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর পরেই উপযুক্ত স্থান, মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় তিনি বদ্ধপরিকর হন এবং সিদ্ধিলাভও করেন। (দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যায় শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির' প্রবন্ধ অবলম্বনে।)

যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে দেবীর নির্দেশেই রাণীমা কাশীযাত্রা স্থগিত রেখে-ছিলেন এবং নৌকায় রক্ষিত দ্রব্যাদি বাড়িতে না এনে, দরিদ্রদের সমুদয় দান ক'রে দিয়েছিলেন। এরপরেই তিনি জগম্মাতার মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়েন।

॥ ১৬ ॥

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা

রাণী রাসমণি মন্দির স্থাপনের জন্য বারানসী সমতুল্য গঙ্গার পশ্চিমদিকে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করেন ; কিন্তু ঐ অঞ্চলের 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত জমিদারেরা রাণী রাসমণির প্রচুর অর্থের বিনিময়েও কোনস্থান বিক্রয় করতে অনিচ্ছুক হন—কারণ, তাঁদের জমিদারীর মধ্যে অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাটে গঙ্গায় স্নান করা, নিজেদের আভিজাত্যের দরুণ তাঁরা পছন্দ করেন নি। অগত্যা রাণী বাধ্য হয়ে গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণের জন্য স্থানটি কেনেন।

কলকাতা থেকে ৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বকূলে উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যে এই দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। 'দক্ষিণেশ্বর' নামটির সঙ্গে তখনকার জনগণের বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং গ্রামটির অবস্থা এখনকার মত জনবহুলও ছিল না। মাঝে মাঝে জঙ্গল, বাগান, পুষ্করিনী, কবরস্থান প্রভৃতি ছিল এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে। এখানে তৎকালীন স্থাপিত একমাত্র সরকারী বারুদখানা ম্যাগাজিনের, আর কিছু ইংরাজ ও স্থানীয় জমিদারদের ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করত। হিন্দুদের সঙ্গে কিছু ইংরাজ ও মুসলমানের বসতিও ছিল। ইংরাজদের কোন গীর্জা না থাকলেও, মুসলমানদের 'মাজার' 'দরগা' প্রভৃতিও ছিল। বর্তমান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছেই মোল্লাপাড়ায় একটি মসজিদও ছিল—যেখানে পরবর্তীকালে ইসলামধর্ম সাধনের সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নমাজ পড়তে যেতেন। দু'একঘর বিত্তশালী মানুষ ছাড়া অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

বড়িষার প্রখ্যাত জমিদার সাবর্ণচৌধুরী বংশের দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী বড়িষা থেকে এসে দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম বাস করা শুরু করেন, তখন তাঁরাই এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে গ্রামটির উন্নতি সাধন করেন এবং বহুলোক এনে তাদের বসতি স্থাপন করান। এই বংশেরই যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন এবং ত্যাগী সন্তানরূপে 'স্বামী যোগানন্দ' নামে পরিচিত হন।

নামটি 'দক্ষিণেশ্বর'—তাই এখানে 'ভুবনেশ্বর,' 'তারকেশ্বর,' 'বক্রেশ্বর' প্রভৃতি

স্থানের মত কোন শিবের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, সে সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বে এখানকার দেউলিপোতার জমিদার বাণরাজা নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে একটি শিবের সন্ধান পান এবং তিনি সেটি নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন ও একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণবঙ্গে এই শিবটি প্রাপ্তির ফলে, তিনিই নাকি শিবের নামকরণ করেন 'দক্ষিণেশ্বর' এবং সেই নামানুসারেই স্থানটির নাম হয় 'দক্ষিণেশ্বর'। অবশ্য এটি কিংবদন্তী—এর কোন প্রামানিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণেশ্বরের শিবতলা ঘাটের 'বুড়োশিব'কেই অনেকে বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণেশ্বর শিব' বলে মনে করেন। যাইহোক, 'দক্ষিণ' শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষিণ দিক ছাড়াও 'অনুকুল,' 'উদার' 'অকপট' প্রভৃতিও হয়, আবার দক্ষিণদিকের অধিপতিকে দক্ষিণের ঈশ্বর বা 'দক্ষিণেশ্বর' বলা হয়। নামের উৎপত্তির বিশেষ সূত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও, সদাশিব শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীকালে আগমনের ফলে 'দক্ষিণেশ্বর' নামের সার্থকতা তাত্ত্বিকবিচারে বোঝা যায়। (দক্ষিণেশ্বরের আদি নাম ছিল শোণিতপুর বা সম্বলপুর)।

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির স্থাপনের পর অবশ্য এখানে আরো মঠ-মন্দির স্থাপিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল, সারদা মঠ, যোগদা মঠ, হরগৌরী মন্দির, আদ্যাপীঠ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী আড়িয়াদহের 'গদাধর পাটবাড়ি' অবশ্য অনেক প্রাচীন, যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন মাঝে মাঝে যেতেন।

অধুনা দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের দিক থেকে পশ্চিমমুখী যে দুটি রাস্তা আছে, তার একটি হল বালীপুল বা বিবেকানন্দ ব্রীজে ওঠার রাস্তা (পূর্বে এই ব্রীজের নাম ছিল উইলিংডন ব্রীজ), অপরটি গঙ্গার দিকে যাওয়ার রাস্তা, যার বর্তমান নাম 'রাণী রাসমণি রোড'। এই রাণী রাসমণি রোড ধ'রে গঙ্গার দিকে কিছুটা অগ্রসর হলেই, বিরাট ফটকযুক্ত বিশাল উদ্যানের মধ্যে যে দেবালয়টি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইটিই প্রসিদ্ধ 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির'। এই বিশাল উদ্যানটি আগে 'সাহেবান বাগিচা' নামে পরিচিত ছিল। জমির ইংরাজ মালিক ছিলেন জন হেষ্টি। তিনি কুঠি বাড়িতে বাস করতেন। এখানে তাঁর একটি চটকল তৈরীর ইচ্ছা ছিল। কলের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে রওনা হওয়ার পর, পথেই তাঁর মৃত্যু হয়; সেজন্য সেখানে আর চটকল তৈরী হয়নি। তাঁর এক্সিকিউটার, কলকাতার তৎকালীন সুপ্রীমকোর্টের ইংরাজ এটর্নী জেমস্ হেষ্টি সাহেবের কাছ থেকে এখানে দোতলা কুঠিবাড়ি সমেত কিছু অংশ, মুসলমানদের কবরডাঙ্গা, গাজী সাহেবের পীরের স্থান, পুষ্করিনী, আমবাগান ইত্যাদি রাণী রাসমণি কিনে নেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের একটি স্থান আবার কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি থাকায়, শাস্ত্রানুযায়ী শক্তিমন্দির প্রতিষ্ঠার এটি উপযুক্ত স্থান ব'লে বিবেচিত হয় এবং এইভাবেই খৃষ্টান ও মুসলমানদের ব্যবহৃত

স্থানের ওপরেই নির্মাণ হয় হিন্দুর শ্যাম-শ্যামা-শঙ্করের মন্দির, যা পরবর্তীকালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের সার্থক ভূমিকা রচনা ক'রেছিল।

রাণী রাসমণির দলিল থেকে জানা যায় যে, এখানকার মোট সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা স্থানটি ৪২ হাজার ৫শো টাকায় রাণী কিনেছিলেন কুঠীবাড়ি সমেত। এই কুঠীবাড়িটিই এই উদ্যানের আদি বাড়ি, যা সামান্য সংস্কারের পর, এখনও প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। গাজী সাহেবের পীরের স্থানটিও আদি। বাকী ঘর-বাড়ি মন্দির-ঘাট-পাঁচিল ইত্যাদি রাণীর আমলে তৈরী।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর 'বিল অব সেলের' মাধ্যমে জমিটি কেনা হলেও, সেটি তখন রেজিষ্ট্রি করা হয় নি; কারণ, তখন রেজিস্ট্রেশান আইন চালু ছিল না। পরে উক্ত আইন বলবৎ হলে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি সম্পাদিত আর একটি দেবোত্তর দলিলের মধ্যে ঐ 'বিল অব সেলের' কথা উল্লেখ ক'রে, সেই দলিল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট আলিপুরের রেজিষ্ট্রী অফিসে যথারীতি রেজিষ্ট্রী করা হয়। এই রেজিষ্ট্রীর তারিখ রাণী রাসমণির দেহত্যাগের ৬ মাসের পর। রেজিষ্ট্রার ছিলেন শ্রীতারকনাথ সেন।

রাণী রাসমণি যখন জমিটি কেনেন, তখন তার চৌহদ্দি ছিল—পূর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরীদের জমি, পশ্চিমদিকে গঙ্গা, উত্তর দিকে সরকারী বারুদখানা, আর দক্ষিণদিকে জেমস হেষ্টির একটি কারখানা। জমি কেনার পর অবশ্য পূর্বদিকে লোকালয় গ'ড়ে ওঠে—বর্তমানে যার কতকাংশে রেলওয়ে কোয়ার্টার; দক্ষিণদিকের অংশে জেমস হেষ্টির কারখানার স্থলে, পরে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি স্থাপিত হয়েছিল। এই বাগানবাড়িতে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং বহু লীলাবিষয়ক ঘটনাও এখানে ঘটে ছিল। বর্তমানে এই জায়গাটিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ—মহামণ্ডল' ও ঠাকুরের দণ্ডায়মান মূর্তিসহ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির' রয়েছে। উত্তরদিকের বারুদখানার স্থলে বর্তমানে রয়েছে 'উইমকো দেশলাই কারখানা'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একদা বারুদখানার 'ম্যাগাজিন' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাসমণি-এষ্টেটের একটি মোকদ্দমা হওয়ায়, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'ব্যারিষ্টার' রূপে রাসমণির এষ্টেটের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিতর্কিত অংশটি সরেজমিনে দেখার জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে জমি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দ (১২৫৫ বঙ্গাব্দ) থেকেই এখানকার যাবতীয় নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এই কাজে প্রথম দিকে রাণীর প্রধান সহায়ক ছিলেন জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস। পরে রাণীর তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের ওপরই প্রধানতঃ এই কাজের সমুদয় দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায়, রাণী যেমন প্রত্যহ এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে খোঁজ নিতেন, মাঝে মাঝে আবার নিজেও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাজ পরিদর্শন করতেন।

মন্দিরাদি নির্মাণের শুরুতে প্রথম দফায় গঙ্গার ধারে পোস্তা, ঘাট, উদ্যান প্রভৃতি তৈরীর কাজ আরম্ভ হলেও, গঙ্গার প্রবল বানের ফলে নির্মাণকালেই সেগুলি ভেঙে যায়,—এই কাজের ভার কারা নিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। এরপরেই রাণী রাসমণি তৎকালীন খুব নামী বিলাতী ঠিকাদারী সংস্থা 'ম্যাকিন্‌টস এণ্ড বারন' কোম্পানীকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে পুনরায় পোস্তা ও ঘাট তৈরীর কাজের ভার দেন। কোম্পানী বিশেষ দক্ষতা সহকারে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করায়, চুক্তির টাকা ছাড়াও রাণী স্বেচ্ছায় তাদের পারিতোষিক স্বরূপ আরো কয়েক হাজার টাকা দেন এবং তাদের যোগ্যতা বিবেচনা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে দেবালয় নির্মাণের কাজটিও তাদের দেন। এই কোম্পানীই এই দেবালয়ের নক্সা প্রস্তুত করে এবং অপূর্ব কারুকার্য শোভিত মন্দিরগুলি নির্মাণ করে। একই সঙ্গে দেবালয়ের বাইরের দুটী নহবৎ খানা, পুষ্করিণীগুলির ঘাট, চারদিকের সুবিস্তৃত প্রাচীর প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট কাজগুলিও করে।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই 'ম্যাকিনটস্ এণ্ড বারন' কোম্পানীটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হওয়ায়, বর্তমানে তার নাম 'ম্যাকিনটস্ বারন লিমিটেড।' একদা বহু এবং বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কাজে প্রাচীন, অভিজ্ঞ এই ঠিকাদারী সংস্থার বর্তমান কার্যালয়—ডি।১১, গিলেনডার হাউস (দ্বিতল), নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে এই লেখক এই দপ্তরে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, যাবতীয় নির্মাণ কাজ (পোস্তা বাঁধ সমেত) এদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল এবং এজন্য মোট ৯ লক্ষ টাকা তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল। ঐ দপ্তরে যা রেকর্ড আছে, তাতে উল্লেখ আছে ঃ—"The Company has the Unique distinction of Constructing the Dakhineswar Temple along with protection works against erosion.")

গঙ্গার ধারে পোস্তা, বাঁধ প্রভৃতির কাজ শেষ হওয়ার পরেই এখানে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর গঙ্গার দিকে একই নক্সা অনুযায়ী একই ধাঁচের ১২টি শিবমন্দির ও চাঁদনী এবং এই মন্দিরগুলির পূর্বদিকে—উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মাটির টালি বাঁধানো একটি বিরাট চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ তৈরী করা হয়, যার আয়তন ৪৪০ ফুট লম্বা ও ২২০ ফুট চওড়া। মন্দিরের সমগ্র এলাকার তিন পাশে দালান বাড়ি তৈরী করা হয়, এই বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে মন্দিরে আসার জন্য তিনটি প্রবেশ পথও করা হয়। একই সঙ্গে কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরের কাজও চলতে থাকে। মন্দির এলাকার বাইরে উত্তরে একটি নহবৎখানা এবং দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি নহবৎখানা তৈরী হয় এবং সমগ্র এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়। সমুদয় নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় ৯ বছর সময় লেগেছিল। নির্মাণের পর

দেবালয়ের সীমানা এইরকম দাঁড়ায়—পূর্বে একটি পুষ্করিণী (গাজীপুকুর), পশ্চিমে উদ্যান ও গঙ্গা, উত্তরে কুঠি বাড়ি ও নহবৎখানা এবং দক্ষিণে ফল-ফুলের বাগান ও আর একটি নহবৎখানা। এখানে মা কালী, শিব ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি স্থাপিত হলেও, এটি 'দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি' নামেই প্রসিদ্ধ। মন্দির নির্মাণ শুরু ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে।

* * *

দক্ষিণেশ্বরে যখন মন্দিরাদি তৈরী হতে থাকে, সেই সময় রাণীর বাড়িতেও মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবদেবীর মূর্তিগুলিও নির্মিত হয়। মূর্তি-নির্মাণের আরম্ভকাল থেকেই রাণী কঠোর ব্রতপালন ও আচার নিষ্ঠার মাধ্যমে দিন কাটিয়েছিলেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন। এই সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গপার্ষদগণের কাছে নিজে মুখে যা বিবৃত করেছিলেন, স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায় সেটির উদ্ধৃতি ঃ—

"...শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্বাহে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথা-শক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন ; মন্দির ও দেবমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, এমন সময় যে-কোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ রাখিবি ? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে ; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।' ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য সুসম্পন্ন করিতে সংকল্প করেন।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)

* * *

রাণীর সংকল্পে কিন্তু প্রচণ্ড বাধা পড়ল। সকল কাজ ঠিকমত শেষ হওয়ার পর, উপযুক্তদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দেবীকে অন্নভোগ দেবার জন্য রাণী যখন সচেষ্ট, ঠিক তখনই তিনি এক কঠিন বাধার সম্মুখীন হন। কারণ, রাণী জাতিতে শূদ্র হওয়ায় সামাজিক প্রথানুযায়ী কোন ব্রাহ্মণই, এমনকি রাণীর নিজের গুরু বা পুরোহিতও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা বা দেবীকে অন্নভোগ দিতে রাজী হলেন না। সেজন্য রাণী বিভিন্ন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শাস্ত্রানুযায়ী বিধান জানাবার জন্য অনুরোধ করায়, সকলেই এই কাজকে অশাস্ত্রীয় ব'লে বিধান দেন। একমাত্র কলকাতার ঝামাপুকুর-চতুষ্পাঠীর

পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিধান আসে যে, প্রতিষ্ঠার আগে যদি কোন ব্রাহ্মণকে ঐ মন্দির দান করা যায় এবং সেই ব্রাহ্মণ যদি ঐ মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা ক'রে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তবে তা অশাস্ত্রীয় কাজ হবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, রামকুমারের এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পরেও, রাসমণি 'কেবর্ত্য', রাসমণি 'শূদ্রানী' ইত্যাদি নানা নক্কারজনক অভিযোগের দ্বারা, সেই সব গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, রামকুমারের বৈপ্লবিক বিধানকে কোনমতেই গ্রাহ্য করতে রাজী হলেন না। অগত্যা রাসমণি দেবী, এই উদার মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত রামকুমারকেই এই কাজ করার জন্য আহ্বান জানালে, বহির্জগতের সকল বাধা তুচ্ছ জ্ঞান করে, অন্তরের নির্দেশে সৎসাহসের সঙ্গে রামকুমার এই কাজে ব্রতী হন এবং অপরিণত বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে (তৎকালীন গদাধর) নিয়ে ঝামাপুকুর থেকে এসে, রাসমণি দেবীর ইচ্ছানুযায়ী ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে) মন্দির প্রতিষ্ঠার পুণ্যকাজ সমাধা করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সব গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রামকুমারের এই বিধানকে পূর্বে সমর্থন করেননি, পরে রামকুমারের সৎসাহসী মনোভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার পরিচয় পেয়ে সেদিন 'রামকুমার-বিরোধী' সব পণ্ডিতই নিরুপায় অবস্থায় এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন এবং কে কোন্ পূজাকাজের দায়িত্ব নেবেন—তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ-বিসম্বাদ-কোলাহলের পর কাজ সমাধা করে যথাযথ দানও গ্রহণ করেছিলেন।

* * *

যিনি সেদিন সকল শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা উপেক্ষা করে এবং সমুদয় পণ্ডিত বর্গের অনুদার মনোভাবের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামী সৈনিকের মত রুখে দাঁড়িয়ে রাণী রাসমণিকে তাঁর ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিলেন, সেই 'উচ্চকোটী-মাতৃসাধক' রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্যক পরিচয় জ্ঞাপনের সুযোগ এখানে না থাকলেও, তাঁর অনন্যসাধারণ জীবনধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

হুগলীজেলার কামারপুকুরের ভক্তদম্পতি ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণির তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু কামারপুকুর তাঁর জন্মস্থান নয়। কামারপুকুরে বসতি স্থাপনের আগে ক্ষুদিরাম যখন তাঁর আদি পিতৃভূমি 'দেরেপুর' গ্রামে বাস করতেন, সেই সময় ১২১১ বঙ্গাব্দে (১৮০৪-৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম। তিনিই মাতাপিতার প্রথম সন্তান। কথিত আছে, দেরেপুরে থাকাকালীন একদা ক্ষুদিরাম তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে অযোধ্যাসহ নানাস্থান দর্শন করে ফিরে আসার পর, অযোধ্যা তীর্থের স্মরণে তাঁর প্রথম পুত্রের নাম রাখেন 'রামকুমার'।

রামকুমারের পর দেরেপুর গ্রামে ক্ষুদিরামের যে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম কাত্যায়নী। এরপর, জমিদারের অত্যাচারে দেরে গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে চলে আসার পর, তাঁর আরো তিনটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। যথা —রামেশ্বর (পুত্র), গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ (পুত্র) এবং সর্বমঙ্গলা (কন্যা)।

দেরেপুর গ্রাম ত্যাগ করে কামারপুকুরে আসার পর, ক্ষুদিরাম নিকটবর্তী গ্রামের এক চতুস্পাঠীতে রামকুমারের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং রামকুমারও ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন যথারীতি শেষ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর রামকুমার যজন-যাজন প্রভৃতি কাজে কিছু রোজগার করতে থাকায় এবং বিবাহযোগ্য হওয়ায়, ক্ষুদিরাম তাঁর বিবাহ দিতে আগ্রহী হন। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামের জ্যেস্ঠা কন্যা কাত্যায়নীও বিবাহযোগ্যা হওয়ায়, তিনি তাঁরও বিবাহের জন্য আগ্রহী হন। এই সময় রামকুমারের বয়স ছিল ষোল এবং কাত্যায়নীর বয়স এগারো ; কিন্তু তখনকার প্রথানুযায়ী পুত্র-কন্যাদের এইটাই বিবাহের বয়সরূপে গণ্য করা হত। বিবাহের পণের বোঝা এড়াবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম পুত্র-কন্যাদের জন্য 'পরিবর্ত'-বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কামারপুকুরের উত্তরে প্রায় ২ মাইল দূরে আনুড় গ্রামের কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্ষুদিরাম তাঁর কন্যা কাত্যায়নীর বিবাহ দেন এবং পরিবর্তে জামাতা কেনারামের ভগ্নীর সঙ্গে পুত্র রামকুমারের বিবাহ দেন। রামকুমারের স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত।

রামকুমার আদর্শপরায়ণ, নিস্ঠাবান, বাকসিদ্ধ ও সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁদের পরিবারবর্গ প্রধানতঃ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হলেও, রামকুমার আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর কাছে দেবী মন্ত্রও গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি, পরবর্তীকালে তান্ত্রিক গুরুর সাহায্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। ইস্টদেবীকে নিত্য পূজা করার সময় একদিন তিনি অনুভব করেন যে, ৺দেবী নিজ অঙ্গুলীদ্বারা যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন 'মন্ত্র' লিখে দিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই তিনি অনেকের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং সেগুলি সত্যই ফলে যেত। এজন্য ভবিষ্যদ্বক্তারূপেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি ঘটে। এমনি, নিজের বিবাহের পর স্ত্রীর ভাগ্য দর্শন করে রামকুমার ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেই মৃত্যু ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, বিবাহের বহুকাল পরে রামকুমারের স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং একমাত্র পুত্র 'অক্ষয়'কে প্রসব করার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। রামকুমার কিন্তু কখনও তাঁর এই একমাত্র মাতৃহীন শিশুকে কোলে করেন নি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই, এ ছেলে বেশী দিন বাঁচবে না।' রামকুমারের মৃত্যুর পরে অক্ষয়ের বিবাহ হলে, অক্ষয়েরও অকাল মৃত্যু হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে।

পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর থেকেই অভিভাবকরূপে রামকুমারই সংসারের ভার গ্রহণ করেন এবং বালক গদাধর, তথা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবন জ্যেস্ঠভ্রাতা

রামকুমারের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন, মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের বিবাহ, কনিস্ঠা ভগ্নী সর্বমঙ্গলার বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক দায়িত্বপূর্ণ সমুদয় কাজই রামকুমার তাঁর পিতার অবর্তমানে নিস্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর, সংসারের নানা অসুবিধা ও আর্থিক অনটন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রামকুমারকে সংসার প্রতিপালনের জন্য ঋণও করতে হয়। এদিকে মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের দেখাশোনার ভার চন্দ্রমণি দেবী গ্রহণ করলেও, স্ত্রী-বিয়োগজনিত মনোকষ্টে রামকুমারের স্বাভাবিক জীবনও যেন নানাভাবে ভারাক্রান্ত হতে থাকে। বাড়িতে বাস করে তিনি সংসার পালনে অসমর্থ বোধ করায়, কলকাতায় গিয়ে কিছু রোজগারের জন্য আগ্রহী হন। অতঃপর, ১২৫৬ বঙ্গাব্দে (১৮৪৯-৫০ খৃস্টাব্দে) মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের ওপর সংসারের দায়িত্ব অর্পণ করে, রামকুমার একাকী কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে একটি 'চতুস্পাঠী' বা 'টোল' খোলেন। প্রথমাবস্থায় কয়েকজন মাত্র ছাত্রের শিক্ষাদানের দরুন তাঁর বিশেষ কোন আয় না থাকলেও, ঝামাপুকুর পল্লীতে যজন-যাজন, ব্যবস্থাদান প্রভৃতি কাজের দ্বারা তাঁর কিছু কিছু রোজগার হতে থাকে। পরবর্তীকালে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (১৮৫২-৫৩ খৃস্টাব্দে) এক শুভদিনে রামকুমার, কনিস্ঠভ্রাতা গদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণকে কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। এই ঝামাপুকুরের চতুস্পাঠীর বিধান উপলক্ষেই রামকুমারের সঙ্গে রাসমণি দেবীর প্রথম যোগাযোগ হয় এবং রাসমণি দেবীর আহ্বানেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রতিস্ঠাকার্যে অগ্রণী হন।

* * *

মন্দির প্রতিস্ঠা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে সেদিনের ঐতিহাসিক মহোৎসবের যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠার আগের দিন মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রাগান, কালীকীর্তন, ভাগবত পাঠ, রামায়ণ পাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল এবং রাত্রে সমগ্র দেবালয় অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল।

পরের দিন, অর্থাৎ মন্দির প্রতিস্ঠার দিন দেবালয়ের বিশাল প্রাঙ্গণ ভোর থেকেই অসংখ্য ভক্ত সমাগমে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং সমগ্র দক্ষিণেশ্বর গ্রামটি উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়েছিল।

এইদিন সারাক্ষণ নহবতের সুমধুর ধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের আরতি-ধ্বনি, নামকীর্তন, মন্ত্রোচ্চারণ, হোমাদি ক্রিয়া প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দির জমজমাট ছিল।

রাসমণি দেবীর আহ্বানে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মূলাজোড়, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ ছাড়াও কাশী, পুরী, পুনা, মাদ্রাজ, কনৌজ, মিথিলা প্রভৃতির ব্রাহ্মণেরাও উপস্থিত ছিলেন, যার সংখ্যা লক্ষাধিক। রাণীও এই সমবেত লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি

স্বহস্তে সংগ্রহ ক'রে নিজের বাড়িতে সযত্নে রক্ষা ক'রেছিলেন। রাণীর বাড়িতে তাঁর বংশধরদের কাছে এই পদধূলি বহুকাল যাবৎ রক্ষিত ছিল। প্রবাদ আছে যে, কারও অসুখ-বিসুখ হলে তাকে যদি সামান্য পরিমাণে এই লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি খাওয়ানো যায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়। এই প্রচলিত মতের লোকেরা রোগমুক্তির আশায় এই পদধূলি ক্রমশ রাণীর বাড়ি থেকে নিতে থাকায়, অবশেষে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

যাইহোক, এইদিন মহোৎসবে যোগদানকারী সমস্ত ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সমাদর করা হয় এবং ভোজনে, দানে ও দক্ষিণায় পরিতুষ্ট করা হয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপক বা পণ্ডিত ছিলেন, সেই সব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে রাণী এদিন রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়কালে প্রত্যেককে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দান ক'রে দ্বিজভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছাড়াও আত্মীয়কুটুম্ব-প্রতিবেশী, যাঁরাই এই উৎসবের আনন্দের অংশীদার ছিলেন, সকলকেই রাণী সাধ্যমত সমাদর ক'রেছিলেন।

এই ঐতিহাসিক মহোৎসব উপলক্ষে রাণী রাসমণি 'অন্নদান-যজ্ঞে'রও আয়োজন করেছিলেন। রাণীর বিভিন্ন তালুক ও জমিদারী থেকে এই মহোৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র আনা হয়। রাণীর শালবাড়িয়া তালুক থেকে দুটী হাতীর পিঠে অতি বিশুদ্ধ ঘৃতও আনা হয়।

পূজানুষ্ঠান ছাড়াও এদিন 'দধি-পুষ্করিণী', 'পায়েস-সমুদ্র', 'ক্ষীর-হ্রদ', 'দুগ্ধ-সাগর', 'তৈল-সরোবর', 'ঘৃত-কূপ', 'লুচি-পাহাড়', 'মিষ্টান্ন-স্তূপ', 'কদলীপত্র-রাশি', 'মৃন্ময়পাত্র-স্তূপ', প্রভৃতির মাধ্যমে রাণী 'অন্নদান-যজ্ঞে'র বিশাল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে একদিনেই রাণীর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ"—গ্রন্থের 'সাধক ভাব' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ—"শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত হইয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।"

এই বিরাট অনুষ্ঠানে পুরোহিতগণের মধ্যে গৌড়াদ্য-দ্রাবিড়-বৈদিকগণও যেমন ছিলেন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও ছিলেন। রামকুমারই সেদিন ৺দেবীকে অন্নভোগ দিয়েছিলেন ব'লে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে" উল্লেখ পাওয়া যায়। পূজার হোমও তিনি ক'রেছিলেন ব'লে অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

শ্রীকালীজীবন দেবশর্মা রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান" গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাদি সমস্ত সম্পত্তি রাণী রাসমণি তাঁর কুলগুরু শ্রীরামসুন্দর

চক্রবর্তীকে* উৎসর্গ করায়, তবেই রাণী ৺দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকার পান এবং গুরুর প্রতিনিধিরূপে দেবসেবার ব্যবস্থা করেন।

এই বিরাট অনুষ্ঠানে বৈদিক ও অন্যান্য শ্রেণীর পুরোহিতেরা পূজা, হোম, তন্ত্রপাঠ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রমতে বেদ ও তন্ত্র—দুই প্রকারের দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, রাঢ়ী ও বৈদিক শ্রেণীর পূজার কাজও ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

যে সব বঙ্গীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এই কাজে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা ঃ—

১। রাণীর গুরুদেব রামসুন্দর চক্রবর্তী (বাগবাজার)
২। রাণীর পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য (বরাহনগর)
৩। বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন (বেলগেছিয়া)
৪। চণ্ডীচরণ বিদ্যাভূষণ (পাইকপাড়া)
৫। কেশবচন্দ্র তর্কবাগীশ (গড় ভবানীপুর)
৬। ঠাকুরদাস বিদ্যালঙ্কার (শ্রীরামপুর)
৭। রামকুমার তর্কালঙ্কার (জগৎবল্লভপুর)
৮। পীতাম্বর চূড়ামণি (,,)
৯। যদুনাথ সার্বভৌম (,,)
১০। মধুসূদন তর্কালঙ্কার (গুসকরা)
১১। সীতারাম বিদ্যাভূষণ (পাঁতিহাল)
১২। বৈকুণ্ঠ ন্যায়রত্ন (গোণ্ডলপাড়া)
১৩। কৃত্তিবাস তর্করত্ন (,,)
১৪। রাইচরণ ভট্টাচার্য (,,)
১৫। প্রেমচাঁদ বাচস্পতি (,,)
১৬। বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন (,,)
১৭। ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ (,,)
১৮। ভোলানাথ সার্বভৌম (বলরাম বাটী)
১৯। তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ (,,)
২০। ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি (,,)
২১। মনসাচরণ বিদ্যালঙ্কার (বাসুবাটী)
২২। রামচন্দ্র চূড়ামণি (বাসুবাটী)
২৩। পরাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মধুবাটী)
২৪। বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন (বালিচক)
২৫। সার্থকনাম শিরোমণি (নয়াচক)
২৬। বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন (সাচক)
২৭। ব্রজনাথ চক্রবর্তী (ওয়াদিপুর)
২৮। বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ঐ)
২৯। চিন্তামণি বিদ্যাসাগর (ঐ)
৩০। বনমালী চূড়ামণি (ঐ)
৩১। নবকুমার শিরোমণি (ঐ)
৩২। কালীপদ বিদ্যার্ণব (ঐ)
৩৩। লালচাঁদ বিদ্যানিধি (ঐ)
৩৪। ভুবনমোহন ভট্টাচার্য (রঘুনাথপুর)
৩৫। গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (সুলতানপুর)
৩৬। আনন্দগোপাল চূড়ামণি (খোষালপুর)
৩৭। রামচন্দ্র চূড়ামণি (চানক মণিরামপুর)
৩৮। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (মির্জাপুর)
৩৯। মনোমোহন ভট্টাচার্য (ঐ)
৪০। নবকুমার চূড়ামণি (বাসুদেবপুর)
৪১। গুরুচরণ শিরোমণি ঐ
৪২। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ঐ
৪৩। বদন বাচস্পতি (দেবীপুর)
৪৪। দ্বিজবর বিদ্যারত্ন ঐ

*মন্ত্রের দ্বারা।

৪৫। কার্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অনন্তরামপুর)
৪৬। মাধব শিরোমণি (হাকিমপুর)
৪৭। কালীচরণ চূড়ামণি (ভগবতীপুর)
৪৮। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (মামুদপুর)
৪৯। বৃন্দাবন ভট্টাচার্য (কমলাপুর)
৫০। কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য (পানপুর)
৫১। বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য (বাঁকীপুর)
৫২। গোলকচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (জগৎনগর)
৫৩। গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (গোপালনগর)
৫৪। রামকমল ভট্টাচার্য (কেশবনগর)
৫৫। রামধন ভট্টাচার্য (বাজেপ্রতাপ)
৫৬। দেবীচরণ তর্কালঙ্কার (পোলবাওয়াই)
৫৭। শ্যামচরণ তত্ত্বনিধি (উগারদহ)
৫৮। কাশীনাথ ভাগবতভূষণ (শশাবেড়িয়া)
৫৯। লম্বোদর সার্বভৌম (পুর্বীহিজলা)
৬০। রাঘব তর্কসিদ্ধান্ত (ডেঙ্গরগাছা)
৬১। মুক্তারাম বাচস্পতি (মাদড়া)
৬২। রাঘবচন্দ্র তর্কালঙ্কার (ঐ)
৬৩। প্রতাপচন্দ্র হালদার (তেঘরি)
৬৪। ভাগবত বিদ্যালঙ্কার (ঐ)
৬৫। ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ (ব্রাহ্মণ পাড়া)
৬৬। মদনমোহন তর্কালঙ্কার (মেলে)
৬৭। সারদা বিদ্যাবাগীশ (ঐ)
৬৮। মুক্তারাম ভট্টাচার্য (আদান)
৬৯। উমাচরণ ভট্টাচার্য (ঐ)
৭০। গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (ইটারাই)
৭১। মহেশচন্দ্র চূড়ামণি (ধান্যহানা)
৭২। কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন (হরাল)
৭৩। সীতারাম ভট্টাচার্য (সেয়াগড়)
৭৪। ফকিরদাস ভট্টাচার্য (ভাদুড়ো)
৭৫। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (দেওয়ানের ভেড়ী)
৭৬। রণরাম ভট্টাচার্য (ধামাইটিকার)
৭৭। নৃসিংহ বিদ্যারত্ন (কাঁশরা)
৭৮। পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কার (ঐ)
৭৯। মধুসূদন চূড়ামণি (পাঁচারুল)
৮০। দীননাথ বিদ্যালঙ্কার (ঐ)
৮১। মধুসূদন চূড়ামণি (বেলকুলী)
৮২। গোপাল শিরোমণি (খলসিনী)
৮৩ ক্ষেত্রনাথ বিদ্যালঙ্কার (ঝিখিরা)
৮৪ ঈশানচন্দ্র বিদ্যার্ণব (কাঁকড়াফুলি)
৮৫ রামমোহন তর্কালঙ্কার (নাটাগড় দিকড়া)…প্রভৃতি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার মহোৎসব সমাপ্ত হলেও, বরাবরের জন্য রাণী মা-কালীর পূজকপদে সৎসাহসী ও শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমারকেই মনোনীত করায়, রামকুমার দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যান এবং কনিষ্ঠভ্রাতা গদাধরও পরে তাঁর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হয় ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে; তিনি ছিলেন কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামের অধিবাসী এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাণীর এষ্টেটের কর্মচারী। এইভাবেই শুরুতেই মা-কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির দুটীর পূজার ভার রাঢ়ীশ্রেণীর 'চট্টোপাধ্যায়' পদবীধারী দুই ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন, আর দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের,—এঁদের মধ্যে উমাচরণ ভট্টাচার্যও ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজ অবধি উক্ত প্রথায় পূজার কাজ চ'লে আসছে ; অর্থাৎ মা-কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং শিব মন্দিরগুলিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পূজকরূপে নিযুক্ত আছেন। কারণ, দেহত্যাগের ঠিক আগের দিন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি যে দানপত্র করেন, সেই দলিলে ভবিষ্যতের পূজার জন্যও ঐরূপ শ্রেণীগত ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থার নির্দেশ আছে—কোন বিশেষ বংশের দ্বারা পূজার কোন কথা নেই। (দলিলের নকল এই গ্রন্থের ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

॥ ১৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাসমণি পর্ব

(১৮৫৫-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ)

১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ৩১শে মে (১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার ৺স্নান যাত্রার দিন, শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হন এবং এই উপলক্ষে আগের দিনেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, তথা গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন।*

আলোচ্য পর্বে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ঐ দিন থেকে রাণী রাসমণির দেহত্যাগের দিন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১২৬৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন), অর্থাৎ প্রায় ৫ বছর ৮ মাস যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমণি সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। ঐ সামান্য কয়েকবছরের ঘটনা ছাড়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাকী সুবিস্তৃত লীলা কাহিনী বর্ণনার এখানে সুযোগ নেই, কারণ সেগুলি রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পরের ঘটনাবলী এবং সেই ঘটনাবলীর সঙ্গে রাণী রাসমণি জড়িতা নন। এই গ্রন্থটি যেহেতু রাণী রাসমণি সম্পর্কীয়, সেজন্য ঠাকুরের পরবর্তী কালের সেই অনন্ত লীলামৃতের স্বাদ আস্বাদন করার আগ্রহকে এখানে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দমন করতে হল।

* * *

প্রথমেই, ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বের কিছু ঘটনা জানা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তথা তৎকালীন গদাধর বাস করছিলেন। ইতিপূর্বে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে) এক শুভদিনে রামকুমার গদাধরকে হুগলীর কামারপুকুর থেকে কলকাতার ঝামাপুকুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

* লীলাপ্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রামকুমারের উদ্দেশ্য ছিল গদাধরকে লেখাপড়া শেখানো ; তাছাড়া তিনি কাছে থাকলে রামকুমারের কাজকর্মেরও কিছু লাঘব হতে পারে—এমন আশাও রামকুমারের ছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই 'চালকলা বাঁধা বিদ্যা' শিখতে গদাধর অসম্মতি জানালে, রামকুমার তা মেনে নেন এবং তাঁর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি গদাধরকে বিশেষ পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং এই শিক্ষার পর তাঁকে ঝামাপুকুরে স্থানীয় কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে নিত্য দেব-সেবার কাজে নিযুক্ত করেন। এই ভাবেই রামকুমারের চেষ্টাতেই গদাধর প্রথম পূজার কাজ করার সুযোগ পান এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রধান পূজকের পদ গ্রহণ করে তিনি অবতার-লীলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন রেখে যান।

* * *

দক্ষিণেশ্বরে যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তথা গদাধরের বয়স মাত্র ১৮।১৯ বছর এবং রাণী রাসমণির বয়স তখন প্রায় ৬২।৬৩ বছর।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে গদাধর উপস্থিত থাকলেও এবং ঐ বিরাট আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগদান করলেও, সম্ভবতঃ অপরিণত বয়সে সংস্কারমুক্ত না থাকায় ঐদিন তিনি সেখানে শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আহার সম্পর্কে অত্যন্ত নিষ্ঠার দরুন অন্নগ্রহণ করেন নি ; বরং সারাদিন অভুক্ত থাকার পর, সন্ধ্যার সময় নিকটবর্তী বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনে খেয়ে, হাঁটাপথে দক্ষিণেশ্বর থেকে একাই ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে ফিরে এসে রাত্রিতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। (অবশ্য পিতৃতুল্য যুক্তিবাদী রামকুমারের ব্যক্তিগত প্রভাবে কিছুদিন বাদেই তিনি এই সংস্কার থেকে মুক্ত হন এবং পরে মন্দিরের প্রসাদ নিয়মিত গ্রহণ করেন।)

ঠাকুরের এই সংস্কার সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ—"ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবের অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে, ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে ? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দুইটি এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চজ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে ; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহংকারকে খর্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে ; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বোক্তরূপ পরিচয়

পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই, তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়া পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।"

(লীলাপ্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)

প্রসঙ্গতঃ আমাদের স্মরণ করা উচিত, যে শাস্ত্রনিষ্ঠা বা যে সংস্কারের দরুন ব্রাহ্মণ সন্তান গদাধর সেদিন শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অন্নগ্রহণ করেননি, পরবর্তীকালে ভক্তির প্রাবল্যে তিনিই সেই মন্দিরে পূজকের পদও গ্রহণ করেছিলেন এবং মন্দিরের প্রসাদও নিয়মিত গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ির মেথর, পরমভক্ত রসিকের বাড়িতে গিয়ে গোপনে নিজের মস্তকের কেশের দ্বারা রসিকের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—'মা, আমি ব্রাহ্মণ, এই অভিমান বিনাশ করো' সুতরাং, অবতারপুরুষের এই সব বিচিত্র কাহিনীর বিচার করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা।

* * *

যাইহোক, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার মহোৎসব সমাপ্ত হলেও, রাণী রাসমণি এই সৎসাহসী ও শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমারকেই বরাবরের মত মা-কালীর পূজক পদে নিযুক্ত করায়, রামকুমার সেদিন হতেই দক্ষিণেশ্বরে থেকে যেতে বাধ্য হন।

প্রতিষ্ঠার পরের দিন সকালেই গদাধর, রামকুমারের খোঁজ নেওয়ার জন্য ঝামাপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং রামকুমার যে আপাততঃ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে ফিরে যাবেন না, একথা বুঝে আবার ঝামাপুকুরে একাই ফিরে আসেন। কিছুদিন রামকুমারের জন্য অপেক্ষা করার পর, গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং অগত্যা সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গেই বাস করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে রামকুমারের ভাগ্নে (পিসতুতো ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র) হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে কাজের সন্ধানে এসে মিলিত হন এবং মাতুল রামকুমারের সহায়তায় দক্ষিণেশ্বরেই বাস করতে শুরু করেন। হৃদয়রাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চাইতে বয়সে প্রায় ৪ বছরের ছোট ছিলেন এবং প্রায় সমবয়সী হিসাবে ছোটবেলা থেকেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'হৃদে' বা 'হৃদু' নামে সম্বোধন করতেন এবং হৃদয়রামও তাঁকে 'মামা' বলেই ডাকতেন। এখানে এসে উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ প্রীতির ভাবও বর্ধিত হয় ও ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন কালে এই হৃদয়রামই তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন।

* * *

মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে, রাণী রাসমণির অন্যতম জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরে একদিন লক্ষ্য করেন যে, একটি সুদর্শন যুবক গঙ্গার ধারে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। যুবকের অপূর্ব কান্তি এবং আত্মভোলা ভাব দেখে তিনি যুবকটির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, সেই যুবকটি পূজারী রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যুবকটির প্রতি মথুরমোহন এমনই আকৃষ্ট হন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি রামকুমারের কাছে প্রস্তাব পাঠান যে, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে যেন মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করা হয়। রামকুমার তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয়ে মথুরমোহনকে জানান যে, তাঁর ভ্রাতাটি নিরীহ ও শান্তশিষ্ট হলেও খুবই একগুঁয়ে এবং তার নিজের ইচ্ছা না হলে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো অসম্ভব।

যাইহোক, মথুরমোহনের এই মনোভাবের কথা জানতে পেরে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই মথুরমোহনকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন ; কারণ, তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল, তিনি কারুর চাকরী করবেন না, কেবল ভগবানের সেবা করবেন। যেহেতু মথুরমোহন একজন সম্মানীয় ব্যক্তি, সেজন্য যদি তিনি সরাসরি তাঁকে এই বিষয়ে কোন অনুরোধ করেন, তা হলে সেটি প্রত্যাখ্যান করলে ভদ্রোচিত হবে না—এই মনোভাব পোষণ করে তিনি মথুরমোহনকে দূর থেকে দেখেই অন্যত্র চলে যেতেন। কিন্তু মথুরমোহন তাঁর আশা ত্যাগ না করে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগও একদিন এসে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন এবং তাঁর মত মূর্তি গড়তে বা মূর্তির বেশভূষা করতে অল্প লোকই পারত।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি গঙ্গা থেকে ভাল মাটি এনে নিজহাতে একটি অতি সুন্দর শিবমূর্তি গড়ে একমনে পূজা করছিলেন ; এমন সময় মথুরমোহন পিছন থেকে এসে মূর্তির গঠন দেখে বিস্মিত হলেন! মূর্তিটি ছিল—বৃষভপৃষ্ঠে মহাদেব সমাসীন, হস্তে ত্রিশূল ও ডমরু, চক্ষুদ্বয় ধ্যানে অর্ধনিমীলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিবমূর্তি পূজায় এমনই তন্ময় ছিলেন যে, মথুরমোহনের উপস্থিতির কোন আভাস তিনি পাননি। মথুরমোহন নিঃশব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া এই মনোহর মূর্তি এবং পূজাকালীন তাঁর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা বহুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করার পর, হৃদয়রামকে চুপি চুপি বলে গেলেন যে, পূজার পর এই অপরূপ মূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জন না দিয়ে যেন তাঁকে দেওয়া হয়। সেজন্য পূজার পর হৃদয় মাতুলের কাছ থেকে সেই শিবমূর্তিটি চেয়ে নিয়ে মথুরমোহনের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং মথুরমোহনও সেটি নিয়ে রাণী রাসমণির কাছে হাজির হলেন। মূর্তিটির নিখুঁত গড়ন দেখে এবং নির্মাতার পরিচয় জেনে রাসমণি দেবীও মুগ্ধা ও আনন্দিতা হোলেন।

এরপর একদিন জানবাজার থেকে মথুরমোহন এসে, দূর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েই ডেকে পাঠান। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরমোহনের কাছে যেতে ইতস্ততঃ

করতে থাকায়, হৃদয় তাঁর মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কারণ দেখিয়ে বলেন যে, গেলেই মথুরমোহন তাঁকে চাকরীর কথা বলবেন এবং তখন কি উপায় হবে? তাছাড়া, বিগ্রহের অঙ্গে যে সব মূল্যবান অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদ আছে, তারই-বা দায়িত্ব কে নেবে? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে হৃদয় সে সবের দায়িত্ব নিতে রাজী হওয়ায়, অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরমোহনের কাছে যেতে রাজী হন। মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যে, পূজার ভার নিতে যদি তাঁর আপত্তি থাকে, তবে বিগ্রহের অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জার ভার অন্ততঃ তাঁকে নিতেই হবে। অতঃপর মথুরমোহনের ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে বেশকারীর পদ গ্রহণ করেন এবং হৃদয়ের হেফাজতে দেবীর গহনাপত্র রক্ষিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়-সম্পত্তি, কর্মচারী নিয়োগ, দেবসেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতি কাজই রাণী রাসমণি পরিচালনা করতেন এবং জটিল বিষয়ে জামাতা মথুরমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণকে কালী-মন্দিরে বেশকারী বা হৃদয়কে সহকারীরূপে নিয়োগের বিষয়ে যে রাণী রাসমণির সম্মতি ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই! কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই রকম মতিগতি পরিবর্তনে রামকুমারও খুব প্রীত হন।

* * * *

উপরোক্ত ঘটনাগুলি মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর তিন মাসের মধ্যেই ঘটেছিল। এরপরেই দক্ষিণেশ্বরে এমন একটি অঘটন ঘটে, যার সমাধান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারাই সম্ভব হয়।

প্রতিদিন ৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্তিদ্বয় পূজান্তে মধ্যাহ্নে ও রাত্রে পাশের শয়নকক্ষে বিশ্রামের জন্য স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা ছিল। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ৺জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব উপলক্ষে বিষ্ণুমন্দিরের পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজাভোগাদির পর গোবিন্দজীর মূর্তি মন্দিরের সিংহাসন থেকে পাশের শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময়, মন্দিরের মেঝের জলে পা পিছলে প'ড়ে যান, ফলে মূর্তিটির একটি পা ভেঙে যায়।

এই ব্যাপারে সেখানে হুলুস্থুল প'ড়ে যায় এবং এই দুর্ঘটনার জন্য সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন। এই দুঃসংবাদ রাণী রাসমণির কাছে পৌঁছালে, তিনিও অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়েন। এরকম ঘটনা অমঙ্গলসূচক; সুতরাং অবিলম্বে এর প্রতিকার করা প্রয়োজন। দেশপ্রথানুযায়ী ভাঙা বিগ্রহে পূজা নিষিদ্ধ; অথচ পূজা না ক'রে বিগ্রহই বা কেমন ক'রে রাখা যায়? এই সংকটে পণ্ডিতদের মতামত জানার জন্য রাসমণি দেবী মথুরমোহন বিশ্বাসকে নির্দেশ দিলে, শহরের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের আহ্বান ক'রে একটি সভা করা হয়। যাঁরা কার্যবশতঃ সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি, তাঁদেরও মতামত সংগৃহীত হয়। পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি দেখে সবাই একবাক্যে বিধান দিলেন যে, ভাঙা বিগ্রহটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে, নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করা হক।

পণ্ডিতদের সম্মান রক্ষার জন্য রাসমণি দেবীও বিদায়-আদায়ে সেদিন প্রচুর অর্থব্যয় করলেন। নতুন বিগ্রহ তৈরীর জন্য সঙ্গে সঙ্গে কারিগরকে আদেশও দেওয়া হল।

এতকাণ্ডের পরেও, রাসমণি দেবীর মনে একটি কথা বার বার আঘাত দিল যে, যে-মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে এতদিন ভক্তিভরে সেবাপূজা করা হয়েছে, সেই দেবমূর্তি এমনভাবে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে? তাই পণ্ডিতদের দেওয়া বিধান রাসমণি দেবীর মোটেই মনঃপূত হল না। বিধান যতই শাস্ত্রসম্মত হক, রাসমণি দেবীর মন কিছুতেই তাতে সায় দিতে চাইলো না এবং তিনি প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময়েও পণ্ডিতদের দ্বারা নানা বিঘ্ন উপস্থিত হলে, রাসমণি দেবী যখন প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির শীকার হন, তখন সব পণ্ডিতের বিধান ধূলিসাৎ করে যুক্তিসম্মত বিধান দিয়ে সেবার রামকুমার চট্টোপাধ্যায় রাসমণি দেবীর অন্তরের অনন্তবাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর নিজস্ব মহিমায়! এবারেও সেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দল একদিকে,—আর রাসমণি দেবীর তীব্র ভগবৎ-প্রীতি অপরদিকে। সেবারে যেমন রামকুমার এ বিষয়ে ছিলেন সমস্যা সমাধানকারীর ভূমিকায়, এবারও তাঁরই কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজগ্রাহ্য যুক্তিতে রাসমণি দেবীর শুদ্ধ, সরল ও নির্দোষ বাসনা পূর্ণ করলেন বিনা দ্বিধায় এবং সৎসাহসের মাধ্যমে।

রাসমণি দেবীর মানসিক অতৃপ্তির কথা স্মরণ করে মথুরমোহনই তাঁর কাছে প্রস্তাব করলেন, এ বিষয়ে একবার 'ছোট ভট্টাচাজ' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মতামতটি জেনে নিলে ভাল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাত্বিকভাব ও আচরণ লক্ষ্য করে মথুরমোহনের সুদৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, ধর্মের বিষয়ে শুধু পুঁথিপড়া পণ্ডিতদের মতামতের চেয়ে এই নিষ্ঠাবান, ভক্তিমান ও তপস্বী যুবকের মতামত অনেক বেশী মূল্যবান।

অতঃপর মথুরমোহনের অনুরোধে রাসমণি দেবী এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জানতে চাওয়ায়, শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাব মুখে' বলেন—"রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেই রকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমন পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" (লীলাপ্রসঙ্গ—৩য় খণ্ড, গুরুভাব-পূর্বার্ধ)।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সহজ, সরল ও সাহসিকাতাপূর্ণ উক্তি শুনে কেবলমাত্র মথুরমোহনই নয়, স্বয়ং রাণী রাসমণিরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পায়। রাসমণি দেবীর অন্তরের কথা যেন সেদিন অন্তর্যামীরূপেই বুঝে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এইভাবেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রাসমণি দেবীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে

আসেন এবং সকলের অনুরোধে বিগ্রহের ভাঙা চরণটি নিজেই এমন নিপুণভাবে জুড়ে দেন যে, সেটি যে কখনও ভেঙে গিয়েছিল, তা বোঝাই যেত না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুর্ঘটনার পরেই, পূজক ক্ষেত্রনাথকে ৺রাধাগোবিন্দ, তথা বিষ্ণুমন্দিরের পূজার কাজ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় এবং কৃতজ্ঞ রাসমণি দেবীর আন্তরিক আগ্রহে ৺রাধাগোবিন্দের পূজার ভার শ্রীরামকৃষ্ণই গ্রহণ করেন। অতঃপর মা-কালীর বেশকারী ও রামকুমারের সাহায্যকারীরূপে হৃদররামকেই নিযুক্ত করা হয়। চিরপবিত্র এই পূজারীকে ৺রাধাগোবিন্দের পূজার ভার দিয়ে সেদিন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রাসমণি দেবী।

* * * *

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রচণ্ড কাজের চাপে রামকুমারের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকায়, রামকুমার কালীমন্দিরের পূজার ভার শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর অর্পণ করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতেন। সেজন্য প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণকে কালীপূজার জটিল ক্রিয়াকলাপ, আসন, মুদ্রা প্রভৃতি তিনি নিজে শিক্ষা দেন এবং উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরুর সাহায্যে তাঁর তান্ত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থায় আগ্রহী হন। কামারপুকুরে থাকাকালীন রামকুমার নিজেও উপযুক্ত গুরুর কাছে ৺দেবীমন্ত্র গ্রহণ ক'রেছিলেন; কারণ, শাস্ত্রানুযায়ী তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করলে শক্তি পূজায় অধিকার জন্মায় না।

সেই সময় কলকাতায় বৈঠকখানা পল্লীতে একজন সুপণ্ডিত ও প্রবীণ তান্ত্রিক সাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্য বাস করতেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে আসতেন ব'লে মা-ভবতারিণীর পূজক রামকুমারের সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। ভবিষ্যতে মা-ভবতারিণীর পূজার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে রামকুমার শক্তিসাধক কেনারামকেই এই কাজে ব্রতী করেন এবং কেনারামের কাছেই যথাসময়ে (১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের ব্যবস্থায় মহান গুরু কেনারামের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করামাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে সমাধিস্থ হওয়ায়, কেনারাম তাঁর জীবনে এই সর্বপ্রথম এক ভাবসমাহিত যোগীকে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হন এবং শিষ্যের ইষ্টলাভের জন্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন। এরপর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরের ব্যাকুলতার সহায়ে, বৈধী ভক্তির নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করে ক্রমে ক্রমে নিজেই রাগানুগা ভক্তির পথে অগ্রসর হন এবং গুরু কেনারামের আশীর্বাণী সফল করে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।)

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের পর, মা-কালীর পূজায় শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকার আসায়, রামকুমার তাঁর পরিশ্রম লাঘবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালীর পূজার ভার দিয়ে নিজে অল্প পরিশ্রম সাধ্য ৺রাধাকৃষ্ণের পূজার ভার গ্রহণ করেন। এইভাবে

মথুরমোহন বিশ্বাসের অনুমতি নিয়েই দুই ভাই দুটী মন্দিরের পূজার ভার পরিবর্তন করেন এবং রাসমণি দেবীও তাতে সম্মতিদান করেন।

এই ব্যবস্থার ফলে রামকুমারের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হলেও, স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায়, তিনি বিশ্রামলাভের জন্য অতঃপর কামারপুকুর গ্রামে ফিরে যাওয়াই স্থির করেন। এই সময় রাসমণি দেবী ও মথুরমোহন বিশ্বাসের অনুমতি নিয়ে ৺রাধাগোবিন্দের পূজার ভার ভাগ্নে হৃদয়রামের ওপর অর্পণ করে, রামকুমার স্বগ্রামে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে কার্যোপলক্ষে কলকাতার উত্তরে শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে গিয়ে তিনি প্রবল সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ১২৬৩ বঙ্গাব্দে (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) মাত্র ৫২ বছর বয়সে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন।

প্রথম জীবনের প্রধান সঙ্গী ও পিতৃতুল্য অগ্রজ রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ বিহ্বল হয়ে পড়েন। পিতা ক্ষুদিরামকে শৈশবে হারিয়ে এবং অতঃপর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারকেও অকালে হারিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম জীবনেই প্রচণ্ড আঘাত পান। প্রকৃতপক্ষে, রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যের ভাব আসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, রামকুমারই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বীজ বপনের পথিকৃৎ। দক্ষিণেশ্বরে রামকুমারের অবস্থান ছিল মাত্র একবছর।

* * *

রামকুমারের দেহত্যাগের পর থেকেই, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং মা-কালীর পূজা পদ্ধতিও তাঁর দ্বারা অভিনবভাবে পালিত হয়। শক্তিপূজায় নিযুক্ত হয়ে তিনি তার মূলতত্ত্বে পৌঁছাবার জন্য একেবারে উঠে-পড়ে লাগেন। সঠিক পথ দেখাবার কেউ না থাকায়, তিনি নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হন। প্রতিদিন বিধিমত দেবীর দৈনিক পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন করেও তিনি নিজে তৃপ্ত হতেন না। তাঁর মনে হত, জগন্মাতা যদি সত্য হন, তবে তাঁকে সাক্ষাৎ দেখতে হবে, তাঁর কথা শুনতে হবে; নতুবা এই বিরাট মন্দির, এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা, এত জাঁকজমকের পূজারতি—সবই বৃথা। তাই প্রতিদিন পূজান্তে তিনি 'মা' 'মা' বলে কেঁদে তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন।

এই সময় তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃসাধকদের রচিত গান, দেবীর সামনে বসে তাঁর সমধুর কণ্ঠে প্রাণ উজাড় ক'রে গাইতেন, আর তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত,—কখনও কখনও বাহ্যজ্ঞানও লুপ্ত হত। 'মা, দেখা দে! রামপ্রসাদকে যেমন দেখা দিয়েছিলি, তেমনি তোর এই অবোধ সন্তানকে দেখা দে'—এই ছিল তাঁর আকুল প্রার্থনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা—যতক্ষণ মা-কালীর পূজায় নিযুক্ত থাকতেন, ততক্ষণ অবিরাম এমন কাতর ভাবেই মাকে ডাকতেন। রাত্রি গভীর হলে, ঘরের বাইরে এসে নির্জনে বসে মায়ের ধ্যান করতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ির উত্তরদিকে তখন ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ; সেই জঙ্গলের ভেতর একটি আমলকী গাছের তলায় ছিল তাঁর ধ্যান করার স্থান। চারিদিকে বন জঙ্গল, সাপের ভয় এবং ঠিক ঐ স্থানে একটি কবরডাঙ্গা থাকায়, দিনের বেলাতেই কেউ ভয়ে ঐদিকে যেত না। সেজন্য লোকচক্ষুর আড়ালে নিশ্চিন্তমনে ধ্যান করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ স্থানটিই বেছে নিয়েছিলেন। রাত্রে কালীবাড়ির সমস্ত লোক যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন চুপি চুপি বার হয়ে তিনি সেখানে চলে যেতেন।

একদিন রাত্রে ভাগ্নে হৃদয়ের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় এবং ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে না পাওয়ায়, তিনি মামাকে খুঁজতে বার হয়ে দেখেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হনহন ক'রে সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছেন ; কিন্তু হৃদয় ভয়ে আর সেখানে এগিয়ে যেতে পারেন নি। মামাকে ভয় দেখাবার জন্য সেখানে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তেও লাগলেন,—কিন্তু কোন ফলই হল না। এরকম ঘটনা যখন প্রতিদিনই ঘটতে লাগল, তখন স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখার উদ্দেশ্যে হৃদয় একদিন সত্যই সাহসের সঙ্গে বনের ভেতরে ঢুকে লক্ষ্য করেন যে, সেখানকার আমলকীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে ধ্যানে মগ্ন, দেহ নিশ্চল, গলার উপবীত খুলে পাশে রাখা। হৃদয়ের অনেক হাঁক-ডাকের পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ভঙ্গ হল, তখন তাঁর উলঙ্গ হওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে বলেছিলেন যে, এইরকম সম্পূর্ণ পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান—এই অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি আবদ্ধ থাকে ; পৈতাগাছটি অবধি গলায় থাকলে অভিমান জন্মায়—আমি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাই ধ্যানের সময় সব কিছু ত্যাগ।

এইভাবে ঈশ্বরদর্শনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের ব্যাকুলতা দিন দিন তীব্র ভাবে বাড়তে থাকে এবং ঈশ্বরলাভের অন্তরায়স্বরূপ নিজের অভিমান নাশের উদ্দেশ্যে নানাভাবে দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এইসব ঘটনাগুলি রাণী রাসমণি দেবীর আমলেই ঘটেছিল। এই সময় একহাতে টাকা এবং অন্যহাতে মাটী নিয়ে—'টাকা মাটী, মাটী টাকা'—বলতে বলতে উভয়কে সমজ্ঞান করে শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার গর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন। সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কালীবাড়িতে কাঙালীদের ভোজনের পর, তাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে ভক্ষণ ও মাথায় ধারণ করেছিলেন। পরে, তাদের এঁটোপাতাগুলিও নিজের মাথায় বয়ে গঙ্গারতীরে নিক্ষেপ করে, নিজের হাতে মার্জনী ধরে সেইস্থান পরিষ্কার করেছিলেন। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্যে তাঁর পূর্বসংস্কারগুলি ত্যাগ করার অনেক কথা জানা যায়।

এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনব পূজার দ্বারা মা-কালীর সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে 'লীলা প্রসঙ্গ'—গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে ঃ—"দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট

কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়তো দুই ঘণ্টাকাল স্থানুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন ; অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়তো বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন ! আবার অপরাহ্নে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনের সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না !—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।"

"ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে, তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে, লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে ; কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তা সহকারে নিজ গন্তব্যপথে যত অগ্রসর হয়, ততই সাধারণের মনে পূর্বোক্ত ভাব পরিবর্তিত হইয়া উহার স্থলে শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঐরূপ হইয়াছিল। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবাব তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুরবাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, 'অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন !' লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোনদিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিল।"

"দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রভাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারা ক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যান পূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।"

এ সমস্তই রাণী রাসমণি দেবীর আমলের ঘটনা। এমন কি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

মা-কালীকে সাক্ষাৎ দর্শনও এই সময়েই ঘটেছিল। এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ঐ অংশেই বর্ণিত হয়েছে ঃ—"তিনি বলিতেন, মা'র দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ; জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মা'র দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবন আবশ্যক নাই। মা'র ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা অনুভূতি জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"

"পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন—'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছু নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জল ঊর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।' ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি ?—ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন ? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ; কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

"পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা আমায় কৃপা কর, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, একথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, 'চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়কারী চিন্ময়ী

মূর্তি !—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে' ।"

"…ঠাকুর বলিতেন, 'নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনও পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁজর পরিয়া বালিকার মতো আনন্দিতা হইয়া ঝমঝম শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপরতলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িতকেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেন' ।"

উপরোক্ত সব ঘটনাগুলিই রাণী রাসমণির জীবদ্দশায় ঘটেছিল। কিন্তু এত খবর তখন রাসমণি দেবী রাখতেন না বা জানতেনও না। যতই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার ঘন ঘন দর্শন পেতে লাগলেন, ততই তাঁর বাহ্য আচরণেও যেমন বেশী পরিবর্তন হতে লাগল, পূজার কাজেও তেমনি বিধি বিধানের অভাব সকলের নজরে আসতে লাগল। বৈধীভক্তির সীমা ছাড়িয়ে এই সময় রাগাত্মিকা বা প্রেমাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করে তিনি নিজের ভাবেই দেবীপূজা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কখনও পূজার ফুল দেবীকে না দিয়ে নিজের মস্তকেই দিতেন, কখনও নিবেদিত অন্নাদি দেবীর মুখে তুলে দিতেন, আবার নিজের মুখেও পুরে দিতেন। কখনও দেবীর সঙ্গে আপনমনে নানাকথা কইতেন, কখনও বা কলহাস্যে মন্দির মুখরিত করে তুলতেন, আবার কখনও গানে গানে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করতেন।

এই সব কাণ্ড দেখে ভাগ্নে হৃদয়ের মনে ধারণা জন্মায় যে, মামা শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছেন এবং এই সংবাদ যদি রাণীমার কানে পেঁছায়, তাহ'লে মামার ভাগ্যে নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটবে। হৃদয় মামার এসব ব্যাপার গোপন রাখার চেষ্টা করলেও, কালীবাড়ির লোকেদের এই বিষয়ে নজর এড়ায়নি। কালীবাড়ির খাজাঞ্চী শ্রীরামকৃষ্ণের এই পাগলামি বরদাস্ত করতে না পেরে, সকল ঘটনা জানবাজারের বাড়িতে জানালেন।

জানবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় এই সব খবর পেঁছালে, মথুরমোহন নিজে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে খবর পাঠান এবং কর্মচারীদের ধারণা হয় যে, মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের এই কীর্তিকলাপ নিজে এসে দেখলেই, তৎক্ষণাৎ তাঁকে পূজকের পদ থেকে নিশ্চয়ই বরখাস্ত করবেন।

পূর্বে কাউকে কিছু না জানিয়েই মথুরমোহন স্বয়ং একদিন পূজার সময় হঠাৎ কালীমন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অভিনব পূজা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ভাববিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মা-কালীকে নিয়ে এমন তন্ময় যে, মথুরমোহনের কালীমন্দিরে প্রবেশের ঘটনার প্রতিও তাঁর খেয়াল ছিলনা। সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করে মথুরমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়—শ্রীরামকৃষ্ণ

সাধারণ পাগল নন,—'ভাবের পাগল'। মা-কালীর কাছে তাঁর বালকের মত আব্দার, অনুরোধ প্রভৃতি দেখে মথুরমোহন স্থির করেন যে, ঐকান্তিক প্রেমভক্তি ছাড়া এমন অকপট ভক্তি বিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তো কিসে তাঁর দর্শনলাভ হবে? পূজা করতে করতে ছোট ভট্‌চায্, তথা শ্রীরামকৃষ্ণের কখনো গলদশ্রুধারা, কখনো অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখনো-বা জড়ের মত সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচল ও বাহ্য বিষয়ে লক্ষ্যরাহিত্য দেখে তাঁর চিত্ত এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হল। তিনি অনুভব করলেন যে শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম করছে এবং পূজক শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন।

অনন্তর দূর থেকে ভক্তিপূতচিত্তে সজল নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁর অপূর্ব পূজককে বার বার প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলেন—'এতদিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্য সত্যই এখানে আবির্ভূতা হলেন, আর এতদিনে মায়ের পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হল।'

কর্মচারীদের কারুকে কিছু না বলে সেদিন মথুরমোহন দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমানন্দে জানবাজারের বাড়িতে ফিরে যান এবং রাণীমাকে পরম উৎসাহ ভরে মন্দিরের আনুপূর্বিক ঘটনা সবিস্তারে নিবেদন করেন। তিনি রাণীমাকে একথাও বলেন যে, বহু ভাগ্যের গুণে এমন অদ্ভুত ভাবরাজ্যের পাগল পূজক পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং পাষাণ প্রতিমা এবার জাগ্রত হবেনই।

মথুরমোহনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত প্রেমরসসিঞ্চিত শ্রেষ্ঠ পূজা-কাহিনী শুনে রাণীমার মনেও বিশ্বাস জন্মায় যে, তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত এবার সত্যই সফল হতে চলেছে,—মা-কালী নিজেই কৃপা করে এমন পূজক জুটিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাণীমার অনুমতিক্রমে মথুরমোহন দক্ষিণেশ্বরে খাজাঞ্চীকে বলে পাঠান যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের যেমন অভিরুচি, তেমনিভাবেই মায়ের পূজা করুন, তাঁকে যেন কোন প্রকারে বাধা না দেওয়া হয়।

এরপর যখনই রাণীমা বা মথুরমোহন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিনব পূজা দেখে ও তাঁর সুললিত কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান শুনে মুগ্ধ হতেন। যত দিন যেতে লাগল, এই পাগল পূজারীর ওপর রাণীমার অনুরাগও আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। দক্ষিণেশ্বরে এলেই তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ না করে যেতেন না। এমনকি তাঁর প্রাণের উচ্ছাসে গাওয়া গানগুলিও তিনি মন দিয়ে শুনতেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ২য় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ—"রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

'কোন্ হিসাবে হরহৃদে, দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥

জেনেছি জেনেছি তারা,
তারা কি তোর এমনি ধারা,
তোর মা কি তোর বাপের বুকে, দাঁড়িয়েছিল অমনি করে ॥'

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন, একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন! গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে। কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সঙ্গীত উপলক্ষেই দক্ষিণেশ্বরে এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, যেটির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। 'লীলা প্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ—"আজ রাণী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুর বাড়িতে আসিয়াছেন। কর্মচারীরা সকলে শশব্যস্ত ; যে ফাঁকিদার, সে'ও আজ আপন কর্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ৺কালীর পূজা ও বেশ হইয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রাণী মন্দির মধ্যে শ্রীমূর্তির নিকটে আসনে আহ্নিকপূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া মার নাম গান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন ; রাণী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐ সকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া, বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা ?'—বলিয়াই রাণীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব! কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!"

"মন্দিরের কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলেই হৈ চৈ করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্মচারীরাও মন্দির মধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রাণী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর! কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মকদ্দমার ফলাফলের বিষয়ে ধ্যান করিতেছিলেন, রাণী রাসমণি নিজের অন্তর

পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ, অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাণীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্তমান! পরে কর্মচারীদের গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙিল ও বুঝিলেন—নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোক-দিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।'

"...গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা ঠাকুর যে কিভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রাণী রাসমণি—যাঁহার ধন, বুদ্ধি, ধৈর্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত! এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথবা যদি কখন কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয়, তা চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত! তাঁহার অন্যায় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রাণীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি—স্বার্থগন্ধহীন বিরাট 'আমি'টার সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে, রাণীর ন্যায় ভক্তিমতি সাত্বিক প্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিবদ্ধ দৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন, তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ—এ কথাটি আপনা-আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা ঠাকুর যেমন বলিতেন,—'তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখন কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না; বা মান, ক্ষমতা, প্রভৃতি হজম করিতে পারে না।' সাত্ত্বিক—প্রকৃতি সম্পন্না রাণীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।"

'লীলাপ্রসঙ্গকার" ঘটনাটিকে রাণীমার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাবে 'কৃপা' ব'লেই ব্যাখ্যা ক'রেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে উত্তরকালে বহু ব্যক্তিকে কেবলমাত্র

স্পর্শদ্বারাকৃপা ক'রেছিলেন, এ রকম বহু উদাহরণ আমরা ঠাকুরের জীবনীতে পেয়েছি। কিন্তু রাণীমার ঠাকুরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল এবং আত্মসংযম যে কত দৃঢ় ছিল, তার পরিচয় এই ঘটনাতেই পাওয়া যায়। তিরস্কারের যথার্থ কারণ আছে বুঝতে পেরে, রাণীমা তাঁর ভৃত্যদের সামনেও এই শাসন অবিচলিত চিত্তে মাথা পেতে নিয়েছিলেন—এটি 'কৃপা' ধারণ করারও অসীম ক্ষমতা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যা ক'রেছিলেন, তা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সম্পূর্ণ যন্ত্র-চালিতের মত ক'রেছিলেন—স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। ঠাকুরের সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার পরিচয় সেদিন একমাত্র রাণীমাই পেয়েছিলেন—আর কেউ নয়: এর পরেও পূজকের পদে শ্রীরামকৃষ্ণকে বহাল রাখা রাণীমার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল —কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর চৈতন্যময় শক্তির স্পর্শে, রাণীমার ভাগবতী প্রকৃতিরও সম্যক বিকাশে সাহায্য ক'রেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এইটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 'কৃপা'।

সেদিন যদি রাণীমা সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝে, নিজের আত্মাভিমানে তাঁকে পূজকের পদ থেকে বরখাস্ত করতেন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার গতি কোন্ দিকে মোড় নিত, তা ধারণা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রাণীমার চরিত্র অনুধাবনে এই ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমণি পর্বে সেজন্য এই একটি মাত্র ঘটনাই উভয়কে প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সম্পর্কে উন্নীত করেছিল।

* * * *

এই ঘটনার পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমাভক্তির বেগ এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই মথুরমোহনকে জানিয়ে দেন যে, কালীমন্দিরের বাঁধাধরা কাজ আর তাঁর দ্বারা সম্ভব নয় এবং সেজন্য যেন তাঁকে ঐ কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন প্রকার বাধা না দিয়ে, মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রস্তাবমত হৃদয়কে সাময়িকভাবে কালীমন্দিরের পূজকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু হৃদয়ের ওপর এই সময় কাজের চাপ খুব বেশী হওয়ায়, সেই সময় কাজের সন্ধানে আগত শ্রীরামকৃষ্ণের খুল্লতাত ভ্রাতা রামতারক ওরফে হলধারীর ওপর কালীপূজার ভার দেওয়া হয়। এটি ইংরাজীর ১৮৫৮ সাল ও বাংলার ১২৬৫ সনের ঘটনা। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের পূজার দায় থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তমনে সাধনমার্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

কিন্তু রাণীমার অঙ্গে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ আঘাত করেছিলেন, সেদিন থেকেই মথুরমোহনের মনে সন্দেহ জাগে যে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে উন্মত্ততার সংযোগ হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তিনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই সময় অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য সমুদয় সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং বিভিন্ন সাধন প্রণালীর কার্যকারিতা স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে তার ফলাফল জানতে আগ্রহী

হন। ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই অনেক সাধু সন্ন্যাসী অতিথিরূপে আসতে থাকায়, সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই তিনি আলাপ করতেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বরলাভের জন্য সকল প্রকার সাধনায় উত্তীর্ণ হতেন। এজন্য তাঁর আচরণের মধ্যে সাধারণের চোখে অস্বাভাবিকতার লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পেত।

রাণীমা এবং মথুরমোহনের যদিও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দৈবশক্তি সম্পন্ন পুরুষ এবং জগন্মাতার বিশেষ কৃপাপাত্র, তবুও তাঁর নানা বাহ্যিক বিপরীত আচরণ লক্ষ্য করে, তাঁদের উভয়ের মনে ধারণা জন্মায় যে, অত্যুগ্র তপস্যা শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে সম্ভবতঃ সহ্য হয়নি এবং তার ফলেই ভাবের পাগলামির সঙ্গে সত্যকারের পাগলামিও কিছুটা যুক্ত হয়েছে।

মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের বায়ুপ্রবণ ধাত জেনে প্রথমে তাঁর জন্য মিছরির সরবত-পানের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায়, কলকাতার কুমারটুলী নিবাসী তখনকার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এইসময় সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে ও মনে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দীর্ঘদিন যাবৎ কবিরাজী মতে তাঁর চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোন উপকারই হয়নি। আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের শারিরীক ও মানসিক লক্ষণগলি প্রত্যক্ষ ক'রে এবং তাঁর দৈহিক দৈবক্রিয়াগুলির সম্যক পরিচয় পেয়ে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ পরবর্তীকালে তাঁর চিকিৎসা বন্ধ করেন এবং ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ সেনের অভিমত অনুযায়ী এটিকে যোগজ-ব্যধি ব'লে ঘোষণা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তৎকালীন অবস্থার কথা 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে এইভাবে বর্ণিত আছেঃ—"সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এমন কোন লোক ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই, যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে সুচালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন! সুতরাং সকল সাধন প্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে, ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা ভয় প্রভৃতি শারিরীক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাস সকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং শারিরীক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবন রক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিলনা। ঠাকুর বলিতেন, 'শরীর

সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া, ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জট পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে, মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থ-জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যাগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! এইরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্ম-নিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া যাইত, তাহার হুঁসই থাকিত না! পরে সন্ধ্যা সমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে, তাই অত কাঁদিতেছে'।"

মা-কালীর দর্শনলাভের কিছুকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরঘুবীরের সাক্ষাতের জন্যও ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। এই সময় ভক্তপ্রবর মহাবীরের অনুকরণে তিনি দাস্যভক্তি-সাধনে তৎপর হন এবং শীঘ্রই রঘুপতি রামচন্দ্র ও মা জানকীকে দর্শন করেন। এই সাধনকালে তিনি কাপড়টিকে লেজের মত করে কোমরে জড়িয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে বীর হনুমানের মত চলতেন, —গাছের ওপর উঠে ফলমূলাদি আহার করতেন এবং নিরন্তর 'রঘুবীর' 'রঘুবীর' বলে গম্ভীর স্বরে চীৎকার করতেন।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নানা অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের দরুন, তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম, খুল্লতাত ভ্রাতা রামতারক বা হলধারী প্রমুখ আত্মীয় ও অন্যান্য কর্মচারীরা যেমন তাঁর সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, রাণীমা ও মথুরমোহনও সমভাবে তাঁর এই সব অভিনব কার্যকলাপের তাৎপর্য ঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পেরে, এবার অন্যরকম চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, শুদ্ধ সাধনার জন্য ইন্দ্রিয়াদি দমনের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ অবস্থা এবং এই অবস্থার প্রতীকার করলেই তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন। এজন্য সেসময় রাণীমা ও মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে সুস্থ করার অভিপ্রায়ে নিজেরাই এমন একটি 'অসুস্থপন্থা' অবলম্বন করেন, যার ফলশ্রুতিও হয় শূন্য।

এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ— "সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের জন্য ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্যভঙ্গ হইলে পুনরায়

শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তাঁহারা লছমীবাই প্রমুখ হাবভাব সম্পন্না সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সংকুচিত হইয়া কূর্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।"

এই সময়ে ঐরকম ধরণের এত ঘটনা ঘটে যে, তার কিছু কিছু বিবরণ দিতে গেলেও একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তাই কেবলমাত্র কয়েকটি মূল ঘটনারই উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। তবে এটি ঠিক যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব অদ্ভুত কার্যকলাপ সত্ত্বেও রাণীমা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে রেখেই সকলপ্রকার সাধন-ভজনের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং মন্দিরের কাজ না করলেও তাঁর বেতন পূর্বের মতই বহাল রেখেছিলেন।

* * *

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যত্যাগ ও উন্মাদনার কথা কামারপুকুরে পৌঁছালে, তাঁর মাতা চন্দ্রমণি এবং মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন বা কার্তিকমাসে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) মাতা চন্দ্রমণির আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে চলে আসেন।

কামারপুকুরে আসার পরেও তাঁর আচরণের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হওয়ায়, চন্দ্রমণি পুত্রের চিকিৎসার জন্য গ্রামীণ প্রথায় প্রথমাবস্থায় ঝাঁড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতি করালেন—কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। মাতার মনে তখন একটি বিষয় বিশেষভাবে স্থান পেল যে, তাঁর গদাধরের (তথা শ্রীরামকৃষ্ণের) বয়স প্রায় ২২/২৩ বছর হয়েছে, সুতরাং এই সময়ে যদি তাঁর বিবাহ দেওয়া যায়, তবে হয়তো মতি গতির পরিবর্তন হতে পারে। সেইমত তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা মাত্রই তিনি বিবাহে রাজী হন এবং তাঁরই পূর্ব মনোনীতা পাত্রী, জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহাদি ব্যাপারের বিশদ বিবরণ এখানে বর্ণনার প্রয়োজন নেই, কারণ এটি দক্ষিণেশ্বরের ঘটনা নয়—যদিও রাণী রাসমণির আমলেরই ঘটনা।

বিবাহের পর প্রায় দেড় বছর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায়, তিনি আর বেশীদিন কামারপুকুরে না থেকে,

১২৬৭ বঙ্গাব্দের শেষভাগে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। প্রথমদিকে কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর, আবার তাঁর সেই ভাবোন্মাদ অবস্থা ফিরে আসে এবং ঠিক আগের মতই সব কিছু ভুলে আবার 'মা' 'মা' রবে পাগলের মত আচরণ করতে থাকেন। রাণীমার নির্দেশমত এবারেও মথুরমোহন তাঁর সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর সেবাযত্নের যাতে কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে বিশেষ ভাবে সকলেই মনোযোগী হন। পরে অবশ্য কালীভক্ত রামকানাই ঘোষালের (স্বামী শিবানন্দের পিতা) পরামর্শে 'ইষ্টকবচ' ধারণ করার পর, তাঁর শারীরীক কষ্টের অবসান হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রাণীমার শেষ সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায়ঃ—"বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাণীও ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে সংসার হইতে সত্বরই বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বিষয় সংক্রান্ত সমগ্র কার্যভার সুযোগ্য বুদ্ধিমান জামাতা মথুরানাথের উপর অর্পণ করিয়া এখন হইতে অধিকাংশ সময় দক্ষিণেশ্বরের শান্ত পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী ও প্রাণোন্মাদকারী মধুর সঙ্গীত শ্রবণ, জপধ্যান ও ভক্তজন সেবা প্রভৃতি তাঁহার শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গ প্রভাবে ও তাঁহার অপার করুণায় দিন দিন আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্না হইয়া বিমলানন্দের অধিকারিণী হইলেন।" (স্বামী তেজসানন্দ রচিত—'শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা'-গ্রন্থের 'রাণী রাসমণি' প্রসঙ্গ)

অবশ্য এরপর রাণী রাসমণি আর বেশীদিন বাঁচেন নি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তাঁকে কালীঘাটে আদিগঙ্গার তীরে নিজের আর এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক জগতে রাণী রাসমণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের ইতি হয়। (রাণীর তিরোভাবের কথা এই গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)।

রাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর থেকেই দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী প্রভৃতির আগমন হয় এবং এরও পরে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রমুখ বহু ব্যক্তির আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 'অবতার'রূপেও স্বীকৃত ও পূজিত হন এবং দেশ-বিদেশে তাঁর অপূর্ব লীলা মাহাত্ম্য নানাভাবে প্রচারিত হতে থাকে। আলোচ্য পর্বটি যেহেতু কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমণি বিষয়ক, সেজন্য পরবর্তী সেইসব সর্বজনবিদিত লীলাকাহিনীর বর্ণনায় বিরত হতেই হবে।

* * * *

আলোচ্য পর্বটি বিশ্লেষণ করলে এটি বেশ বোঝা যায় যে, রাণীমা নিজে খুব ভক্তিমতি এবং প্রকৃত বৈষ্ণবভাবের সাধিকা হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি

বরাবরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁর সরলতা, উদারতা, পবিত্রতা, ধর্মপ্রাণতা ও অমায়িকতার জন্য তিনি রাণীমা সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে 'মা-জগদম্বার অষ্টসখীর একজন' ব'লে অভিহিতও করে'ছিলেন। রাণীমাও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত মহাভাব লক্ষ্য ক'রে তাঁর সাধনার পথে আন্তরিক সাহায্য ক'রেছিলেন, তাঁকে সকলপ্রকার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও করেছিলেন, চিকিৎসার ব্যবস্থাও ক'রেছিলেন —এমন কি, এই নির্দেশও রেখে গিয়েছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন কালীমন্দিরে বাস করতে পারবেন এবং যতদিন বাস করবেন, ততদিন পূর্ববৎ বেতন পাবেন।

পরিশেষে বলা দরকার—শ্রীরামকৃষ্ণকে পরবর্তীকালে জগৎশুদ্ধ লোক চেনার আগেই, রাণীমা তাঁর অন্তরের সর্বাতিশায়ী আত্মভাবের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ভাবে দেখেছিলেন, চিনেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। রাণীমার বাৎসল্য-ভাবকে আশ্রয় ক'রেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পরম স্নেহময়ী রাণীমার স্নেহময় মাতৃভাবের ঔদার্য্য ও মাধুর্যের সংমিশ্রণে তিনি 'গদাধর' থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণে' পরিণত হয়েছিলেন—আলোচ্যপর্বের এইটাই মূল কথা।

॥ ১৮ ॥

তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, সততা ও দানশীলতা

এবার আমরা অশেষ গুণময়ী রাণী রাসমণির জীবনাদর্শে ক্ষাত্রবীর্যের অবিনশ্বর কীর্তিগুলির বিষয়ে আলোকপাত করব। তাঁর তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, সততা ও দানশীলতা,—এই শুদ্ধশীলা, নিরাভিমানিনী, কুসংস্কারহীনা, বীরাঙ্গনা রমণীকে প্রকৃতি-যজ্ঞের হোতারূপে প্রচ্ছন্ন আনন্দে লীলায়িত ক'রেছে। যে ঘটনাগুলির মাধ্যমে তিনি রক্ষাকর্ত্রী, মাতা, বন্ধু ও দিশারীরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিতা, সেই ঘটনাগুলির প্রতিটিই সত্য। এগুলি কোন গল্প কথা নয়। তাঁর জীবনে নানা ঘটনা প্রবাদ বাক্যের মত ঘরে ঘরে প্রচারিত হলেও, যে ঘটনাগুলিতে তিনি বিশেষভাবে পরিস্ফূর্ত, সেই সত্য ঘটনাগুলির কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, যদিও ঘটনাগুলি অবশ্য ধারাবাহিক নয়।

* * *

স্বামী রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর, তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জমিদারী পরিচালনা ও বিষয়কর্মের হিসাব পর্য্যালোচনার কাজ রাণীমা নিজেই

করতেন। তাঁর উপযুক্ত তিন জামাতা এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করলেও, কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ও বিষয় বুদ্ধিতে কৌশলী হওয়ায়, রাণীমা অবশ্য তাঁর ওপরই বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ নির্ভর করতেন।

স্বর্গগত রাজচন্দ্র দাস তাঁর বিশেষ বন্ধু প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে একবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে দু-লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন; কিন্তু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পরেও প্রিন্স দ্বারকানাথ সেই টাকা ফেরৎ দেননি।

একদিন প্রিন্স দ্বারকানাথ রাণীমার কাছে এসে স্বর্গগত রাজচন্দ্র দাসের তৎকালীন বিশাল সম্পত্তি ও জমিদারী রক্ষার জন্য একজন 'ম্যানেজার' রাখার প্রস্তাব করেন এবং সেই ম্যানেজারের পদে নিজেই নিযুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাণীমা প্রিন্স দ্বারকানাথকে তাঁর স্বামীর ঋণ দেওয়ার কথা জানতেন। তাই মথুরমোহনকে মধ্যস্থ রেখে বুদ্ধিমতী রাণীমা যবনিকার অন্তরাল থেকেই প্রিন্স দ্বারকানাথকে ইঙ্গিত ক'রে বলেছিলেন—'ম্যানেজার রাখলে ভাল হয় ঠিকই কিন্তু তেমন বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর'। একথা শুনে প্রিন্স দ্বারকানাথ যখন ঐ ম্যানেজারের পদে তাঁকে বিশ্বস্তরূপে নিযুক্ত করার প্রস্তাব রাখেন, তখন ক্ষত্রিয়াণী, নির্ভীক রাসমণি সরাসরি প্রিন্স দ্বারকানাথকে বলেন,—'সে তো খুব ভাল কথা। আমি এখনও জানতে পারিনি যে, আমার স্বামীর কার কার কাছে কত টাকা পাওনা আছে। তবে আমার স্বামী আপনাকে যে দু-লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই টাকাটা যদি আপনি এখন আমায় ফেরৎ দেন, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।'

স্বর্গগত স্বামীর বন্ধু এবং তৎকালীন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এইভাবে একজন বিধবা মহিলার পক্ষে বিদ্যুৎ-বজ্রের মত বিস্ফোরক আক্রমণ—রাণীমার সৎ সাহস, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং অখণ্ড তেজস্বিতারই পরিচয় বহন করে। বলা বাহুল্য, এই অপ্রিয় ঘটনার পর, প্রিন্স দ্বারকানাথ সেই সময় নগদ টাকায় ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হওয়ায়, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তাঁর স্বরূপপুর পরগণাটি রাসমণির নামে লিখে দিয়েছিলেন। এই পরগণার তখন বার্ষিক আয় ছিল ৩৬ হাজার টাকা।

এরপর কিছুদিন বাদে প্রিন্স দ্বারকানাথ আবার রাণীমার কাছে ম্যানেজার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, জামাতা মথুরমোহনের মাধ্যমে তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন—'আমি বিধবা স্ত্রীলোক, আমার এই সামান্য বিষয়-সম্পত্তি আপনার মত যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করতে বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পুত্রস্থানীয় ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই এই কাজ পরিচালনা করতে পারবেন।'

এইভাবে কৌশলে ও তেজস্বিতা সহকারে প্রিন্স দ্বারকানাথকে রাণী রাসমণি পরাজিত করায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ স্বীকার ক'রেছিলেন—'উত্তম, বুঝলাম এই রাণী সামান্যা স্ত্রীলোক ন'ন।'

প্রকৃতপক্ষে, রাণীমার তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে সেদিন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হার স্বীকার ক'রেছিলেন।

* * * *

তখনকার দিনে জমিদারেরা নিজেদের প্রতাপ জাহির করার জন্য অসাধু উপায়ে নানাকাজ করতেন। রাণীমার জমিদারীর মধ্যে একটি তালুকের নাম ছিল জগন্নাথপুর। এই জগন্নাথপুর তালুকের চারদিকেই নড়াইলের জমিদারের জমিদারী ছিল। নড়াইলের তৎকালীন জমিদার রামরতন রায়, রাণীমার এই তালুকটি দখল করার ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং সেই অছিলায় রাণীমার সেখানকার কর্মচারী ও প্রজাদের উত্তক্ত করার জন্য নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করতেন। এমনকি, সেখানে প্রজাদের সর্বস্ব অপহরণ, গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতি নানা পৈশাচিক ঘটনাও ঘটত। জমিদার রামরতন রায় এইভাবে সেখানে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেন, যাতে প্রজারা রাসমণির বদলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী জানবাজারের বাড়িতে পৌঁছালে, তেজস্বিনী ও মমতাময়ী রাণীমা অত্যন্ত বিচলিতা হন এবং সর্বশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে এই অত্যাচার বন্ধের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

রাণীমার আদেশে 'মহাবীর' নামে এক সর্দারের নেতৃত্বে প্রচুর লাঠিয়াল প্রজাদের রক্ষার জন্য জগন্নাথপুর তালুকে উপস্থিত হয়। সর্দার মহাবীর ছিল জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের বিশেষ প্রিয় লাঠিয়াল। মহাবীর যেমন ছিল শক্তিশালী, তেমনি আবার ছিল গম্ভীর-প্রকৃতি ও সদাশয় ব্যক্তি। মহাবীরের আগমনে জমিদার রামরতন রায়ের লোকজন প্রথমাবস্থায় ভয়ে পিছিয়ে যায় এবং কৌশলে মহাবীরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। অতঃপর গুপ্ত আততায়ীর অস্ত্রের সবল আঘাতে মহাবীর আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হওয়ায় সেখানে প্রাণত্যাগ করে।

মহাবীরের এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে, রাণীমার জগন্নাথপুরের নায়েব, বিপক্ষের ওপর প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেজন্য চব্বিশপরগণা, বর্ধমান, হুগলী ও অন্যান্য জায়গা থেকে রাণীমা বাছা বাছা লাঠিয়াল, পাইক, সড়কীওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করেন এবং টাঙ্গী, বল্লম, বর্শা, লাঠি, সড়কী, কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণকায় ভীষণাকার বলশালী লোকেরা 'জয় মায়ের জয়,' 'জয় রাণী রাসমণির জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। জমিদার রামরতন রায়ও অবস্থা বুঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য প্রস্তুত হলেও, 'রাণী মায়ের জয়'—এই ভীষণ হুঙ্কারে তাঁর নিজের লোকজনই স্তম্ভিত হয়ে আর অগ্রসর হয়নি। তেজস্বিনী রাণীমার তেজদীপ্ত নাম-মাহাত্মই সেদিন বহুলোকের প্রাণরক্ষা করেছিল—দাঙ্গাহাঙ্গামা না হওয়ার ফলে। অবশ্য রাণীমাও তাঁর পক্ষ থেকে আক্রমণ ক'রে অপরপক্ষের নিরীহদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন।

এরপর দৃঢ়চেতা রাণীমা, জমিদার রামরতন রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেন। দু-বছর মামলা চলার পর রাণী রাসমণিরই জয় হয় এবং প্রজাগণও সেখানে নিশ্চিন্তে বাস করতে থাকেন।

প্রবল প্রতাপশালী নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল পাঠানো এবং আদালতে মামলা রুজু ক'রে তাঁকে পরাজিত করা,—রাণীমার দুর্বার তেজস্বিতা এবং প্রজাবাৎসল্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।

* * *

রাণীমার জমিদারীর মধ্যে মকিমপুর পরগণা ছিল অন্যতম। সেখানে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে নিরীহ ও গরীব চাষীদের রক্ষা করা,—রাণীমার তেজস্বিতার অন্যতম পরিচয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে 'চাটার্ড এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুযায়ী এদেশে শ্বেতাঙ্গদের জমি কেনার অধিকার এবং নীলচাষ করার অধিকার দেওয়া হয়। এক সময় গ্রামে গ্রামে নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘনিয়ে আসার ফলে, ইংরাজ-নীলকরেরা গরীব চাষীদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের জমিগুলি কিনতে থাকে এবং সেই জমিতেই ছলে বলে কৌশলে তাদেরই দিয়ে নীলচাষ করাতে থাকে। কিন্তু যারা এই চাষে আগ্রহী ছিলনা, তাদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করা হত। এমনকি, এই সব চাষীদের ওপর অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন করে, সেখানে সাহেবরা একসময় সন্ত্রাসের রাজত্বও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ইংরাজ-জজ, ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট এই সব অত্যাচারী সাহেবদের পক্ষে থাকায়, গ্রামে গ্রামে পেয়াদা-পাইকদের দ্বারা তারা চাষীদের শাসন করত এবং সকল রকমে উৎপীড়ন করত।

রাণীমার মকিমপুর পরগণাতেও একইভাবে নীলকর সাহেবরা একদা অত্যাচার শুরু করে। সেখানকার চাষীদের জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে, বলপ্রয়োগ করে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করায়। অতঃপর উৎপীড়িত চাষীরা রাণীমার শরণাপন্ন হয়।

তেজস্বিনী রাণীমা এই নিরীহ ও নির্দোষ চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সেখানকার নায়েবের কাছে ৫০ জন লাঠিধারী দারোয়ান পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাক্ষরিত এক পত্রে নায়েবকে নির্দেশ দেন যে, অত্যাচারিত চাষীদের রক্ষার জন্য যেন নীলকর-সাহেবদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে তখন জনৈক 'ডোনাল্ড' নামে এক নীলকর সাহেবই এই উৎপীড়নের নায়ক ছিলেন। রাণীমার নিযুক্ত লাঠিয়ালেরা চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং রাণীমার নির্দেশমত সেই অত্যাচারী ডোনাল্ড সাহেবকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে মৃতপ্রায় করে দেয়। এই ঘটনার পর থেকেই নীলকর-সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ হলেও সাহেবরা আদালতে রাণীমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে; কিন্তু সে মামলা ডিসমিস বা খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও রাণীমা নিরস্ত না হয়ে তাঁর এলাকা থেকে সমস্ত নীলকর-

সাহেবদের বিতাড়িত করেন এবং তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেন যে, কোন কারণেই যেন কোন চাষী তার জমি সাহেবদের বিক্রী না করে।

এই ভাবে বিপন্ন চাষীদের রক্ষাকর্ত্রীরূপে তৎকালে ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাণীমা যেভাবে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, অনেকের কাছেই হয়তো আজ তা অজ্ঞাত, অথবা বিস্মৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের নীলবিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন নদীয়ার দুই মাহিষ্য-জমিদার—বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র প্রখ্যাত 'নীলদর্পণ'-নাটক রচনার মাধ্যমে, সমসাময়িক সমাজ জীবনে স্বাদেশিকতার চেতনা সৃষ্টি করেন। দীনবন্ধু মিত্রের ঐ নাটক রচিত হবার পর থেকেই নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং অবশেষে এই অমানুষিক অত্যাচারও বন্ধ হয়। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তেজস্বিনী রাণী রাসমণি কিন্তু এই সব ঘটনার বহু আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে সংগ্রামে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে নীলবিদ্রোহের সূত্রপাতের প্রকৃত পথিকৃৎ ছিলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী, বীরাঙ্গনা ও তেজস্বিনী রাণী রাসমণি, যিনি জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি।

* * *

একবার গভর্ণমেণ্ট থেকে আইন জারী করা হয় যে, গঙ্গায় মৎস্যজীবি বা জেলেরা মাছ ধরলে, তাদের 'জলকর' দিতে হবে। প্রথমে গরীব জেলেরা এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রমুখ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু প্রবল প্রতাপ ইংরাজ সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে কেউই তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশেষে জেলেরা অগতির গতি রাণীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাদের ওপর এই আকস্মিক কর ধার্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেঁদে প্রার্থনা জানায়। তেজস্বিনী ও পরদুঃখে কাতরা রাণীমা তাদের দুঃখের কাহিনী শুনে তাদের অভয় দেন এবং কররোধের প্রতিশ্রুতি দেন।

অতঃপর বুদ্ধিমতী রাণীমা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে, গঙ্গায় যেখানে জেলেরা মাছ ধরে, সেই অংশটি ইজারা নেওয়ার মনস্থ করেন। কর্মচারীদের ডেকে তিনি নির্দেশ দেন, গঙ্গায় যতটা জায়গায় জেলেরা মাছ ধরে, সমস্ত জায়গাটাই গভর্ণ-মেণ্টের কাছ থেকে উচিৎ মূল্যে জমা করে নাও। গভর্ণমেণ্টও আয়ের লোভে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে রাণীমাকে ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ অবধি গঙ্গা 'লীজ' বা জমাবিলি করে দেয়। এর পরেই রাণীমার আদেশে তাঁর কর্মচারীরা ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ অবধি গঙ্গার ওপর দড়ি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে (মতান্তরে লোহার চেন দিয়ে) গঙ্গা ঘিরে দেয়। ফলে, ঐ ঘেরা অংশে জেলেরা যেমন মহানন্দে মাছ ধরার সুযোগ পেল, তেমনি গঙ্গাবন্ধনের দরুণ সেই পথে জাহাজ নৌকাদি চলাচলও বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার সরকারের টনক নড়ায়, রাণী রাসমণির কাছে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ এল—জলপথ মুক্ত করা হ'ক এবং এই জলপথ বন্ধ ক'রে সরকারী মাল সমূহের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কারণ দর্শানো হ'ক। তেজস্বিনী রাসমণি সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও পথ খুলে দিলেন না, বরং লোক মারফৎ সরকারকে জানালেন—'আমি কর দিয়ে গঙ্গা জমা নিয়েছি, সুতরাং আইনতঃ আমি ঐ পথ বন্ধ করতে পারি। আমার প্রজাদের অসুবিধা হচ্ছে; এই অংশে অনবরত জাহাজ চলাচল করলে এবং কলকাতার বন্দরে জাহাজের ঘাঁটি হলে, এখানে গঙ্গায় জাহাজের শব্দের ভয়ে কোন মাছ থাকবে না। প্রজাদের এই ক্ষতি এড়াবার জন্যই আমি এখানে জাহাজ আসতে দিতে পারি না।'

সরকার রাণী রাসমণির এই অকাট্য যুক্তির কোন উত্তর দিতে না পেরে, তাঁর সঙ্গে আপোষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাসমণি এবার তাঁদের জানালেন— 'গঙ্গা জমা নেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। আমি শুধু গরীব জেলেদের মুখ চেয়েই এটি জমা নিয়ে বিনা কর-ই তাদের মাছ ধরতে দিতাম। সরকার যদি আগেকার মত বিনা কর-ই আবার জেলেদের মাছ ধরতে দেন, তা হলে আমি পথ খুলে দিতে রাজী আছি।''

সরকার তখন বিপাকে প'ড়ে বাধ্য হয়ে 'জলকর'-প্রথা বন্ধ করেন এবং রাণী রাসমণির লীজের দরুন সমুদয় অর্থ ফেরৎ দিয়ে আবার গঙ্গার অধিকার পান। তাঁর এই বুদ্ধিমত্তার ফলে, সেই থেকে আজও জেলেরা বিনা কর-ই গঙ্গায় মাছ ধরে আসছে।

এই তেজস্বিনী নারীর আত্মপ্রত্যয় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্মরণ ক'রে সেই সময় তাঁর নামে একটি গান রচিত হয়েছিল এবং মুখে মুখে তখন সেই গানটি নানা স্থানে প্রচারিত হয়েছিল।

সেই গানটি ঃ—''ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি।

বাংলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে) ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী ॥
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনী ॥''

* * *

রাণীমার দুর্গাপুজার সময় এক বিশেষ ঘটনায় তাঁর অসীম তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী রাজচন্দ্র দাসের পরলোক গমনের পর থেকে, রাণীমা আগের চাইতে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে বাড়িতে দুর্গাপুজো করাতেন এবং জানবাজারের বাড়ি থেকে গঙ্গায় বাবুঘাট অবধি তাঁদের তৈরী তৎকালীন বাবু-রোড দিয়ে নব পত্রিকা স্নান বা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য শোভাযাত্রা বার করতেন।

একবার দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠীর দিন সকালে অন্যান্য লোকজন সহ ব্রাহ্মণেরা যখন 'নবপত্রিকা' স্নান করাবার উদ্দেশ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বাবুরোড দিয়ে গঙ্গায় যাচ্ছিলেন, তখন বাবুরোডের ধারে একটি বাড়িতে একজন সাহেব নিদ্রিত ছিলেন। বাজনার আওয়াজে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি বাজনা থামাবার জন্য নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁর সেই নিষেধ অমান্য ক'রে রাণীমার লোকজন বাজনা বাজিয়েই 'নবপত্রিকা' গঙ্গায় নিয়ে যাওয়ায়, সাহেবের মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং তিনি এর প্রতিবিধানের জন্য পুলিশের কাছে দরখাস্ত করেন।

রাণীমার লোকেরা সাহেবের এই বাধাদানের কথা তাঁকে জানালে, রাণীমা এটিকে হিন্দুধর্মের বিধির ওপর হস্তক্ষেপ জ্ঞান ক'রে আরও বেশী ক'রে বাদ্য সহযোগে তার পরের দিনই অনুরূপভাবে পূজা সম্পর্কিত স্নানাদির কাজের জন্য কর্মচারীদের আদেশ দেন। এইভাবে তিনদিন মহা সমারোহে পূজা শেষ হওয়ার পর, রাসমণির বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেন। রাণীমা ৺রাজচন্দ্র দাসের কৃত গ্যারিসন অফিসারের মঞ্জুর করা দলিল, কর্মচারী মারফৎ আদালতে পাঠিয়ে ব'লে দিলেন— 'আমার খাসের রাস্তা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব। এতে সরকার বাধা দিলে, আমি যে ব্যয়ে রাস্তা করিয়েছি, তার দ্বিগুণ ব্যয়ে রাস্তা উচ্ছেদ করব।' তবুও সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে আদালত রাণী রাসমণিকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন।

রাণীমা জরিমানার ৫০ টাকা জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় গরাণ কাঠ দিয়ে জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট অবধি রাস্তার দু-ধার দৃঢ়ভাবে বেড়া দিয়ে ঘাটকে অন্য রাস্তার যাতায়াতের পথ বন্ধ ক'রে দিলেন। সরকারের তরফ থেকে রাস্তায় বেড়া খোলার জন্য রাণীমার কাছে কড়া আদেশ এল। তিনি ব'লে পাঠালেন—'আমার জায়গা ও আমাদের তৈরী রাস্তায় আমি বেড়া দিয়েছি, সুতরাং সরকারের বলার কিছুই নেই। তবে আমার রাস্তা যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, আমাকে উচিৎ মূল্য দিলে রাস্তা ছেড়ে দেব, নচেৎ নয়।'

এই কড়া জবাবে সরকার বড়ই বিব্রতে পড়েন। তাই এবার রাণীমাকে রাস্তা খোলার জন্য আদেশের বদলে অনুরোধ জানান এবং সেই সঙ্গে রাণীমার জরিমানার টাকাও অযাচিতভাবে ফেরৎ দেন। তেজস্বিনী রাসমণির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়ায়, তিনি বাবুঘাটের রাস্তা নিজের খাসে রেখেও অন্যদের ব্যবহারের জন্য বেড়া খুলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় রাণী রাসমণির নামে 'জয় জয়কার' পড়েছিল এবং সাধারণ লোকে তাঁর নামে এই ছড়াটি বেঁধে প্রচার করেছিল ঃ—

"অষ্টঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ কর্ত্তে পাল্লেনা কোম্পানী॥"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, শোভাযাত্রায় বাজনা-বাদ্য উপলক্ষ ক'রে রাণী রাসমণির সঙ্গে সরকারের এই ঝামেলা হওয়ার পর থেকে একটি নিয়ম চালু হয়

যে, কলকাতায় কোন শোভাযাত্রা বার করতে হ'লে, আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে জানাতে হবে। বলা আবশ্যক, কলকাতায় আজও সেই নিয়ম চালু আছে। ধর্মীয় ব্যবস্থা রক্ষায় রাণীমার এই বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় আমাদের গর্বের সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য।

* * *

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের পর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে এখানে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম করেন।

বৈদেশিক শাসন বিধ্বস্ত করার জন্য সিপাহী-বিদ্রোহের আকারে ভারতে প্রথম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ কলকাতার অনতিদূরে ব্যারাকপুরে (তখনকার নাম চানক) এই বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ ঘটে। সে সময় বন্দুকের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে পুরতে হোত। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে, টোটায় শূকর এবং গরুর চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদেরই দাঁত দিয়ে টোটা কাটায় আপত্তি ছিল ; কারণ, গোমাংস যেমন হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ, শূকর মাংসও তেমনি মুসলমানদের কাছে নিষিদ্ধ। সেজন্য উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরাই এই প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং পরে এটি বিদ্রোহের রূপ নেয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং বিহারের কিছু অঞ্চলে যেমন বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে ওঠে,—বঙ্গদেশেও তেমন বহরমপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্যারাকপুরে কোথাও-কোথাও সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী এইভাবে টোটা বন্দুকে পুরতে অস্বীকার করায়, তাঁকে এবং তাঁর সমর্থক ঈশ্বরী পাঁড়েকে ফাঁসী দেওয়া হয় ও তারপরেই বিদ্রোহের আগুন আরো ধু ধু ক'রে জ্বলতে থাকে। পরে অবশ্য কঠোর হস্তে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রথমাবস্থায় ইংরাজ সরকার খুবই বিপাকে পড়ে এবং তাদের কোম্পানীর রাজত্ব প্রায় টলটলায়মান অবস্থায় এসে পৌঁছায়। এই সময় ইংরাজ সরকারের স্থায়িত্বে সন্দিহান হয়ে অনেকেই কোম্পানীর কাগজ বিক্রী ক'রে দিতে থাকেন। রাণী রাসমণির কাছে তখন ইংরাজ সরকারের অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজ ছিল। ইংরাজ রাজত্বের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে—এই আশঙ্কায় রাণীর পরামর্শদাতৃরা তাঁকে কোম্পানীর কাগজগুলি বিক্রী ক'রে দেবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্না রাণী রাসমণির বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এই বিক্ষিপ্ত এবং ধর্মীয় বিভ্রান্তিকর বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ কোন মতেই ভারত ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে না। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ উপেক্ষা

ক'রে তিনি কোম্পানীর কাগজ বিক্রী করতে রাজী হননি এবং শূকর ও গরুর চর্বি সংক্রান্ত প্ররোচনামূলক ভ্রান্ত ধর্মোন্মাদনার সেই তাণ্ডবে কোন উৎসাহই প্রদর্শন করেননি, যদিও তিনি নিজে প্রকৃত ধর্ম পথের পথিক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পরে সিপাহীদের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের পরিবর্তন ঘটায়, রাণীমার বিশেষ দূরদর্শিতা এবং নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি প্রচণ্ড আস্থা ও সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

*   *   *

সিপাহী বিদ্রোহ মিটে গেলেও, পাছে আবার কোথাও বিদ্রোহের আগুন হঠাৎ জ্বলে ওঠে, সেই ভয়ে ইংরাজ সরকার দেশের স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন ক'রে গোরা সৈন্যদের মোতায়েন রেখেছিলেন। এমন একটি ঘাঁটি ছিল রাসমণি দেবীর বাড়ির কাছেই ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে। এইসব গোরা সৈন্য ছিল অশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ ও অবাধ্য। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০।২৫০ এবং তাদের ওপরে একজন অধিনায়ক (Officer Commanding) ছিলেন। সম্প্রতি এই সব গোরা সৈন্যদের কোন কাজ না থাকায়, তারা পানোন্মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথের ওপরেই লোকজনের ওপর নানারকম অত্যাচার করত এবং কখনো কখনো দোকান বা কারুর বাড়ির ভেতর ঢুকেও অবাধ লুটপাট করত।

এদের মধ্য থেকেই কয়েকজন একদিন সন্ধ্যায় পানোন্মত্ত অবস্থায় রাসমণি দেবীর প্রাসাদের সামনে রাস্তার ওপরে জনৈক পথিককে ধ'রে বল প্রয়োগ করতে থাকায়, রাসমণি দেবীর দারোয়ানেরা তাদের বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা রাসমণি দেবীর প্রাসাদে জোর ক'রে ঢোকার চেষ্টা করলে, দারোয়ানেরা তাদের প্রহার ক'রে তাড়িয়ে দেয় এবং এই প্রহারের ফলে একজন গোরাসৈন্যের মাথাও ফেটে যায়। এই ভাবে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে তারা প্রথমে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে এই সংবাদ দিলে, তখন প্রায় ৫০।৬০ জন উন্মত্ত গোরাসৈন্য দল বেঁধে খোলা তরবারি হাতে রাসমণি দেবীর প্রাসাদ আক্রমণ করে। এই সময় দারোয়ানেরা আবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, গোরা সৈন্যরা ২ জন দারোয়ানকে তরবারির আঘাতে হত্যা ক'রে প্রাসাদে ঢোকে এবং লুটপাট শুরু করে।

সে সময় প্রাসাদে রাসমণি দেবীর জামাতারা কেউই ছিলেন না ; নানা কাজে তখন তাঁরা বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। গোরা সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে এসেছে জানতে পেরেই রাসমণি দেবী বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের পাশের মান্নাবাবুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে উন্মুক্ত তরবারি ধারণ ক'রে অন্দর মহলে গৃহদেবতা রঘুনাথজীর মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ান। তাঁর ইচ্ছা, গোরারা তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ করলেও যেন তাঁর গৃহদেবতাকে স্পর্শ করতে না পারে।

দুর্বৃত্ত গোরা সৈন্যরা প্রাসাদের সদর ও অন্দর মহলে যা কিছু পেল, সবই নষ্ট করল; এমনকি, বাড়ির পোষা পাখীগুলোকেও কেটে টুকরো টুক্‌রো ক'রে ফেলল। প্রাসাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য গোবিন্দকে দেখতে পেয়ে তারা তার মেরু-দণ্ডে তরবারির কোপ মারায় সে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। উন্মত্ত গোরা সৈন্যরা এরপর রাসমণি দেবীর তরবারি হাতে ভৈরবী মূর্তি দেখেও, দলের মধ্যে কেউ কেউ মন্দিরের দিকে আগাবার চেষ্টা করলে রণরঙ্গিনী রাসমণি দেবীর তরবারির আঘাতে তারা সেখান থেকে পিছু হটে বাড়ির অন্যান্য জায়গায় লুটপাট শুরু ক'রেছিল।

সেদিন রাত প্রায় ১০টা অবধি এইভাবে তাণ্ডব চলাকালীন রাসমণি দেবীর জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস ইতিমধ্যে গাড়ী ক'রে বাড়িতে ফেরামাত্রই জনৈক দারোয়ান তাঁকে এই লোমহর্ষণ পৈশাচিক ঘটনার কথা বিবৃত করে। মথুরমোহনও তৎক্ষণাৎ স্থানীয় কলিঙ্গবাজারে গিয়ে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে গোরাদের ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের ঘাঁটিতে যান এবং তাদের অধিনায়ক (Officer Commanding) ও আরো কিছু সৈন্যকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে এসে হাজির হন। অধিনায়ক রাসমণি দেবীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে তূর্যধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত গোরা সৈন্যরা সংযতভাবে একে একে নেমে এসে অধিনায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর গোরা সৈন্যদের ভর্ৎসনা ক'রে এবং মথুরমোহনকে সান্ত্বনা দিয়ে অধিনায়ক সেই দুর্ধর্ষ গোরাসৈন্যদের নিয়ে ফিরে যান। ভবিষ্যতে আর যাতে এরকম উৎপাত না ঘটে, সেজন্য রাসমণি দেবী এই ঘটনার পর ২ বছর যাবৎ তাঁর বাড়ির প্রহরায় ১২ জন গোরাসৈন্যকে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং সেদিন তাঁর প্রাসাদে যে সকল ক্ষতি হয়েছিল, তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সরকারের কাছ থেকে আদায় ক'রেছিলেন।

অতগুলি মাতাল গোরাসৈন্যদের সামনে তরবারি হাতে একাকিনী রাসমণি দেবীর মন্দিরঘর রক্ষা ও গোরাদের প্রতিরোধ করা যে কতবড় তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয়, সম্ভবতঃ 'তা বোঝার অপেক্ষা রাখেনা। বিশ্বব্যাপিনী, বিশ্বরূপিনী মহাশক্তিস্বরূপা রাসমণি দেবী প্রকৃতপক্ষে সেদিন বিশ্বলোকের রণরঙ্গিনীরূপেই আবির্ভূতা হয়েছিলেন, যা আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। এই একটিমাত্র ঘটনার দৃষ্টান্তেই, রাসমণি দেবী তাঁর ভাস্বর বীর্য্য, সর্বজয়ী সংকল্প, প্রলয়ঙ্কর প্রতাপ ও অদম্য যোদ্ধৃভাবের মূর্ত প্রতীকরূপে আমাদের প্রেরণাদাত্রী।

* * *

তখনকার দিনে রেলপথ না থাকায়, মাঝে মাঝে রাসমণি দেবী জলপথে নৌকায় অথবা বজরায় তীর্থ দর্শনে বার হতেন। সেই সময় জলপথে ভ্রমণের সময় যেমন জল-ঝড়ে নৌকায় বিপদের সম্ভাবনা ছিল, তেমনি পথে দস্যুতস্করেরও ভয় ছিল।

একদা রাসমণি দেবী নবদ্বীপ থেকে অগ্রদ্বীপ হয়ে পাইক-বরকন্দাজসহ জলপথে নৌকায় বাড়ি ফেরার সময়, সন্ধ্যার কিছু আগে চন্দননগরের কাছে দস্যুদের কবলে পড়েন। চন্দননগরের কাছেই গৌরহাটির বাগান, তথা গরুটির জঙ্গলে এক নিভৃত স্থানে দস্যুদের আস্তানা ছিল। নৌকায় দানশীলা রাণী রাসমণি আছেন জেনেই তারা নৌকায় উঠেছিল এবং কোন প্রকার অত্যাচার না ক'রে কেবল নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাণীর কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায়ের মতলবেই তারা ভীতি প্রদর্শন করেছিল।

কিন্তু দস্যুরা নৌকায় ওঠামাত্রই রাসমণি দেবীর পাইক—বরকন্দাজেরা লাঠি—সড়কি দিয়ে দস্যুদের আক্রমণ করে এবং দস্যুরাও প্রতি-আক্রমণ করে। অবশেষে দস্যুদের তরফ থেকে রাসমণি দেবীর লোকেদের ওপর বন্দুকের গুলী চালালে, তাঁর লোকেরাও পাল্টা বন্দুকের গুলী চালিয়ে একজন দস্যুকে আহত করে। তখন দস্যুরা আক্রমণ বন্ধ ক'রে রাসমণি দেবীর উদ্দেশে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—'রাণী মা, আমরা মানুষ খুন করতে কাতর নই; কিন্তু সেজন্য আমরা আসিনি। আমরা কিছু পেলেই চলে যাব। আপনি দয়া ক'রে আমাদের কিছু দিন, তাহলে আমরা এখনি চলে যাচ্ছি।'

তেজস্বিনী রাসমণি দেবী দস্যুভয় উপেক্ষা ক'রে এবার নিজেই দস্যুদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা দলে ক'জন আছ?' দস্যুরা উত্তর দিল—'আমরা ১২ জন।' রাসমণি দেবী বলেন, 'ভাল, কিন্তু আমার কাছে এখন তো বেশী টাকা নেই। তোমরা যদি কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো, তবে আমি তোমাদের ১২ জনের জন্য ১২ হাজার টাকা এমনি সময়ে এইখানেই পাঠিয়ে দেব। আর আমার কথায় যদি অবিশ্বাস করো, তা হলে এখনি আমার গলার সোনার হার, আর সঙ্গে যে সব রূপোর জিনিস আছে সেগুলো নিতে পারো।'

রাসমণি দেবীর এই নির্ভীক উক্তিতে দস্যুরা তাঁর কথায় বিশ্বাস রেখে নৌকা ছেড়ে দেয় এবং পরদিন ঠিক এই সময়ে তারা রাসমণি দেবীর প্রতিশ্রুত টাকা নিতে আসবে ব'লে স্বীকারও করে। রাসমণি দেবীকে তারা এমনই বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি পরদিন তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারেন—এ আশঙ্কাও তাদের মনে আসেনি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসমণি দেবী ঐ ১২ জন দস্যুর জন্য ১২টি পৃথক তোড়ায় ১২ হাজার টাকা নৌকাযোগে দারোয়ান মারফৎ পরের দিন যথা সময়ে ঐ স্থানেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং দস্যুরাও তা গ্রহণ ক'রেছিল।

সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বিনী রাসমণি দেবীর এই অনন্ত সততার অভিব্যক্তি—জাগতিক সংসারে খুবই বিরল।

* * *

স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পাশ হলেও, বহু বিবাহরোধ আন্দোলন তখনও

চলছিল। সেদিনকার কুলীনেরা বহু বিবাহ প্রথার পক্ষপাতী হওয়াতে, তাঁদের বিরুদ্ধেও যখন আন্দোলন শুরু হয়, রাসমণি দেবী তখন সেই আন্দোলনের পক্ষে নিজেকে জড়িত করেন এবং তৎকালীন ব্যবস্থাপক সমাজে এই বহু বিবাহ-রোধের জন্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে একখানি লিখিত আবেদন পত্রও পেশ করেন।

নিজ কর্তব্যে অবিচল, তেজস্বিনী নারীর কুলীনদের বিরুদ্ধে নারীমুক্তির জন্য এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ তাঁর চারিত্রিক নির্ভীকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

* * *

তখনকার দিনে বিবাহের সময় স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বেশ তফাৎ রেখেই বিবাহ দেওয়ার প্রথা ছিল। রাসমণি দেবী যখন তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা পদ্মমণির বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন দেখা যায় যে, ভাবী জামাতা রামচন্দ্র দাসের চাইতে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বয়সে মাত্র দুদিনের ছোট। রামচন্দ্রের জন্ম তারিখ—১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর এবং পদ্মমণির জন্ম তারিখ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর। কিন্তু যেহেতু রামচন্দ্র দাস মাহিষ্য শ্রেণীর সম্ভ্রান্তবংশের কুলীন ছিলেন, সেজন্য তখনকার সমস্ত সামাজিক প্রথাকে দূরে সরিয়ে, বয়সে মাত্র ২ দিনের ছোট-বড় হওয়া সত্ত্বেও, বংশ মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাসমণি দেবী সেদিন রামচন্দ্র দাসের সঙ্গেই তাঁর কন্যা পদ্মমণির বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই সময় গোঁড়া হিন্দু পরিবারে এই দুঃসাহসিক কাজে রাসমণি দেবীর নেতৃত্ব একটি সামাজিক বিপ্লবের সামিল। এই সামাজিক কাজে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত—এখানে আর কারুর মতামতকে তিনি আমল দেননি। সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাঁর যথাযথ সিদ্ধান্ত সেদিন তাঁর মাতৃত্বের পরমাশক্তির বিশুদ্ধ যন্ত্ররূপেই কাজ করেছিল,—যা আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে!

* * *

দানশীলা রাণী রাসমণির নাম শুনে, একদা এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ রাসমণি দেবীর কাছে অর্থ ভিক্ষার জন্য এসেছিলেন। ব্রাহ্মণের দুটি কন্যা—দুজনেই বয়স্থা, কিন্তু অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ তাদের বিবাহ দিতে অক্ষম ছিলেন। করুণাময়ী রাসমণি দেবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সব কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর দুটী কন্যার বিবাহে মোট কত খরচ হবে। ব্রাহ্মণ বলেন যে, কমপক্ষে ১ হাজার টাকা লাগতে পারে। রাসমণি দেবী তাঁর কথায় সম্মত হন এবং আশ্বাস দিয়ে বলেন,—'আমি লোক দিচ্ছি ও টাকাও দিচ্ছি—তাদের সঙ্গে নিয়ে আপনার দুই কন্যার বিবাহ সমাধা করুন।'

ব্রাহ্মণ ১ হাজার টাকার কথা বললেও, রাসমণি দেবী তাঁর একজন বিশ্বস্ত সরকারকে ১৫০০ টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু, দুটি কন্যার বিবাহ দিতে সেদিন ব্রাহ্মণের প্রকৃতপক্ষে প্রায় ২২০০ টাকা খরচ হয়েছিল। বিবাহের পর, রাসমণি দেবীর সরকার মশাই ৩।৪ শত টাকা ফেরৎ নিয়ে এসে রাসমণি দেবীকে সমস্ত বিষয়টি জানালে, তিনি তাঁর সরকারের ওপর অত্যন্ত

অসন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা সমস্তই এবং আরও কিছু টাকা ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর আন্তরিক দানশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখান।

ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। এই ঘটনার বহু বছর বাদে, ঐ ব্রাহ্মণবংশের একটি বালক ছাত্রাবস্থায় রাসমণি দেবীর বাড়িতে বাস ক'রেই শিক্ষিত ও উপার্জনশীল হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি রাসমণি দেবীর বংশধরদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রে রাণীমার প্রতি তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ ক'রে যেতেন।

এরকম একজন মাত্র নয়—অনেকেই রাণীমার অন্নে পালিত হয়েছেন,—অনেকেরই আহার, বিদ্যালয়ের বেতন, পাঠ্যপুস্তকের দাম, বস্ত্রাদি প্রভৃতি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন।

তাঁর বাড়িতে সব সময়েই দরিদ্র, ভিখারীদের ভীড় লেগেই থাকতো। রাসমণি দেবী প্রতিদিন নিয়মিত এই সব দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাতেন এবং তাঁদের আহারের পর তিনি নিজে আহার করতেন। এই ভাবেই এই পুণ্যশীলা মহিলা প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছে 'রাণীমা' এবং 'গরীবের বন্ধু' রূপেই তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর নারীচরিত্র আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেখে গিয়েছেন।

* * * *

স্বামী রাজচন্দ্র দাস যে কটি শুভ ও জনহিতকর কাজ ক'রে গিয়েছিলেন, তার প্রতিটির প্রেরণাদাত্রী ছিলেন এই স্বামীসোহাগিনী রাণী রাসমণি। রাজচন্দ্র দাসের জনহিতকর কাজের বিবরণ ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীর দেহত্যাগের পরেও সেই জনহিতকর কাজের ধারা রাসমণি দেবী নিজেই বজায় রেখেছিলেন, এ সম্পর্কে ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবদ্বিজে ভক্তি, উৎসবাদি, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা ছাড়াও, রাসমণি দেবীর নিজস্ব জনকল্যাণমূলক কাজ ও দানশীলতার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ—সুবর্ণনদীর পরপার থেকে বহু অর্থব্যয়ে যাত্রীদের সুবিধার জন্য পুরী অবধি যাওয়ার প্রশস্ত রাস্তা ; জন্মস্থান কোনা গ্রামে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্নানঘাট নির্মাণ ; আদি পিত্রালয় গোলাবাড়ি গ্রামে স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গায় ঘাট ও বিশ্রামগৃহ নির্মাণ ; হুগলীর ঘোলঘাটের পাশে বহু অর্থব্যয়ে স্নানার্থীদের জন্য ঘাট নির্মাণ; নিমতলা মহাশ্মশানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে প্রাসাদতুল্য ঘাট নির্মাণ ; কালীঘাটের আদিগঙ্গায় স্নানার্থীদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে স্নানঘাট নির্মাণ ; বাবুগঞ্জের কাছে তাঁরই অর্থসাহায্যে স্নানার্থীদের জন্য গঙ্গাঘাট নির্মাণ ; জনগণের কল্যাণকল্পে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'টোনার খাল' খনন করিয়ে মধুমতী নদীর সঙ্গে নব গঙ্গার সংযোগ সাধন ; সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও

ভবানীপুরে জনসাধারণের জন্য বাজার স্থাপন ; ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠানে এক হাজার টাকা দান ; জানবাজার থেকে মৌলালীর দর্গা অবধি জল প্রণালীর কাজে ২৫০০ টাকা দান ; দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গৃহস্থ, সাধু, সন্ন্যাসী ছাড়াও প্রতিদিন অসংখ্য কাঙাল-ফকির প্রভৃতি দরিদ্রদের অন্নদানের ব্যবস্থা ; প্রতিটি উৎসবে ও যাগযজ্ঞে জনসাধারণের জন্য দানসত্র ; বহুগ্রামে পথ সংস্কার, ঘাট-নির্মাণ, পুস্করিনী খনন, দেবমন্দির স্থাপন, দুর্গতদের সাহায্য প্রভৃতি ছিল তাঁর কর্মযোগের অংশ।

রাণী রাসমণির অপর্যাপ্ত দান, অশেষ জনহিতকর কার্যানুষ্ঠান, তেজস্বিতা, অলৌকিক সাহস, কর্মদক্ষতা, ঔদার্য, বিচক্ষণতা, মনস্বিতা ও বীর্যবত্তায় সমৃদ্ধ তাঁর বৈচিত্রবহুল জীবনের রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনাগুলি আজও আমাদের জাতীয় জীবনে সৎশিক্ষার প্রেরণা দেয়। দেশকে কি ভাবে ভালবাসতে হয়, জাতিকে কি ভাবে ভালবাসতে হয়, কর্তব্য কর্ম কি ভাবে পালন করতে হয়—সে বিষয়ে রাণী রাসমণির জীবন একটি উজ্জল ও বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিশেষ উক্তির কথা মনে পড়ে—"চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।" সত্যই, রাণী রাসমণি বর্তমান যুগের আবহাওয়ার মত, চালাকীর দ্বারা বড় হননি—জনগণের সেবায় নিজেকে আন্তরিকভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন ব'লেই আজ তিনি স্বীয় মহিমায় 'রাণী রাসমণি' এবং তাঁর পুণ্যের ফলেই এই হতভাগ্য জীবের মধ্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব'—এই সত্যটি স্বীকার করাই উচিত।

॥ ১৯ ॥

তিরোভাব

এবার বিদায় নেবার পালা ! সততা, বিচক্ষণতা, মমতা, উদারতা, দানশীলতা তেজস্বিতা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ম ধারণ ক'রে প্রকৃত 'রাণী' রূপে সারাজীবন সংগ্রামের পর, এবার রাণী রাসমণি সত্যই ক্লান্ত, শ্রান্ত ! মা-জগদম্বার অষ্ট সখীর অন্যতমা রাণীমা, মা-জগদম্বাকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-নামী সচল বিগ্রহরূপে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে প্রতিষ্ঠা ক'রে, এবার ফিরে যাবেন স্বস্থানে ! এবার এই লৌকিক রাজ্যের রাণী চলেছেন দিব্যরাজ্যের অভিসারে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে। জীবাত্মারূপে এতদিন ভগবানকে তিনি বলেছেন—'তুমি আমার' ; এবার তাঁর আকুতি—'আমি তোমার' ! এই 'আমি ও তুমি'—অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই মহামিলন ; রাণীমা সংসারের সকল মিলন অতিক্রম ক'রে আজ চলেছেন

সেই মহামিলনের রাসোৎসবে—প্রকৃত 'রাসমণি' রূপে! যুগদেবী স্বরূপিনী রাণীমার এবার মর্তলীলার অবসান—সকল প্রকার অগ্নিপরীক্ষার পর জীবনে চরম বিজয়—পরম রূপান্তর!

তাই, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১২৬৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন) মহাযোগিনী রাণীমার জীবন যেমন শাশ্বত মহাযোগের দিব্যানন্দে সমাধিস্থ, দেশের পক্ষে তেমন ঐ দিনটি নিরানন্দের স্রোতে স্নাত এক মর্মান্তিক তমিস্রা!

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের পক্ষে শ্রীগোপীনাথ দাস প্রকাশিত (জুন-১৯৫৩) ও শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় রচিত 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থে রাণীমার শেষ জীবন ও তিরোভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—

"দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাণী বিশেষভাবে ধর্ম-কর্ম ও পূজা-অর্চনা নিয়েই দিন কাটাতেন। এখন থেকে জমিদারী দেখাশুনার ভার জামাতাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জানবাজারের বাড়িতে খুব কম সময়েই থাকতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি কখনো-বা একা, কখনো-বা সপরিবারে এসে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরেই কাটাতেন।"

"রামকৃষ্ণদেব রাণীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পূজারী হলেও, রাণী রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে অসাধারণ ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকটে ব'সে ধর্মকথা শুনতেন। অনেক সময় আবার রামকৃষ্ণদেবের মুখে ভজন এবং অন্যান্য ধর্মসঙ্গীতও শুনতেন।"

"রামকৃষ্ণদেব রাণীকে 'রাণীমা' বলতেন। তিনি রাণীর কথামত তাঁকে ধর্মকথা ও ধর্মসঙ্গীত শোনাতেন। রামকৃষ্ণদেব রাণীকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাব ছাড়াও রাণীর মধ্যে অপরিসীম ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রাণীর মধ্যে এইরূপ ধর্মভাব দেখে তিনি বলতেন—রাণীমা দেবীর অষ্টসখীর একজন।"

"এইভাবে একান্ত ধর্ম-সাধনার মধ্য দিয়েই রাণীর শেষ জীবন অতিবাহিত হ'তে লাগল। এমন সময় রাণী একবার উদরাময় রোগে আক্রান্ত হলেন। ক্রমে তাঁর এই রোগ জটিল ও গুরুতর আকারে দেখা দিল।"

"ডাক্তারেরা রাণীকে বায়ু পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। রাণী কিন্তু দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইলেন না। শেষে ডাক্তারদের অনেক অনুরোধে রাণী যদিও দক্ষিণেশ্বর ছাড়লেন, কিন্তু তিনি এক কালীবাড়ি থেকে গিয়ে আর এক বিখ্যাত কালীবাড়ির ধারেই আশ্রয় নিলেন। এই কালীবাড়ি হ'ল কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাটের কালীবাড়ি। কালীমন্দিরের পাশেই রাণী একটি বাগানবাড়ি কিনেছিলেন।"

"এখানে এসেও রাণীর অসুখ সারল না। ক্রমে দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। এই সময় রাণী তাঁর মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ব্যয় নির্বাহের জন্য দিনাজপুর জেলায় তিনি যে জমিদারী

কিনেছিলেন, সেই সম্পত্তি দানপত্র ক'রে দেবোত্তরে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী দেবোত্তর দানপত্রে সই করলেন। এই কাজ শেষ হ'লে, পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রে রাণী তাঁর কালীঘাটের বাগান বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।"

রাণীমার তিরোভাবের অপর বিবরণ জানা যায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা রচিত 'রাণী রাসমণি' গ্রন্থ থেকে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—

"কি হয়, কি হয়, একটা দুর্ভাবনা সকলেরই মনে উদয় হইতে লাগিল। শেষে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়, কালীমাতার অর্ঘ্য, গুরু-পুরোহিত সকলের পদধূলি শিরে লইয়া ও আর আর সকলকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি রাজচন্দ্রবাবুর সহিত পরলোকে মিলিত হইলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল, সে কথা বলা বাহুল্য। 'ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম্'—পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইল। তিন জামাতা, তিন কন্যা, ১৫/১৬ জন দৌহিত্র-দৌহিত্রী, দাসদাসী, দ্বারবান, কর্মচারী সকলকে কাঁদাইয়া রাণী পৃথিবী হইতে চির অবসর লইলেন। রাণীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে 'কেওড়াতলার' ঘাটে শবদাহ জন্য চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল। লোকজন সকলেই রাণীর শবদেহ বহুমূল্য চীনাংশুক ও কৌষেয় বস্ত্র আবৃত করিয়া রৌপ্য-তাম্র-মুদ্রাসহ লাজাঞ্জলি পথে বিতরণ করিতে করিতে লইয়া গিয়া চিতায় সমর্পণ করিলেন। সর্বভূক ধু ধু শব্দে স্বল্পকাল মধ্যেই রাণীর দেহ গ্রাস করিল।"

"বাঙালী রমনীকুলের মণি, আদর্শনীয়া পুণ্যবতী রাণী রাসমণি জীবন-সংগ্রামে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে জীবনের বিন্দু বিন্দু ব্যয় করিয়া অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিলেন! কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনের সেবা ও সমাদরে জীবনের শেষ মুহূর্তেও সজ্ঞানে সকলের অশ্রুধারা সিক্ত হইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।"

* * *

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণীর অন্তিমকালে দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ের ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রচিত দলিলের অঙ্গীকার পত্রে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দেবার জন্য রাণী তাঁর তৎকালীন জীবিতা দুই কন্যা—শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বাকে নির্দেশ করেন ; কিন্তু মাতার নির্দেশ সত্ত্বেও শ্রীমতী পদ্মমণি তাতে সই করেন নি, যদিও শ্রীমতী জগদম্বা যথারীতি সই ক'রেছিলেন। ফলে, মৃত্যুর মুহূর্তে রাণীকে যখন গঙ্গাগর্ভে আনা হয় এবং সামনে অনেকগুলি আলো জেবলে দেওয়া হয়, তখন রাণী সহসা ব'লে ওঠেন—'সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোশনাই আর ভাল লাগছে না ; এখন আমার মা আসছেন! তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!' কিছুক্ষণ পরে, 'মা এলে!

পদ্ম যে সই দিলে না—কি হবে, মা !'…কথাগুলি ব'লেই পুণ্যবতী রাণী শান্ত-ভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন, ইত্যাদি।

উল্লিখিত ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী পদ্মমণির প্রবীণ আইনজ্ঞ প্রপৌত্র, শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয় বলেন যে, ঐ ঘটনাটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণগুলি এইরূপ :—

প্রথমতঃ, কালীঘাটের বাগানবাড়িতেই রাণীর দেহত্যাগ হয়েছিল এবং লোকজন সকলেই রাণীর নশ্বর দেহ বহন ক'রে, পথে রৌপ্য-তাম্র-মুদ্রাসহ লাজাঞ্জলি বিতরণ করতে করতে কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ ক'রে-ছিলেন। সুতরাং, মৃত্যুর মুহূর্তে গঙ্গাগর্ভে তাঁকে আনা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, দানপত্রে বা অর্পণনামায় কন্যাদের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু দায়ভাগ আইনানুসারে সম্পত্তির ওপর কন্যাদের পূর্ণাধিকার (**Absolute Right**) ছিল না।

তৃতীয়তঃ, শ্রীমতী পদ্মমণি সই না দিলেও শ্রীমতী জগদম্বা সই দিয়েছিলেন, এটিও একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, দানপত্রে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী জগদম্বার কোন সই নেই, বা সেখানে পৃথক কোন অঙ্গীকার পত্রেরও উল্লেখ নেই।

চতুর্থতঃ, রাণী রাসমণির মত মহাসাধিকার পক্ষে মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ ক'রে, বৈষয়িক ব্যাপারে নিজের গর্ভজাতা কন্যার বিরুদ্ধে ইষ্টদেবীর কাছে অভিযোগ—একেবারেই অকল্পনীয়। কারণ, জগন্মাতার দিব্যদর্শন লাভের পর, আর বিষয়ের চিন্তা মনে আসে না, বিশেষতঃ অন্তিমকালে কোন মহাসাধিকার অন্তরে। এই বিকৃত ঘটনার দ্বারা শ্রীমতী পদ্মমণিকে অবজ্ঞা করার বদলে বরং রাণী রাসমণিকেই বিশেষভাবে হেয় করা হয়েছে। সম্ভবতঃ শ্রীমতী পদ্মমণির বিরুদ্ধবাদী কোন শরিকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবরণ সরবরাহের দরুনই পরবর্তীকালে—শ্রীমতী পদ্মমণির মৃত্যুর বহুকাল পরে, কোন কোন গ্রন্থে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা পরিবেশিত হয়েছে এবং এটির সত্যতা সম্পর্কে শ্রীমতী পদ্মমণির বংশধরদের সঙ্গে কেউই যোগাযোগ করেননি। অবশ্য এই বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রতিবাদ না করাটাও তাঁদের ত্রুটী ব'লে শ্রীদাস মহাশয় স্বীকার করেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয়ের উক্ত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখকের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * *

রাণীমার তিরোভাব প্রসঙ্গ শেষ করব—'লোকমাতা রাণী রাসমণি'—গ্রন্থের রচয়িতা, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি-ভারতী-ভাগিরথী মহোদয়ের ভাষা দিয়ে :—"দক্ষিণেশ্বর নিত্য তীর্থ, ব্যক্ত তীর্থ, শুধু ভারতের নয়, জগতের মহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। লোকমাতা শ্রীশ্রীরাণী রাসমণি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

আবির্ভাব যুগান্তকারী ব্যাপার। রাণীমা যুগদেবীস্বরূপে ও ঠাকুর যুগাবতার-স্বরূপে আসিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উভয়েই তাঁহাদের দিব্যলীলার মাধুর্য্য প্রকট করিলেন। বস্তুতঃ লোকমাতা শ্রীশ্রীরাণী রাসমণিই এ ক্ষেত্রে মূল-শক্তি স্বরূপে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের আকর্ষণই ইহার মূলে রহিয়াছে, স্নেহ-প্রণোদিত তাঁহারই বাৎসল্যরসের বৈচিত্র্য এবং বিলাসই এই লীলায় বিভূতি, বৈভব বা ভাব। প্রকৃতপক্ষে, রাণী রাসমণির কৃপায় আমরা ঠাকুরকে পাইয়াছি, পাইয়াছি বিবেকানন্দকে এবং সনাতন ধর্মরক্ষায় বিশ্বজননীর দিব্যলীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে।"

"রাণীমা গৃহস্থালীতে লক্ষ্মী স্বরূপিনী, দীন-দরিদ্রের সেবায় অন্নপূর্ণা-স্বরূপিনী, শরণাগতদের পক্ষে জননী স্বরূপিনী, পতিপ্রাণাদের মধ্যে সাবিত্রী সমতুল্যা, দৈত্যদলনে রণরঙ্গিনী চণ্ডী, ধর্মের জগতে তিনি সর্বধর্মের সমন্বয়-বিধায়িনী এবং সকলের পক্ষে তিনি ছিলেন জননী। কিন্তু তিনি কি গিয়াছেন? তিনি আছেন, আমাদের ছাড়িয়া যান নাই—এই কথাই বলিব।"

"ঠাকুর বলিতেন, রাণীমা বিশ্বজননী জগদম্বা। ধরাধামে তাঁহার লীলা বিস্তার করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে—

'এ সব লীলার নাহি হয় পরিচ্ছেদ,
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।'

দক্ষিণেশ্বরের তীর্থ যেমন থাকিবে—থাকিবে চিরকাল। শ্রীশ্রীরাণী রাসমণিও সেই সঙ্গে আমাদের স্মৃতিতে নিত্য মহিমায় উদ্দীপিতা থাকিবেন এবং লোকমাতা স্বরূপে সর্বকালে আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন। প্রণাম, তাঁহাকে শতকোটী প্রণাম—

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ' ॥"

(বঙ্গানুবাদ ঃ—হে দেবি, জগতে সমস্ত বিদ্যা যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, সমস্ত নারীরাও সেরকম ভিন্ন হয়। তুমি একাই এই সমস্তের সমন্বয় সাধন করেছ। সুতরাং, তোমার আর প্রশংসার কি আছে, তুমি সমস্ত প্রশংসার ঊর্ধে। শ্রীশ্রীচণ্ডী)—লেখক।

॥ ২০ ॥

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের দানপত্র দলিলের নকল

(রাণী রাসমণির অন্যতম এবং প্রবীণতম বংশধর শ্রীআশুতোষ দাস, বি. এল. মহোদয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। মূল দলিলে তৎকালীন বানানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অশুদ্ধ হলেও, হুবহু বজায় রাখা হয়েছে। দলিল সংশ্লিষ্ঠ বহু পৃষ্ঠার তপশিল বা সিডিউলগুলি অনাবশ্যক বোধে এখানে প্রকাশ করা হল না। রাসমণি দেবীর স্বাক্ষরে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর স্বাক্ষরে 'স'-য়ের স্হলে 'ষ' লিখতেন।

রাণী রাসমণির মৃত্যু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। ঠিক তার আগের দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রাণী রাসমণি এই দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন।

ঐতিহাসিক কারণে, এই মূল দলিলটি বিশেষ মূল্যবান।)

লিখিত শ্রীরাষমণী দাষী ৺রাজচন্দ্র রায়ের বণিতা নিবাস জানবাজার সহর কলিকাতা কস্য দেবত্র ও সেবাএত নিয়োগ পত্র মিদং সন ১২৬৭ বারোসত সাতসট্টি সানাব্দে লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে স্বামী মহাশয় সন ১২৪৩ সালের ২৭শে জৈষ্টী তারিখে অপুত্রক বিনা উইলে পরলোকগমন করায় আমি শাস্ত্রানুযায়ি তাঁহার তাজ্য জমিদারি ও কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদী স্হাবরাস্হাবর তাবত বিষয়াদির স্বত্যাধিকারিণী ও দখলীকার হইয়া ক্রমশ বিশয়াদী খরিদ করিয়া ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদী নির্ব্বাহ করিয়া আশীতেছি পরন্তু আমার চারি কন্যা জেষ্টা শ্রীমতি পদ্মমণি তাঁহার স্বামী শ্রীমান রামচন্দ্র দাষ তাহার তিন পুত্র জেষ্ট শ্রীমান গণেশচন্দ্র দাষ মধ্যোম শ্রীমান বলরাম দাষ ত্রিতিয় শ্রীমান সতীনাথ দাষ নাবালগ মধ্যোমা কন্যা ৺কুমারি দাশী তাহার স্বামি শ্রীমান প্যারিমোহন চৌধুরী তস্য পুত্র শ্রীমান জদুনাথ চৌধুরী ত্রিতিয়া কন্যা ৺করুণামযী দাশী তস্য স্যামি শ্রীমান মথুরামোহন বিশ্বাস তস্য পুত্র শ্রীমান ভূপালচন্দ্র বিশ্বাস চত্তুর্থ কন্যা শ্রীমতি জগদম্বা দাষী স্বাযী উক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস তস্য জেষ্ট পুত্র শ্রীমান দ্বারকানাথ বিশ্বাস মধ্যোম শ্রীমান ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ত্রিতিয় শ্রীমান ঠাকুরদাষ বিশ্বাস এবং উপরোক্ত বত্তমানা দুই কন্যার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাতে স্বামি মহাশয়ের বত্তমানাবস্হায় এক দেবালয় প্রস্তুত পুর্ব্বক দেবসেবা করণের মানষ থাকায় হঠাৎ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ও তাহাতে তাঁহার মানষ সম্পূর্ণ না হওয়ায় আমি তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎ সম্পাদনার্থে পরগণে কলিকাতার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সাহেবান বাগীচার মধ্যে ৺গঙ্গার পুর্ব্ব কাশীনাথ রায় চৌধুরী

দিগরের জমি পশ্চিম গভর্ণমেন্ট মেগাজিন অর্থাৎ সরকারি বারুদখানার দক্ষিণ যে জেমষ হেন্টী সাহেবের কুটী বাটীর উত্তর এই চৌহদ্দীর মধ্যে রাবট হেন্টী সাহেবের দরুন ৫৪।। সাড়ে চৌবাণর্দ বিঘা খেরাজি ভূমি বাতসরিক সদর জমা কোম্পানি ১৫৪্ এক সত চৌবার্ণদ জেলা চব্বিষ পরগণার কালেকট্রীর সেরেস্তায় ১০ দষ নম্বরে লেখাজায় ঐ ভূমি মুজকুরা আমি ৪২৫০০্ বেয়াল্লিশ হাজার পাঁচ সত্ত টাকা পণে সন ১৮৫৭ সালের ৬ সেতম্বর তারিখে যে জান হেন্টী সাহেবের একজিকিউটর যে জেমষ হেন্টী সাহেবের নিকট বিল আকসেনের দ্বারায় খরিদ করিয়া তাহাতে পোক্তা নবরত্ন ও দ্বাদশ মন্দির ও বিষ্ণুর আলয় ও নাট মন্দির ও ভোগের ঘর ও ৺গঙ্গাতীরে বান্দা ঘাট ও চাঁদনী ও পোস্থা ও ৺ঠাকুর ঠাকুরাণির দিগের আসবাব রাখিবার গুদামঘর ইত্যাদী প্রস্তুত পুর্ব্বক সন ১২৬২ সালের ১৮ জেষ্ট তারিখে দ্বাদশ মন্দিরে দ্বাদশ শিব ও বিষ্ণুমণ্ডপে শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণজি ও নবরত্নে শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরি কালী ঠাকুরাণী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রভৃতি ৺স্বামি মহাশয়ের মনোভিষ্ট সির্দ্ধ ও পারলৌকিক উপকারার্থে স্থাপীত পুর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া (১) তাঁহার দিগের রুপার চৌকী ও পদ্যাসন ও কোসাকুশী ও পুষ্পপত্রে ও কুণ্ড ও চন্দনের বাটী ও চুমকী ফেরুসা ইত্যাদী ও স্বর্ণ ও মুক্তার জড়াও গহনা বিঃ আলাইদা ফর্দ্দ ও পিতল কাঁসার বাসন দ্রব্যাদী এবং খাট সয্যাদি ও বেলওারি ঝাড় ও লণ্ঠন ও দেয়ালগীরি ও গালিচা ও সতরঞ্চী বহুতর আসবাব ও নত্তাজিমা তৈয়ার ও খরিদ ও নিত্য সেবা ও পরবাদীর খরচের বন্দেজ ও পুজক ব্রাহ্মণ ও দারাণ ও খাজাঞ্চি ও চৌকী পাহারার নক্তকরান ও ফরাষ ও বাগানের মালি প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া প্রসশীয় দেবদেবির সেবা ও পরবাদী আমি বত্তমান ও অবত্তমানে স্থিবওর থাকার অভিলাশে জেলা দিনাজপুরের মোতানক পরগণে সানবাড়ির ৭৩নং লাট কোঙরপুর জাহার সদর জমা ৭২১১৵১৯৶০ টাকা ও ৭৪নং লাট কানসেখা সদর জমা ৭৫৮১।।১৹ টাকা ও ৭৫নং লাট রসেষা সদর জমা ৮১৫৯।৬।।০ টাকা একুনে তিন লাটে ২২৯৫১৶৵৭।।০ টাকা সদর জমার জমিদারি জাহা ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরের নিকট আমি বিল আকসেনের দ্বারায় ইঙ্গরাজি ১৮৫৫ সালের ২৯ আগষ্ট বাঙ্গালা সন ১২৬২ সালের ১৪ ভাদ্র তারিখে কোম্পানির ২২৬০০০ দুই লক্ষ ছাব্বিষ হাজার টাকা পনে খরিদ করিয়া সদর রাজস্ব আদায় পুর্ব্বক তাহাতে দখলিকার আছি এইক্ষণে আমার সরিরের ভদ্রাভদ্রের অনিশ্চায় ও আগামি কালে ঐ দেবতাগণের নিয়মিত সেবাদী চিরস্থায়ি হওন মানশে উক্ত তিন লাট জমিদারি প্রসশীয় শ্রীশ্রী৺জগদিশ্বরি কালী ঠাকুরাণি প্রভৃতিকে এই নিয়ম ও প্রতিজ্ঞায় দান করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিতেছি জে জেলা দিনাজপুরের কালেকট্যারি সেরেস্তায় প্রসশীয় শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরি কালী ঠাকুরাণী প্রভৃতির জমুক্ত নাম পত্তন ও আমার নাম সেবাএত লিখিত হইয়া নিরপীত সদর রাজস্ব ও আদায় তৎশীলের আখরাজাত সোদকদে মনফার দ্বারায় উপরোক্ত দেবতাগণের

ও অতিথি সেবা ও পরবাদী তাবত কর্ম্ম হইবেক উক্ত তিন লাট ও তাহার উপস্বত্তদীতে উত্রাদীকারি গণের স্বত্ব্যাধীকার থাকিবেক না পরন্তু আমি এই নিয়ম করিতেছি জে আমি অবর্ত্তমানে আমার উপরোক্ত বর্তমানা দুই কন্যা ও দৌহত্রগণ ও জে দৌহত্র জন্মিবেক তাহারা আমার নিয়মানুসারে ঐ কন্যা ও দৌহত্রগণের উত্তরাধিকারিরা পুরুসানুক্রমে সেবাএত নিজুক্ত হইয়া আমার বন্দেজী সেবাদী বির্সাজন আমার মোহর দস্তখতে আলাইদা ফর্দ্দ তাবত কর্ম্ম করিবেন অপিচ প্রসশীয় দেবতাগণের ও নিত্য সেবা ও পরবাদীর ব্যাঘাৎ হওনেয় আসঙ্কায় ঐ তিন নাট জমিদারি ও দেবালয় বাটী ও বাগান মায় বৈঠকখানা ও পুষ্করণী সমেত ফুল বাগিচা ৫৪।। বিঘা জমি স্বামি মহাশয়ের সর্গার্থে প্রসশীয় শ্রীশ্রী৺জগদীস্বরি কালী ঠাকুরানী প্রভৃতিকে এই নিয়ম ও প্রতিজ্ঞায় দেবত্ত দিলাম জে তাহাতে উত্রাধিকারি দিগের স্বত্ত থাকিবেক না উপরোক্ত জমিদারির উপস্বত্বের দ্বারায় সন ২ দেব সেবা ও পরবাদী ও বিধানমত অতিথি সেবা ও নওকারনের মহিষানা ইত্যাদী খরচ বাদে জে টাকা উদবত্ত হইবেক তাহা প্রসশীয় ঠাকুর ঠাকুরাণীর তহবিলে জমা হইয়া জাহাতে প্রসশীয় ঠাকুর ঠাকুরাণীরদিগের ইষ্টে উর্বির্দ্দি হয় তাহা সেবাএতেরা করিবেন ৺ন্যা করেন জদি কোন সন ফসল অজন্মা অথবা কোন কারণবশত কম মুনফা হয় তবে ঐ (২) খরচ উদবর্ত্ত মজুদ টাকা হইতে নিয়মিত দেবসেবাদী ও জমিদারি রক্ষ্যার তাবত কর্ম্ম চলিবেক কেহ আমার উপরোক্ত অবধারিত নিয়ম অতিক্রম করিতে পারিবেন না উপরোক্ত তিন লাট জমিদারি ও দেবালয় বাটী মায় এমরতাদী ও আসবাব নত্তাশিমা ও ঠাকুর ঠাকুরাণিদিগের গহনাদী তাঁহারদিগের নিজস্ব হইল তাহাতে আমার কিম্বা পতি মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের কোন রূপে স্বত্ব থাকিল না ও তাহা ব্যবহার ও ব্যায় করিতে কোন বেক্তির অধিকার নাই এবং আমার ও পতি মহাশয়ের উত্তরাধিকারি দীগের কাহারো কোন দায়ে ক্রোক বিক্রয়াদি হইতে পারিবেক না উত্তরাধিকারিগণ কেহ কোন রকমে তাহা বিক্রয় বা হেবা ইত্যাদী কোন রূপে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ও নিজেও লইতে পারিবেন না জদি হস্তান্তর করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক আমি অবর্ত্তমানে উক্ত সেবাএতগণ আমার জাএগায় কায়েম মোকাম হইয়া স্বিয় ২ নাম সেবাএত হেসাব লেখাইয়া উক্ত জমিদারীতে আমি জেরূপ দখলিকার থাকিয়া সেবাদী করিতেছি তদ্রোপ দখিলকার থাকীয়া আদায় তহশীল ও বন্দবস্তাদী তাবত কর্ম্ম উক্ত দুহিতা ও দৌহত্রগণ পরামর্শ পূর্ব্বক করিয়া সন ২ সদর খাজনা দিয়া মুনফা জে থাকিবেক তঃ দ্বারায় স্থাপিত উপরোক্ত দেব দেবির বন্দেজি নিত্ত সেবা ও পবাদী ও অতিথি সেবা ও ৺বাটী ইত্যাদি মেরামত তাবত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন ইহার অন্যথাচরণ কেহ করিতে পারিবেন না জদি করেন তেই সেবাএত হইতে খারিজ হইবেন উপরোক্ত তিন লাট জমিদারি জেলা দিনাজপুরের কালেকট্টারি সেরেস্তায় ও

দেবালয় বাটী উক্ত ৫৪।। বিঘা জমি জেলা চব্বিষ পরগণার কালেকট্টরি সেরেস্তায় সাবেক নাম খারিজে উপরোক্ত দেব দেবিগণের প্রতিষ্ঠীত নাম শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরি কালী ও শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বর মহাকাল শ্রীশ্রী৺জগমোহিনী রাধা ও শ্রীশ্রী৺জগন্মোহন কৃষ্ণ ও দ্বাদশ মন্দিরে অর্থাৎ ৺গঙ্গাতিরে বান্দাঘাটের চাঁদনির উত্তরদিগে প্রথম মন্দিরে যোগেশ্বর দ্রিতিয় মন্দিরে যত্নেশ্বর ত্রিতিয় মন্দিরে জটীলেশ্বর চত্তর্থ মন্দিরে নকুলেশ্বর পঞ্চম মন্দিরে নাকেশ্বর সপ্ত মন্দিরে নির্য্যরেশ্বর ও ঐ চাঁদনীর দক্ষিণদিগে প্রথম মন্দিরে জঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় মন্দিরে জলেশ্বর ত্রিতিয় মন্দিরে জগদীশ্বর চত্তর্থ মন্দিরে নাদেশ্বর পঞ্চম মন্দিরে নন্দীশ্বর ষষ্ট মন্দিরে নরেশ্বর প্রসশীত দেবতাগণের জন্ত নাম শ্রীশ্রী৺কালীকৃষ্ণ যোগেশ্বর সিবাদী নাম পত্তন ও আমার নাম সেবাএত লিখিত হইয়া সরকারের নিরপীত কর আদায় হইতে থাকীবেক উপরোক্ত শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরি কালী ঠাকুরানি ও শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণজিউর পূজা রাঢ়ির শ্রেণী ও দ্বাদশ সিব ঠাকুরের পূজা স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণের দ্বারায় জেরূপ প্রচলিত আছে ঐরূপ থাকিবেক ৺না করেন জদীস্যা দৈব ব্যাঘাত জন্মে উপরোক্ত দেব দেবি মধ্যে কেহ ভগ্ন অথবা দস্য কাত্রিক অপহৃত হএন তবে উত্তরাধিকারি সেবাএতগণের (৩) কর্ত্তব জে তদনুরূপ প্রতি মর্ত্তি উক্ত ইষ্টেটের মুদ্রার দ্বারায় নির্মাণ, সাস্ত্রানুজারি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠা করিয়া উপরোক্ত নিয়ম মতে সেবাদী পুত্র পৌত্রাদীক্রমে করিতে থাকিবেন আমি অবর্ত্তমানে আমার নাম খারিজে আমার স্থলাভিসীক্তপতি মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের সেবাএত রূপে সেবাএত শ্রেণীতে নাম দাখিল হইবেক এবং সেবাএত-দিগের কাহারো অবর্ত্তমানে তদুত্তরাধিকারি তৎস্থলাভিশীক্ত হইয়া আর ২ সেবাএতের সহিত সেবা নির্ব্বাহ করিবেন এই রূপে উপরোক্ত সকল নিয়মে সেবাএত দিগের পুরসানুক্রমে উক্ত দেবসেবাদী চলিতে থাকিবেক এতদর্থে আপন সচ্ছন্দ সরিরে সানন্দ চিত্তে দেবত্তর দান ও সেবাএত নিয়োগপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর।

(স্বাঃ) শ্রীরাষমনী দাশী

Seal
RAUS MONEY DOSSI
কালীপদ অভিলাষী
শ্রীরাসমনী দাসি

Ramnarain Dass

শ্রীরাম কিশোর সেন, কবিরাজ সাং অম্বিকা
শ্রীশ্রীকণ্ঠ দত্ত, সাং হাল জানবাজার
শ্রীশ্রীহরি ঘোষ, সাং হাল জানবাজার

শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণ
সাং বরাহনগর
হাল জানবাজার

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বসু, সাং হাল জানবাজার
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাং হাল জানবাজার

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মান্না
সাং জানবাজার
শ্রীগুরুচরণ দাশ
সাং ইটালি

Acknowledged before me by Sreemoty Rasmony Dosee as having been executed by her this 18th Feby' 1861

Sd/- J. F. Watkins
Solicitor

* * *

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর 'বিল অব সেলের' মাধ্যমে দক্ষিণেশ্বরের জমিটি কেনা হলেও, সেটি তখন রেজিষ্ট্রি করা হয়নি ; কারণ, তখন রেজিস্ট্রেশান আইন চালু ছিল না। পরে উক্ত আইন বলবৎ হলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি সম্পাদিত উক্ত দলিলের মধ্যে ঐ 'বিল অব সেলের' কথা উল্লেখ করে সেই দলিল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট আলিপুরের রেজিস্ট্রী অফিসে যথারীতি রেজিস্ট্রী করা হয়। রেজিস্ট্রার ছিলেন শ্রীতারকনাথ সেন। রাণী রাসমণির দেহ ত্যাগের ৬ মাস বাদে এই রেজিস্ট্রী হয়েছিল।

রেজিষ্ট্রেশনের নকল

No 426, Book AN Vol. 8B Pages from 256 to 269

This deed was presented to me for registration by Prosono chunder Bose, Mooktear of late Rashmony Dassee decased having verbally taken the depositions of the witnesses Doorgapersad Mannah, Gooroo charan Dass and Prosono chunder Bose I have registered it this day, the 27th day of August 1861, between the hours of 2 + 3 P. M.

Sd. Tarak Nath Sen
Registrar of deeds
24 Parganas.

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই দলিলে রাণী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার কোন স্বাক্ষর নেই।)

॥ ২১ ॥

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরাদির বর্ণনা

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাদি, উদ্যান, ঘর, প্রভৃতির তাৎপর্যসহ বিস্তারিত বিবরণ

গাজীতলা :—দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে পশ্চিমমুখী গঙ্গার দিকে রাণী রাসমণি রোড। এই রাস্তা দিয়ে উদ্যানের প্রধান ফটক পেরিয়ে কিছুটা অগ্রসর হোলে, কালী মন্দিরের পূর্বদিকের পুকুরটির নাম 'গাজীপুকুর' এবং এই গাজীপুকুরের উত্তর-পূর্বকোণে 'গাজীতলা'। এটি জনৈক গাজীপীরের স্থান, যেখানে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'ইসলাম ধর্ম' সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমানে এখানে এক বিরাট অশ্বত্থ গাছসহ স্থানটি বাঁধানো আছে এবং একটি ছোট ফলকে পরমহংসদেবের সাধনার স্থল ব'লে লেখা আছে।

হিন্দুরাও যেমন এখানে প্রণাম করেন, মুসলমানেরাও এটিকে বিশেষ মান্য করেন এবং মাঝে মাঝে এখানে বাতি জ্বালিয়েও যান। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত গাজীপুকুরের আয়তন ২৬০ ফুট লম্বা এবং ১২২ ফুট চওড়া। পশ্চিম দিকের ঘাটে বাসন মাজা হয়।

গাজীতলাটি এই উদ্যানের আদি স্থান ; কিন্তু হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য, উদারহৃদয়া রাণী রাসমণি এটি উচ্ছেদ করেননি ; বরং বিদেহী বাবা গাজী পীরের স্বপ্নাদেশে তিনি স্বয়ং এটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

গাজীপীরের স্থানটি দেবোত্তর এষ্টেটের মধ্যে পড়ায়, এটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এষ্টেট বহন করে এবং এখানকার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দও করা হয়।

কুঠি বাড়ি : গাজীতলাকে বামদিকে রেখে, দেবালয়ের বাইরের উদ্যানের প্রধান রাস্তা বরাবর গঙ্গার দিকে অগ্রসর হোলে, দেবালয়ের উত্তরে এই দোতলা কুঠি বাড়ি। এটিও আদি বাড়ি এবং হেস্টি সাহেবের তৈরী। এটি রাণী রাসমণি, তাঁর জামাতা-কন্যা-দৌহিত্র প্রভৃতির আবাস ছিল। জানবাজার থেকে এসে তাঁরা মাঝে মাঝে এখানে বাস করতেন। শেষ জীবনে রাণী রাসমণি জানবাজারের বাড়ির চেয়ে অধিকাংশ দিন দক্ষিণেশ্বরে এই কুঠি বাড়িতে বাস করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন রাণী রাসমণির ব্যবস্থাপনায় এই কুঠি বাড়ির একতলার পশ্চিমের ঘরে বাস করতেন। এখানে ঠাকুরের অবস্থান ১৮৫৫ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ অবধি। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবীও প্রথমাবস্থায় এখানে বাস করেছিলেন এবং পরে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র রামঅক্ষয়, তথা অক্ষয়ও কিছুদিন এখানে বাস ক'রেছিলেন। কিন্তু এই বাড়িতেই অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায়, পরবর্তী-

কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কুঠি বাড়ি ত্যাগ করেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণের বর্তমান ঘরে (যেটি এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর নামে চিহ্নিত) চ'লে আসেন। মাতা চন্দ্রমণিকে তখন কুঠি বাড়ির পাশে নহবৎ বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর, এই কুঠি বাড়ির ছাদ থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনাগত ভক্তদের উদ্দেশে আহ্বান করতেন—'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ শীঘ্র আয় !' অতঃপর সত্যসত্যই একে একে সকল ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত'—অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—"ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছেন, 'তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না ; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।' ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস শীঘ্র আয়।"

এই বিষয়ে ঐ গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে আরো উল্লেখ আছে—"উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায়, সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুর বাড়িতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠি বাড়ির নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গাদর্শন হয়।"

(যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে কুঠি বাড়ির একতলায় একটি পুলিশ ক্যাম্প আছে)

নহবৎখানা :—এখানে নহবৎখানা দুটি ; একটি দক্ষিণদিকের বাগানে—এখন এটি বন্ধ থাকে। অপরটি দেবালয়ের বাইরে উত্তরদিকে এবং কুঠি বাড়ির পশ্চিমদিকে। আগে দুটি নহবৎখানা থেকেই নহবৎ বাজানো হোত। তখন ভোর থেকে রাত্রি অবধি নিয়মিত ৬ বার নহবৎ বাজানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে একেবারেই বাজানো হয় না। কেবলমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে, অর্থাৎ ৺স্নান যাত্রার দিন সানাই বাজানো হয় বটে, তবে নহবৎ থেকে নয়,—মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। এখন ভোগারতির সময় কেবলমাত্র ঢাক-ঢোল-কাঁসি প্রভৃতি নিত্য বাজানো হয়।

কুঠি বাড়ির পশ্চিমের এই নহবৎখানায় ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবী গঙ্গা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাস ক'রেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও এই নহবৎখানার নীচের একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে দীর্ঘকাল বাস ক'রেছিলেন। যে ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা বাস করতেন, সেই ঘরটি অষ্টভুজ। এক দেওয়াল থেকে অপর দেওয়ালের সর্বাধিক দূরত্ব ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। মেঝের মাপ ৫০ বর্গ ফুট। বারান্দার চওড়া ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণ দুয়ারী একটিমাত্র দরজার মাপ ৪' ২"×২' ২"। এই

ঘরে শ্রীশ্রীমা আনুমানিক ১৮৭২ সালের শেষ থেকে ১৮৮৫ সাল অবধি বাস ক'রেছিলেন, যদিও এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যত্রও বাস ক'রেছেন।

এই সময়েই গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গৌরী-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণও মাঝে মাঝে এখানে এসে বাস করতেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীও এখানে প্রায় ১৩ বছর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে একত্রে বাস ক'রেছেন। তাঁরা উভয়ে পিঞ্জরপ্রায় এই নহবৎ ঘরে একত্রে বাস করতেন ব'লে, ঠাকুর রহস্য ক'রে তাঁদের 'শুক-সারী' ব'লে ডাকতেন। একদা নহবৎঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো সাজিয়ে শ্রীশ্রীমা যখন গোপনে পূজার আয়োজন ক'রেছিলেন, সে সময় সহসা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ ক'রে ভাবস্থ হন এবং নিজের সেই ফটোর ওপর দু-একটি ফুল রেখে দেন। বর্তমানে এখানে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর প্রতিকৃতিতে নিত্যপূজা হয় এবং এটিকেই 'শ্রীশ্রীমায়ের ঘর' নামে অভিহিত করা হয়।

এই নহবৎখানা প্রসঙ্গে 'কথামৃত'—গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে উল্লেখ আছে—"পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে, ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবী এখানে নীচের তলাতেই প্রথমাবস্থায় বাস করতেন; পরে এটির ওপরের ঘরে আমৃত্যু বাস করেছিলেন। (আনুমানিক ১৮৭০—৭৭ খৃষ্টাব্দ)।

রাণী রাসমণির মন্দির ঃ—নহবৎখানার দক্ষিণে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বাইরে উত্তর-দিকে মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী, পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি দেবীর শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অপূর্ব মূর্তি সহ একটি সুন্দর ছোট মন্দির। এটি অবশ্য অনেক পরে স্থাপিত। বাংলা ১২৬২ সন (ইংরাজী ১৮৫৫ সাল) ৺স্নান যাত্রার দিনে দেবালয় স্থাপিত হওয়ায়, একশত বছর বাদে বাংলা ১৩৬১ সনের ১লা আষাঢ় (ইংরাজী ১৯৫৪ সালের ১৬ই জুন) ৺স্নান যাত্রার দিনে 'মন্দির-প্রতিষ্ঠা শত বার্ষিকী' উপলক্ষে 'দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেট' কর্তৃক এই মন্দির স্থাপন করা হয়। এখানেও রাণী রাসমণি দেবীর মূর্তিকে নিত্য পূজা করা হয়। রাণীমার জন্মদিনে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

শিবমন্দির ঃ—কুঠিবাড়ির বিপরীত, অর্থাৎ দক্ষিণদিকে দেউড়ি দিয়ে দেবালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান ফটক। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে গঙ্গার সন্নিকটে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সরলরেখায় সারি সারি ১২টি শিবের মন্দির। শিবলিঙ্গগুলি

সবই কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত। মন্দিরগুলি সব পূর্বমুখী এবং ভিতরগুলি শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরে মণ্ডিত। প্রত্যেকটি মন্দিরই এক মাপের এবং দেখতেও একই রকম। সবগুলিই আটচালা শৈলীর এবং উঁচু ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরগুলির চারদিকেই উন্মুক্ত চাতাল।

মন্দিরগুলির সারি দু'ভাগে বিভক্ত—উত্তরদিকে ৬টি মন্দির, মাঝখানে চাঁদনী, আবার দক্ষিণদিকে ৬টি মন্দির। চাঁদনীর উত্তরদিকের ৬টি মন্দিরের শিবলিঙ্গ গুলির নাম, যথাক্রমে—যোগেশ্বর, রত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাগেশ্বর ও নির্জরেশ্বর ; আর চাঁদনীর দক্ষিণ দিকের ৬টি মন্দিরের শিবলিঙ্গগুলির নাম, যথাক্রমে—যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাদেশ্বর, নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর। সোপকরণ সামান্য নৈবেদ্য উপচারে প্রতিটি শিবকে নিত্যপূজো করা হয়। এছাড়া, শিবরাত্রিতে, নীলপূজায় ও চড়কের দিনে এবং স্নান যাত্রায় দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিনেও বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাধন অবস্থার প্রথমদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শিবমন্দিরে 'শিবমহিম্নঃ' স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ভাবাধিক্যে 'মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে বলব'— চীৎকার করে বার বার এই কয়টি কথাই বলতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। মন্দিরের কর্মচারীরা এটিকে পাগলামি মনে করে, জোর করে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আনাই সাব্যস্ত করেন। কিন্তু গোলমাল শুনে, রাণীমার জামাতা মথুর-মোহন ঘটনাস্থলে আসায়, কর্মচারীরা আর কিছু করতে সাহস পায়নি। কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে, সেখানে কর্মচারীদের সঙ্গে মথুরমোহনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি সরল বালকের মত ভয়ে ভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন— 'আমি বেসামাল হয়ে কিছু ক'রে ফেলেছি কি ?' মথুরমোহন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন—'না বাবা, তুমি স্তবপাঠ করছিলে, পাছে কেউ না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।' (লীলা প্রসঙ্গ-গুরুভাব, পূর্বার্ধ —অবলম্বনে)।

চাঁদনী ঃ—দু-সারি শিবমন্দিরগুলির মাঝখানে চাঁদনী ; চাঁদনীর পরেই পশ্চিমদিকে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার সুবিস্তৃত সিঁড়ি ও পোস্তা। ঘাটের সুবৃহৎ এই চাঁদনীতেই প্রথমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন হয়েছিল। নৌকাযোগে যাঁরা আসেন, তাঁরা এখানে এসে প্রথমে চাঁদনীতে ওঠেন।

'কথামৃত'—গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে তৎকালীন চাঁদনী সম্পর্কে বর্ণনায় আছে ঃ—"কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা

থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই-একটা লোটা, সেই চাঁদনীর মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু, ফকির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ-কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিনী ভৈরবী ত্রিশূল হস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনীর উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, ঐ রাসমণির ঠাকুর বাড়ি।”

বিষ্ণুমন্দির ঃ—প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্বদিকে বিষ্ণুমন্দির বা রাধাকান্তের মন্দির। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরে বাঁধানো। উঠান থেকে কয়েকধাপ উঠে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চাল। তারপর সাতটি খিলানযুক্ত বারান্দা। মন্দিরের ভেতরে সোপানযুক্ত মর্মরবেদীর ওপর রূপার সিংহাসন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে এবং শ্রীরাধার মূর্তিটি অষ্টধাতুতে নির্মিত। মূর্তিগুলি পশ্চিমাস্য। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের উচ্চতা ২১ ½ ইঞ্চি, আর শ্রীরাধার বিগ্রহের উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের নাম—শ্রীশ্রীজগমোহন কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার বিগ্রহের নাম—শ্রীশ্রীজগমোহিনী রাধা। এই নামেই এঁদের এখানে নিত্য পূজা হয়। এখানে নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা। স্নানযাত্রায়, অর্থাৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি বিষ্ণু অর্চনার বিশেষ দিনগুলিতে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এটি ৺রাধাকান্তের মন্দির হলেও, বিষ্ণুমন্দিরও বলা হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় কিছুদিন এখানে পূজা করেছিলেন এবং সাধনাও করেছিলেন। পরে মধুরভাবের সাধনার সময়েও তিনি এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন।

মন্দিরে অন্য একটি ঘরে যে কৃষ্ণমূর্তিটি দেখা যায়, সেটি আদি ও ভগ্ন মূর্তি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নন্দোৎসবে শয়ন দেবার সময়, এই মূর্তিটির একটি পা তৎকালীন পুরোহিতের অসাবধানতায় ভেঙ্গে যাওয়ায়, সেটিকে পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় একটি কৃষ্ণমূর্তি স্থাপনের আগ্রহে রাণী রাসমণির আমলেই দ্বিতীয় একটি একই ধরণের কৃষ্ণমূর্তি তৈরী করা হয়, কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভাঙা পা-টি ঠিকমত জুড়ে দিয়ে আবার পূজার বিধান দেওয়ায়, দ্বিতীয় বিকল্প মূর্তিটিকে প্রথমাবস্থায় পৃথক ঘরে রক্ষা করা হয়। পরে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 'দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের ট্রাষ্ট্রীগণ' কর্তৃক বিকল্প মূর্তিটিকে যথাস্থানে রাধাবিগ্রহের পাশে স্থাপন করা হয় এবং ভাঙা মূর্তিটিকে (যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ জুড়ে দিয়েছিলেন) পাশের

ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দেবদেবীদের অঙ্গরাগের সময় জোড়া-দেওয়া কৃষ্ণমূর্তিটির পা আবার ভেঙে গিয়েছিল এবং সেটিকে কোন-ক্রমে সাময়িক জোড়া দেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, একদা এই বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকার সময় ঠাকুরের ভক্ত শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ফটোগ্রাফার অবিনাশ চন্দ্র দাঁ-কে আনিয়ে ঠাকুরের ফটো তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাগ্যবান অবিনাশ সমাধিমগ্ন অবস্থায় ঠাকুরের সেই দুর্লভ আধ্যাত্মিক ভাবের ফটোটি তুলেছিলেন। ফটো তোলার আগে ঠাকুরের সমাধিমগ্ন দেহ কিছু বাঁকা থাকায়, অবিনাশ তাঁকে ঠিকমত বসাবার জন্য কাছে এসে তাঁর দেহ স্পর্শ করেন; কিন্তু ঠাকুরের দেব-দেহ ও চরণ দুটী ঠিকভাবে বসাতে গিয়ে তিনি দেহখানির অতীব কোমলতা অনুভব করেন। অবিনাশ ইতিপূর্বে সমাধি অবস্থার বিষয় সম্পর্কে কিছু না জানায়, ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে দেখেন যে, তা তুলোর মত হাল্কা এবং বেশী নাড়াচাড়া করলে হয়তো তা শূন্যে উঠে যেতে পারে। এই ঘটনায় অবিনাশ ভীত ও বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে নাড়াচাড়া বন্ধ করেন এবং যথাস্থানে ক্যামেরার কাছে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তাঁর ফটো গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশী তাড়াতাড়িতে ফটোর নেগেটিভ কাঁচটি তাঁর হাত থেকে অসাবধানতাবশতঃ পড়ে যাওয়ার ফলে, সেটির ওপরের অংশের সামান্য একটু ভাগ ভেঙে যায়; অবশ্য মূল ছবিখানি অবিকৃত থাকে। পরে এই ফটো ঠাকুরকে দেখালে তিনি বলেছিলেন—'এই ছবি একদিন ঘরে ঘরে পূজা পাবে।' বলা বাহুল্য, ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় বসা, প্রচলিত যে-ছবিটি এখন সর্বত্র পূজা হয়, তা ভবনাথের উদ্যোগে অবিনাশ চন্দ্র দাঁয়ের সেই বিখ্যাত ছবি। এই ছবিটির সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরের স্মৃতি জড়িত থাকায়, এই বিশেষ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হল।

'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে 'বিষ্ণুমন্দির' সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা আছে: "চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টক নির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তর দিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। ৺রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙানো আছে—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্ত বস্ত্রের আবরনী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, তাই ক্যাম্বিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব-কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারীর কার্যে প্রথম ব্রতী হন—১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ।"

কালীমন্দির ঃ—প্রাঙ্গণের পূর্বদিকের মাঝামাঝি এবং বিষ্ণুমন্দিরের দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখী কালী মন্দিরের পাষাণময়ী মা-কালীর মূর্তিটিও দক্ষিণমুখী। দেবীর বিশাল ও মনোহর মন্দিরটি নবরত্নচূড়াবিশিষ্ট, অর্থাৎ মন্দির শীর্ষে নীচুতলায় চারটি চূড়া, তার ওপরে মাঝ অংশ আরও চারটি চূড়া এবং সবার ওপরে একেবারে শীর্ষদেশে মূলচূড়া—সব সমেত নয়টি। প্রতিটি চূড়া এবং মন্দির গাত্রের শিল্পকাজগুলি স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় ৫০ ফুট, উচ্চতায় প্রায় ১০০ ফুট। গর্ভমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৫ ফুট। গর্ভমন্দির মধ্যে কালো কষ্টি পাথরে তৈরী দক্ষিণাকালী মূর্তিটির উচ্চতা ৩৩½ ইঞ্চি। কথিত হয়, মায়ের এই মূর্তি নির্মাণ ক'রেছিলেন হাওড়া জেলার দাঁইহাট নিবাসী নবীন ভাস্কর। দেবীর নাম শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী কালী, কিন্তু ভক্তগণের কাছে তিনি 'ভবতারিণী' নামে পরিচিতা।

'ভবতারিণী' নামকরণ সম্পর্কে শ্রীকালীজীবন দেবশর্মা তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা অভিধান"-গ্রন্থে (২৩৪ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন—"ভবতারিণী—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শক্তি বিগ্রহের নাম। এই নামটি রাণী রাসমণির গুরুদেবের দেওয়া। তিনি নবদ্বীপের পোড়ামাঠ বা পোড়ামা তলায় সাধন-ভজন করিতেন এবং নিকটবর্তী 'ভবতারিণী' কালীমাতার মন্দিরে জপ-ধ্যান ও প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই মন্দির ও তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ ১২৩২ বঙ্গাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই ভবতারিণীর নামানুসারেই গুরুদেব দক্ষিণেশ্বর কালীমাতার নামও 'ভবতারিণী' রাখেন"।

এই মন্দিরের অভ্যন্তর ও বিগ্রহ সম্পর্কে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডের অপূর্ব বর্ণনায় আছে ঃ—"দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী প্রতিমা। মা'র নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শিব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা, এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি ; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু ; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণ নির্মিত মুণ্ডমালা ; মাথায় মুকুট, কানে কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফুল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্বকোণে বিচিত্র শয্যা মা বিশ্রাম করেন।

দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রুপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটী; তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণ শিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্মিত 'রামলালা'* নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্ব শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি,—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্ধে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে সুন্দর বারাণসী বস্ত্রখণ্ড লম্ববান। বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভাবর্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা দালানটির কয়েকটি ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। …এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মাতৃসাধনার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার দেবী-মূর্তিকে জীবন্তজ্ঞানে পূজা করতেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন, মূর্তির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন, মূর্তিকে খাইয়ে দিতেন, মূর্তিকে গান শোনাতেন। এই সব অভিনব ঘটনাগুলি আজ সর্বজনবিদিত। এইখানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছাতে সফল হয়েছিলেন এবং বৈধীভক্তির নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করে কেবলমাত্র অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার সহায়ে নিজেই 'দেবীর সচল বিগ্রহে' পরিণত হয়েছিলেন। ফলে, আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অশুভ ক্রিয়াকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে প্রাচ্যের তথা ভারতের শুভকারী সনাতন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এইখানেই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং পরবর্তীকালে সমগ্র জগৎকে আকৃষ্ট করেছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

এই কালী মন্দিরে নিত্যপূজা এবং আমিষ ভোগের ব্যবস্থা আছে। (কেবলমাত্র একজন সেবায়েতের পালায় বলিদান হয় না এবং নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়)। এখানে বলিদানের প্রথা আছে, তবে কোন ভক্তের মানসিক পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা নেই। প্রতি অমাবস্যা, দুর্গাপূজার তিনদিন, বাসন্তীপূজার

* সন্ন্যাসী প্রদত্ত অষ্টধাতু নির্মিত বাৎসল্য প্রেমের আস্পদ 'রামলালা'বিগ্রহটি পরবর্তীকালে চুরি যাওয়ায়, সেখানে একটি নতুন বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে।

তিনদিন, জগদ্ধাত্রী পূজো, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন (স্নানযাত্রা), দীপান্বিতা কালী পূজো, ফলহারিণী কালী পূজো এবং রটন্তী কালী পূজার দিনে এখানে বলিদান হয় ; আবার দীপান্বিতা কালীপূজোয় ছাগ বলিদানের সঙ্গে মেষ ও মহিষ বলিদান হয়। এই বলিদান সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ২য় ভাগের বিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—
"মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে—লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের সে অবস্থা নয় ; পশুবধ দেখিতে পারিবেন না।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর, কার্তিকমাসে ৺কালী পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর মন্দিরে সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরামের পৌত্র গুরুদাস ৺মায়ের পূজায় ব্রতী হন। পূজার আগে গুরুদাস গঙ্গার ঘাটে মা-কালীর ঘটের জল আনতে গিয়ে অকস্মাৎ গঙ্গার জলে সলিল সমাধি হন এবং সেজন্য সেই একদিনই ৺মায়ের পূজার বিঘ্ন ঘটে।

(এই মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নানা লীলা কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে অন্যত্র বিবৃত করা হয়েছে)।

নাটমন্দির ঃ—কালী মন্দিরের সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অনেকগুলি স্তম্ভ বিস্তৃত প্রশস্ত এক নাটমন্দির। নাটমন্দিরটি দৈর্ঘে ৫০ ফুট ও প্রস্থে ৭৫ ফুট। ষোলটি বৃহৎ স্তম্ভের ওপর ছাদ। চারিদিক উন্মুক্ত। নাটমন্দিরের ওপরে উত্তরমুখী মহাদেব, নন্দী ও ভৃঙ্গি মূর্তি স্থাপিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মন্দিরে প্রবেশের আগে এই মহাদেবকেই প্রথমে প্রণাম করতেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গণে ইঁটের তৈরী বেদীতে বলিদান মণ্ড। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি-লাভের পর, ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর নির্দেশে এই নাটমন্দিরেই দিনের বেলায় সকলের সামনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'কুলাগার পূজা' সম্পন্ন করেন এবং এই নাটমন্দিরেই এক বিশেষ ধর্মীয় বিচার সভায় উক্ত ভৈরবী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবতাররূপে প্রমাণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মথুরবাবু এখানে অন্নমেরু উৎসব করেছিলেন। একদা এখানে চণ্ডীগান, যাত্রাগান, হরিকথা প্রভৃতির আসর বসত ; বর্তমানেও ভক্তদের আগ্রহে প্রায় নিত্যই এখানে ভজন-কীর্তনাদি হয় এবং মাঝে মাঝে বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানও হয়।

নাটমন্দির প্রসঙ্গে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে বর্ণিত আছে ঃ—
"কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺মহাদেবকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের

উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুইসারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরেই সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন।"

দালান-বাড়ি ঃ—মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিক ছাড়া বাকী তিনদিকেই অনেকগুলি ঘর এবং মন্দির প্রাঙ্গণে আসার জন্য তিনদিকেই প্রবেশ পথ। পূর্ব-দিকের সীমানায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একতলা দালান বাড়িতে ভাঁড়ার ঘর, রান্না-ঘর, ভোগের ঘর, আহারের স্থান প্রভৃতি আছে।

প্রাঙ্গণের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায় একতলা ঘরগুলিতে মন্দিরের কর্মচারীদের থাকার স্থান এবং বাকী দক্ষিণদিকের অংশে দপ্তর ও সেবায়েতগণের ব্যবহারের জন্য ঘর।

প্রাঙ্গণের উত্তর সীমানায় দেউড়ীর কাছে দু'পাশে বারান্দাসংলগ্ন অনুরূপ কয়েকটি ঘর। দুপাশেই দেউড়ীর ঘরে দারোয়ানেরা থাকে এবং দেউড়ীর বাম-দিকে, অর্থাৎ পূর্ব প্রান্তে মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতির বাসের স্থান।

দালান-বাড়ির তৎকালীন বর্ণনায় "কথামৃত"-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে উল্লেখ আছে ঃ—"চকমিলানো উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে, সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাট মন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান। বিষ্ণু ঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠানো হয়। উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্বদা থাকেন, আর ভাণ্ডারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত। উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর

ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয়স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে, বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ঃ—মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে শেষ শিব-মন্দিরের ঠিক উত্তরে যে ঘরটি আছে, সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের দিকে প্রায় ১৪ বছর বাস করেছিলেন এবং বর্তমানে সেই ঘরটিই 'শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর' বা 'ঠাকুরের ঘর' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে ঠাকুর এই ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা করেছিলেন। ত্যাগী সন্তানদের নিভৃতে শিক্ষাদান, কৃপাদান, জপ-ধ্যান-ভজন-কীর্তন-সমাধি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের নানা লীলামুখর স্মৃতি বিজড়িত এই বিশেষ ঘরটি ভক্তদের কাছে বিশেষ প্রিয়। এই ঘরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ২ খানি তক্তাপোষ, চৌকী প্রভৃতি সযত্নে ও পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে। দেওয়ালের গায়ে তৎকালীন কিছু ছবি এবং ইদানীং কালেরও অনেক ছবি টাঙানো আছে। তাছাড়া বুদ্ধদেব মূর্তি, যীশুখৃষ্টের ছবি প্রভৃতিও পূর্বের মতই এখনও বর্তমান। এমনকি, যে গঙ্গাজলের জালা থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল নিয়ে পান করতেন, সেটিও জলপূর্ণ অবস্থায় যথাস্থানে সংরক্ষিত আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় রাণী রাসমণি ও মথুরমোহন বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় কুঠি বাড়িতে বাস করলেও, সেই কুঠি বাড়িতেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের অকাল মৃত্যু হওয়ায়, ঐ বাড়িটি ত্যাগ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু স্থান পরিবর্তনের কোন সুযোগ তিনি তখন পাননি। অবশেষে কিছুকাল পরে কুঠি বাড়িটি চুনকাম করার প্রয়োজন হওয়ায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণের এই ঘরটিতে সাময়িক ভাবে চলে আসেন এবং মাতা চন্দ্রমণিকে কুঠি বাড়ির পশ্চিমদিকে নহবৎ বাড়িতে রাখা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের এই ঘরটি তখন ৺বিষ্ণুমন্দিরের ভাঁড়ার-ঘর রূপে ব্যবহৃত হত। কুঠি বাড়ির চুনকাম শেষ হওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘরে বরাবর থাকার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় মথুরমোহন এই সময় মন্দিরের পূর্বদিকের সীমানায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একতলা দালান বাড়ির একটি ঘরে ভাঁড়ার স্থানান্তরিত করেন। এই ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের শেষ ভাগে প্রায় ১৪ বছর এই ঘরে বাস করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুই এই ঘর পরিবর্তনের প্রধান কারণ।

ঠাকুরের জন্মতিথি, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি ও ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসবে এখানে বিশেষ পূজা, হোম ও অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে এখানে প্রতি ইংরাজী বছরের ১লা জানুয়ারী ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব পালন করা হচ্ছে। এই উৎসবের সূচনায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী এখানকার প্রথম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন প্রথম রাজ্যপাল প্রয়াত রাজা গোপালাচারী।

এই ঘরের পশ্চিম দিকে দরজার ধারে গঙ্গার দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বারান্দা, আর পূর্বদিকে,—প্রাঙ্গণে আসার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আর একটি বারান্দা। এই বারান্দার মধ্যবর্তী দেওয়ালটি, বারান্দাটিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। দক্ষিণ ভাগে, অর্থাৎ মন্দির প্রাঙ্গণের দিকের অংশে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করতেন,—বর্তমানে এই অংশে ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম বংশধর শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মীয় পুস্তক ও দেবদেবীর ছবি বিক্রয়ের একটি দোকান আছে। এই ঘরের বাইরে উত্তরে আর একটি চতুষ্কোণ বারান্দা ও তৎসংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমের বারান্দার উত্তর ভাগে ঠাকুর কেশবাদি ভক্তসঙ্গে সাধারণতঃ আলাপ-আলোচনা করতেন।

এই প্রসঙ্গে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছেঃ— "উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে, অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিম দিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূত সলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।"

"পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ মুখো। এ বারান্দায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বরীয় সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সংকীর্তন করিতেন; আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।"

বকুলতলা ও ঝাউতলা ঃ—নহবৎখানার পরেই বকুলতলা এবং বকুলতার ঘাট। এই ঘাটে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্নান করতেন। বকুলগাছটি নিশ্চিহ্ন, ঘাটটি বর্তমান। এই ঘাটেই প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর আগমন হয়, যিনি ঠাকুরকে তন্ত্রমতে দীক্ষাদান করেছিলেন এবং পরে জনসমক্ষে ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে ঠাকুরকে 'অবতার' রূপে প্রমাণ করেছিলেন। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবীকে তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে এখানেই অন্তর্জলি করা হয়েছিল। বকুলতলার কাছেই ঝাউতলা। পূর্বে এখানে মাত্র ৪টি ঝাউগাছ ছিল।

পঞ্চবটী ঃ—বকুলতলার কিছু উত্তরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে পঞ্চবটী। এখানে অনেক আগে একটি বটগাছ থাকায়, এটিকে আগে 'বটতলা' বলা হোত। এরই

পাশে দক্ষিণে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে বট, অশ্বত্থ, নিম, (মতান্তরে অশোক) আমলকী ও বেলগাছ রোপণ ক'রে 'পঞ্চবটী' করা হয়। অশ্বত্থ গাছটি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন এবং বাকী ৪টি গাছ তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম লাগিয়েছিলেন। একদা বৃন্দাবন থেকে ফিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা বা রজঃ এখানে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'আজ থেকে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য মহাতীর্থ হোল।'

একদা এই পঞ্চবটীর বেড়া ভেঙে যাওয়ায়, ঠাকুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সে কথা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বাগানের মালী ভর্তাভারীকে জানান। ঠিক সেই সময় গঙ্গায় তাঁদের সামনেই বান আসে এবং সেই বানের জলে অকস্মাৎ একবোঝা বাঁশের খুটী, বাকারী প্রভৃতি বেড়া তৈরীর সমস্ত উপকরণ ভেসে এসে পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে যায়। ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ ভর্তাভারীকে সে-কথা জানালে, ঠাকুরের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে সেই মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন করেও লাফ দিয়ে গঙ্গায় বানের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডুব দিয়ে সেই উপকরণগুলি জল থেকে তুলে আনে। এরপর ভর্তাভারী মালী সেই উপকরণগুলির দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া পুনরায় তৈরী করে ঠাকুরকে নিশ্চিন্ত করে।

এই 'পঞ্চবটী'তেই ঠাকুর তাঁর দ্বাদশ বছর সাধনকালের অধিকাংশ সময়ই বিবিধ সাধনা করেছিলেন এবং এই 'পঞ্চবটী'তেই একটি সাধন-কুটীরে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গুরু, শ্রীমৎ তোতাপুরীর সাহায্যে ঠাকুর বেদান্তমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করে 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেছিলেন। 'পঞ্চবটী'তে সাধনার জন্য ঠাকুর যে কুটীরটি নির্মাণ করেছিলেন, পরে সেখানে পাকা কুটীর হয় এবং বেদিকা নির্মাণ হয়। এই কুটীরে একটি শিবমূর্তি আছে এবং এখানেও নিত্য পূজা হয়। বর্তমানে এই সাধন-কুটিরটিকে 'শান্তি কুটীর' বলা হয়। এখানকার বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংসে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর তৈরী নরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, সারমেয়মুণ্ড, বৃষভমুণ্ড ও শৃগালমুণ্ড সমন্বিত 'পঞ্চমুণ্ডীর' আসনে একদা ঠাকুর নানা সাধনায় সিদ্ধ হন এবং সিদ্ধি লাভের পর সেই মুণ্ডাসন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। বেলতলাতেও অনুরূপ আসনে ঠাকুর একই সময়ে তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন।

'পঞ্চবটী' সম্পর্কে 'কথামৃত'—গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডের বর্ণনায় আছে—"বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্ত সঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।"

"পঞ্চবটীর মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থগাছ। দুইটি মিলিয়া যেন এক হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্য বশতঃ বহু কোটর বিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূলে ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মাশুলাকার বেদী সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই!"

পঞ্চমুণ্ডী বা বেলতলাঃ—পঞ্চবটীর আরও উত্তরে ঝাউতলা এবং ঝাউতলার পূর্বকোণে বেলতলা। এই বেলতলা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাধনস্থল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী এখানে নরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, সারমেয়মুণ্ড, বৃষভমুণ্ড ও শৃগালমুণ্ড—এই পঞ্চমুণ্ডের কঙ্কালাসন স্থাপন করে ঠাকুরের দ্বারা ৬৪ তন্ত্রের সকল প্রকার সাধনা করিয়েছিলেন। পরে সাধনা শেষে ভৈরবী কর্তৃক মুণ্ডগুলি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং সাধনবেদীও ভেঙে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই বেলতলাটিকে বাঁধিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং এই স্থানটিকে 'পঞ্চমুণ্ডী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

এই সম্পর্কে 'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ খণ্ডের বর্ণনায় আছেঃ— "পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপর ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গভর্ণমেণ্টের বারুদঘর।"

পুষ্করিণী, পুষ্পোদ্যান, ফটক, আস্তাবল, গোশালা প্রভৃতিঃ—

'কথামৃত'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে এই সকল বিষয়ে তৎকালীন অবস্থার যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তারই উদ্ধৃতিঃ—"উঠানের দেউড়ী ও কুঠির মধ্যবর্তী যে পথ, সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ঐ ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি—বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলামবাজার বা

কলিকাতার লোক যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচি মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।"

"পঞ্চবটী . পূর্বদিকে আর একটি পুষ্করিণী—নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালার পূর্বদিকে দ্বিতীয় ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।"

"উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজীতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত কুঠি ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী আছে।"*

"অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিনী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচীফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসিতেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে ভূমি খণ্ড, তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকা জবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা—নিকটে জুঁই, কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিমগায়ে বরাবর শ্বেত করবী, রক্ত করবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুর পুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টক নির্মিত মঞ্চের উপর রোপন করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে-পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।"

"শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের

* বর্তমানে এটির নাম 'নিজপুকুর'।

খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না! আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "কথামৃত"-গ্রন্থে বর্ণিত দৃশ্যের বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হাঁসপুকুরের উত্তর-পূর্বকোণে আগে যে সব গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি ছিল, বর্তমানে তার কোন চিহ্নই নেই। উদ্যান প্রাঙ্গণের রাস্তার দুধারে এবং গঙ্গার ঘাটের কাছে বহু দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া আছে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদির বর্ণনায় শেষ পর্যায়ে 'কথামৃত'—গ্রন্থের ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে, মাষ্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন—

"কালীবাড়ি আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন! আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।"

প্রকৃতপক্ষে, বাংলার জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির আজ সর্বধর্ম সমন্বয়কারী আধ্যাত্মিক আদর্শের জীবন্ত মূর্তিরূপে বিদ্যমান।

॥ ২২ ॥

মন্দিরাদিতে পূজা পদ্ধতি

বর্তমানে প্রতিদিন ভোর ৫টায় মন্দির খোলা হয় এবং দুপুর ১২টায় ভোগের পর ১২টা ৩০ মিনিটে মন্দির বন্ধ হয়। পুনরায় ৩টা ৩০ মিনিটে মন্দির খোলা হয় এবং রাত্রি ৯টায় বন্ধ হয়। অবশ্য এই নিয়ম শিবরাত্রি থেকে কালী পূজা অবধি। অন্য সময় রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটে মন্দির বন্ধ হয়। এছাড়া রবিবার, ছুটির দিন বা বিশেষ কোন পূজার দিনে বিকালে ৩টায় মন্দির খোলা হয় এবং রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটে মন্দির বন্ধ করা হয়। জুতা পায়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষেধ।

* * *

কালী মন্দিরের পূজারীর কাজ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। দৈনন্দিন কাজের তালিকায় আছে ঃ—ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে নৈবেদ্য ভোগ, দুপুরে অন্নব্যঞ্জন ভোগ ও আরতি, বিকালে ছানা সন্দেশাদি বৈকালিক ভোগ, সন্ধ্যায় আরতি ও রাত্রে শীতলী ভোগ। ভোগারতির সময় এখানে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজানো হয়।

এগুলি ছাড়াও কালী মন্দিরে বিশেষ কয়েকটি পূজা করতে হয় ঃ—যেমন, প্রতি অমবস্যার পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী, স্নানযাত্রা (প্রতিষ্ঠা দিবস), দুর্গোৎসব, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, দীপান্বিতা কালীপূজা, ফলহারিণী কালীপূজা, বাংলা নববর্ষ দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে বিশেষ পূজা। কয়েকটি বিশেষ পূজায় এখানে ছাগ, মেষ ও মহিষও বলি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একজন সেবায়েতের পালায় বলিদান ও আমিষ ভোগ নিষিদ্ধ ; বাকী পালাগুলিতে আমিষ ভোগের ব্যবস্থা আছে।

এখানকার সকল মন্দিরের পূজারীই দেবোত্তর এস্টেট থেকে বেতন পান,—আগেও অর্থাৎ রাণী রাসমণির আমলেও বেতন পেতেন। পুরোহিতগণকে সাধারণতঃ 'ভট্টাচার্যমশাই' বলে আগে সম্বোধন করা হতো—এখনও অনেকস্থলে করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাণী রাসমণি কর্তৃক মায়ের মন্দিরের প্রথম পূজারী—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের নামের শেষে 'চট্টোপাধ্যায়' পদবীর স্থলে 'ভট্টাচার্য' বলা হোত। কালীমন্দিরে প্রথমদিকে রামকুমার এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ওরফে গদাধর চট্টোপাধ্যায় পূজারীরূপে নিযুক্ত হওয়ায়, রামকুমারকে 'বড় ভট্চায' এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ছোট ভট্চায' বলা হোত। পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণও রাণী রাসমণিকে সকলের মত 'রাণীমা' এবং জামাতা মথুরমোহনকে সকলের মত 'সেজবাবু' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভক্ত মথুরমোহনের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এমন আন্তরিক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ফলে মথুরমোহন ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বা ঠাকুরকে 'বাবা' ডাকতেন এবং তিনিও 'মথুর' বলে স্নেহ প্রকাশ করতেন। • রাণী রাসমণি দেবোত্তর সম্পত্তির যে দলিল করে গেছেন, তার শেষ অংশের 'সিডিউল' বা তপশীলতে বেতনভোগী কর্মচারীদের তালিকায় পূজারীরূপে রামতারক, রামকৃষ্ণের পদবী 'চট্টোপাধ্যায়ের' স্থলে 'ভট্টাচার্য' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি, যেহেতু তাঁরা বেতনভোগী পুরোহিতের কাজ করতেন, সেজন্য তখনকার জমিদারী প্রথানুযায়ী দলিলের ঐ অংশে মাসিক মাহিনা ও বরাদ্দের হিসাবের তালিকায় অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকেও 'চাকর'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নাকি আজকের মানুষের কাছে, বিশেষতঃ ঠাকুরের ভক্তদের কাছে খুবেই স্পর্শকাতর বিষয়।

যাইহোক, মা-কালীর মন্দিরে তৎকালীন পূজারীদের নাম ঃ—রামকুমার ভট্টাচার্য (ওরফে চট্টোপাধ্যায়), রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (ওরফে চট্টোপাধ্যায়),

রামতারক (ওরফে হলধারী) চট্টোপাধ্যায়, রামঅক্ষয় (ওরফে অক্ষয়) চট্টোপাধ্যায়, রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বর্তমানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্রদ্বয়—রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও শিবরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ মা-কালীর পূজায় নিযুক্ত আছেন এবং মন্দিরের কাছেই নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন। অর্থাৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই রামকুমার যেমন কালীপূজোয় নিযুক্ত হন, তারপরেও তাঁর পিতৃবংশের লোকেরাই আজ অবধি কালীপূজায় নিযুক্ত আছেন—যদিও কিছুদিনের জন্য খুল্লতাত ভ্রাতা রামতারক, ভাগ্নে হৃদয়রাম প্রভৃতি সাময়িক এই কাজ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের সম্মতিক্রমে বর্তমানে কালীমন্দিরের পূজার ভার ৮ মাসের জন্য রামলালের বংশধরগণ এবং ৪ মাসের জন্য শিবরামের বংশধরগণ নিজেদের মধ্যে 'পালা'-ক্রমে পূজা করেন এবং কোন্ মাস থেকে কাদের পালা শুরু হবে, তা তাঁরা নিজেরাই স্থির করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূজার ভারটিও এঁদের ওপর ন্যস্ত আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রামকুমারের আমল থেকেই পূজারীদের বেতন দেওয়ার নিয়ম থাকায়, বর্তমানেও সব পূজারীই এস্টেট থেকে বেতন পান। যদিও এই চট্টোপাধ্যায় বংশীয়গণ রাণী রাসমণির আমল থেকেই মা-কালীর পূজায় নিযুক্ত আছেন, তবু ইদানিংকালে কাজের সুবিধার জন্য বাইরের পূজারীর দ্বারাও মা-কালীর পূজা করা হয় এবং রাণী রাসমণির দলিলের নির্দেশানুসারে তাঁরাও রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ফলে, এই চট্টোপাধ্যায় বংশীয়দের অশৌচের সময় মা-কালীর পূজায় কোন বাধা পড়ার আশঙ্কা থাকে না। ইদানীংকালে এখানে প্রয়োজনবোধে তন্ত্রধারকের কাজ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের দ্বারাও করা হয়।

* * *

৺রাধাকান্ত বা বিষ্ণুমন্দিরেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে এবং রাণী রাসমণির দলিলের নির্দেশানুসারে এখানেও পূজারীর কাজে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। এখানে 'শ্রীশ্রীজগমোহনকৃষ্ণ' ও 'শ্রীশ্রীজগমোহিনীরাধা' নামেই পূজা হয় এবং নিত্য নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। স্নানযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি বিষ্ণুঅর্চনার দিনগুলিতে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

* * *

দ্বাদশ শিবমন্দিরে প্রতিটি শিবকে সোপকরণ সামান্য নৈবেদ্য উপচারে নিত্য পূজা করা হয় এবং রাণী রাসমণির দলিলের নির্দেশানুসারে এখান বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণকে পূজার কাজে নিযুক্ত করা হয়। স্নানযাত্রা (মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস), শিবরাত্রি, নীলষষ্ঠী ও চড়কের দিনে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

শিবমন্দিরগুলির পূজার জন্য ৩ জন পূজারী নিযুক্ত আছেন। ৩ জন

পুরোহিতের মধ্যে ২ জন এস্টেটের বেতনভোগী, বাকী ১ জন পালাদার-সেবায়েতের পক্ষে পুরোহিতগণের মধ্যে থেকে আসেন।

* * *

এছাড়াও, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, রাণী রাসমণি দেবী প্রভৃতির মন্দিরে বা ঘরে এবং পঞ্চবটী, বেলতলা প্রভৃতি স্থানেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

* * *

বর্তমানে রাণী রাসমণির আমলের মত অতিথি আপ্যায়ন ও প্রসাদ বিতরণের ঢালাও ব্যবস্থা না থাকলেও, এখনও সাধু, সন্ন্যাসী, বাউল, বৈরাগী প্রভৃতিকে নিখরচায় আহার করানো হয়। অবস্থাপন্ন ভক্তেরা কিছু প্রণামীর বিনিময়ে এখানে বসে যেমন অন্নভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন, তেমন প্রতিদিন ইচ্ছুক ভক্তদের নিখরচায় অন্নভোগের প্রসাদ সীমিত সাধ্যের মধ্যে 'হাতে হাতে' বিতরণ করা হয়।

যে সব ভক্ত অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী দিতে আগ্রহী, তাঁরা সরাসরি সেগুলি মন্দিরে না দিয়ে, এস্টেটের দপ্তরে জমা দেবেন এবং এস্টেট কর্তৃপক্ষই তাঁদের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করবেন—এই প্রথাই এখানে বিদ্যমান। ভক্তের আর্থিক দানও এস্টেট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। প্রতিটি মন্দিরে এস্টেট কর্তৃক প্রণামীর বাক্স রক্ষিত আছে।

॥ ২৩ ॥

মন্দির-পরিচালনা পদ্ধতি

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরই দেবালয়ের পূজা, কর্মচারীদের বেতন, অতিথি সেবা প্রভৃতি বিরাট ব্যয় বহন করার উদ্দেশ্যে রাসমণি দেবী সেই বছরেই (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট) ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় দিনাজপুর জেলায় শালবাড়ী পরগণায় তিনটি জমিদারী কিনেছিলেন, যার আয় তখনকার দিনে ছিল বার্ষিক ২৩ হাজার টাকা। এছাড়াও সেখানকার হাট, গঞ্জ ও শালবন থেকে আয় মিলিয়ে বার্ষিক আরো ১৩ হাজার টাকা—অর্থাৎ মোট ৩৬ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪।৫ বছর বাদেই শারিরীক অসুস্থতার দরুণ, রাণী এই দেবালয়ের ব্যয়ভার ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে বহন করার জন্য এটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে পরিণত করার ইচ্ছুক হন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি 'দানপত্র' বা 'অর্পণনামা' প্রস্তুত করেন।*

---

* এই গ্রন্থের অন্যত্র মূল দলিলের নকল প্রকাশিত।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী এই দানপত্রে স্বাক্ষর করার পরের দিনই ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করায়, ৬মাস বাদে ২৭শে আগষ্ট এই দানপত্রের দলিলটি আলীপুরে রেজিস্ট্রী করা হয়।

এই দলিলে রাণী তাঁর জমিদারীর দিনাজপুর জেলার আয়ের সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরে দেবসেবা ও অতিথিসেবার জন্য দান ক'রে যান এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণকে, অর্থাৎ দৌহিত্রগণকে বংশ পরম্পরায় দেবালয়ের চিরস্থায়ী সেবায়েত নিযুক্ত ক'রে যান। রাণী অপুত্রক থাকায় তাঁর ৪ জন কন্যাই রাণীর বংশধররূপে উত্তরাধিকারিনী ছিলেন, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রাণীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারী এবং তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর মৃত্যু হওয়ায়, দলিলের নির্দেশানুসারে তাঁদের পুত্রগণও স্বাভাবিকভাবেই সেবায়েতরূপে গণ্য হন।

কিন্তু পরবর্তীকালে এখানকার দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে রাণীর বংশধরগণের মধ্যে তীব্র মতভেদের ফলে, পরস্পরের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা শুরু হয় এবং মোকদ্দমার বহুল ব্যয় বহনের দরুন ক্রমশঃ ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বিশদ তথ্যাদি পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে রাণী রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির প্রপৌত্র. দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের ভূতপূর্ব ট্রাষ্ট্রী, বর্তমানে অন্যতম সেবায়েত ও প্রবীণ আইনজীবি শ্রীআশুতোষ দাস, বি, এল, মহাশয় বলেন যে,—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণীমার দেহত্যাগের পর, তাঁর অন্যতম জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস, রাণীমার দলিলের নির্দেশ পালন না করে একাই দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের পরিচালনা করতেন এবং তাঁর জীবিতকাল থেকেই তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বা ও পুত্রগণ এষ্টেটের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতেন। রাণীমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি ও তাঁর ৩ পুত্র এবং রাণীমার দ্বিতীয়া কন্যা ৺কুমারীর একমাত্র পুত্র— এঁদের কাউকেই পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ার ফলে, বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী পদ্মমণি ও তাঁর ৩ পুত্র—গণেশ, বলরাম ও সীতানাথ এই বিষয়ে মীমাংসার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে শ্রীমতী জগদম্বা ও তাঁর ৩ পুত্র—দ্বারিকানাথ, ত্রৈলোক্যনাথ ও ঠাকুরদাস—এবং ৺কুমারীর একমাত্র পুত্র যদুনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়ের করেন। এটী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০৮ নং মোকদ্দমা।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিলের বিচারে মহামান্য হাইকোর্ট রায় দেন যে, রাণী কর্তৃক সম্পাদিত অর্পণ নামা-দলিল অনুযায়ী তাঁর ৮জন দৌহিত্র ও তাঁদের বংশধরগণ আইনানুসারে মন্দির সমূহের সেবায়েতরূপে পরিগণিত হবেন এবং সমুদয় দেবোত্তর এষ্টেটের পরিচালনার ভার তাঁরা বংশপরম্পরায় ভোগ করবেন। এইভাবে সমস্ত দৌহিত্রগণেরই অধিকার রক্ষিত হয়।

অতঃপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীমতী পদ্মমণির মৃত্যু এবং

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীমতী জগদম্বার মৃত্যুর পর, শ্রীমতী পদ্মমণির পুত্র বলরাম দাসের প্রচেষ্টায়, রাণীমার তৎকালীন জীবিত ৫ জন দৌহিত্র ও প্রয়াত বাকী ৩ জনের বংশধরগণ দেবোত্তর এষ্টেটের পরিচালনার ভার যৌথভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সেবায়েত সংখ্যা ১৬।১৭ জন হওয়ায়, যৌথভাবে এষ্টেট পরিচালনার কাজে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায়। সেজন্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি **Scheme of Management** বা নিয়ম-বিধি প্রণয়ণ সাপেক্ষ এষ্টেট পরিচালনার জন্য অন্তবর্তীকালীন একজন 'রিসিভার' নিয়োগের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থনা করা হয়। হাইকোর্ট কর্তৃক উভয় প্রার্থনাই মঞ্জুর করা হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রমথ চৌধুরী (ওরফে প্রখ্যাত ছদ্মনামী সাহিত্যিক 'বীরবল') ঐ এষ্টেটে 'রিসিভার' রূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট কর্তৃক রচিত নিয়ম-বিধি অনুযায়ী রাণীমার ৮জন দৌহিত্রকে ৮টি শাখারূপে গণ্য করা হয় এবং প্রতি বাংলা সনে এক বছরের জন্য প্রতিটি পালার ব্যবস্থা হয়।

রাণীমার কন্যাগণের তরফে নিম্নলিখিত মোট ৮টি পালার ব্যবস্থা ছিল ঃ -
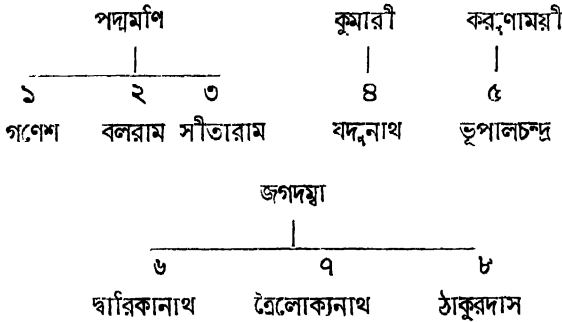
তবে, শ্রীমতী করুণাময়ীর পুত্র ভূপালচন্দ্রের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, বর্তমানে ৮টির বদলে ৭টি পালা চালু আছে।

হাইকোর্ট কর্তৃক রাণীমা'র ৮ জন দৌহিত্রকে ৮টি শাখারূপে গণ্য করা হলেও এবং প্রত্যেক শাখার বংশধরগণকে নিজ নিজ পূর্ব পুরুষদের নির্দিষ্ট 'পালা' যৌথভাবে ভোগ করার অধিকার দেওয়া হলেও, 'রিসিভার' পদটি বহাল থাকে এবং তাঁর ওপরেই দেবোত্তর এষ্টেটের পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এই সময়েই বৈষ্ণব সেবায়েত বলরাম দাসের প্রার্থনা অনুযায়ী নিয়ম-বিধিতে উল্লেখ থাকে যে, কোন সেবায়েত ইচ্ছা করলে, তাঁর পালার সময় 'বলিদান' প্রথা বন্ধ রাখতে পারবেন। তদনুযায়ী বলরাম দাসের পালা-বর্ষে 'বলি' বন্ধ থাকে এবং দেবীকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। আজও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমানে বিশ্বাস বংশীয় সেবায়েত কেশবলাল বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রদ্বয়—সুকান্ত ও সুমন্ত বিশ্বাসের পালাতেও 'বলি' বন্ধ আছে।

এই সময় আরও একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশ ছিল, যা সাধারণতঃ অন্য মামলা-মোকদ্দমায় থাকেনা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মন্দিরগুলির পরিচালনার সুবিধার্থে, প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত ৩০২।১৮৭২ সালের মোকদ্দমার সূত্রে দরখাস্ত করলেই তা গ্রাহ্য হবে,—প্রতিবারে পৃথক বা স্বতন্ত্র মোকদ্দমা রুজু করার প্রয়োজন হবেনা। তাই, এই মোকদ্দমা শতাধিক বর্ষকাল অতীত হলেও, আজও সজীব আছে এবং আইন-আদালতের ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমী নজির।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে 'রিসিভার' শ্রীপ্রমথ চৌধুরী পদত্যাগ করায়, সেই জায়গায় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত 'রিসিভার' নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯২৭ সালে বলরাম দাসের অন্যতম পুত্র যোগেন্দ্রমোহন, উক্ত 'রিসিভার' কিরণচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে, তাঁকে অপসারণের জন্য উক্ত ৩০৮।১৮৭২ নং মোকদ্দমায় দরখাস্ত করেন। এই সময় অন্যান্য সেবায়েতগণ যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা সূত্রে শ্রীদত্তকে 'রিসিভার' পদ থেকে অপসারণ অনুমোদন করেন এবং তার পরিবর্তে সেবায়েতগণের মধ্য থেকে ৩ জনের দ্বারা গঠিত একটি 'ট্রাষ্টি বোর্ড' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্রীদত্তের অপসারণ এবং 'ট্রাষ্টি বোর্ড' গঠনের জন্য হাইকোর্টে প্রার্থনা জানালে, হাইকোর্ট উভয় প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। অতঃপর শ্রীদত্ত 'রিসিভার' পদ থেকে অপসারিত হন এবং ১৯২৯ সালের ১৬ই জুলাই থেকে আদালতের মনোনীত ৩ জন সেবায়েত দ্বারা গঠিত 'বোর্ড অফ্ ট্রাষ্টী' এই সম্পত্তি পরিচালনার সমুদয় ভার গ্রহণ করেন, যা এখনও চালু আছে।

এই 'ট্রাষ্টী বোর্ডের' প্রথম পদটিতে রাণীমার দৌহিত্র বলরাম দাসের অন্যতম পুত্র যোগেন্দ্রমোহনকে ৯ বছরের মেয়াদে, দ্বিতীয় পদটিতে রাণীমার অন্যতম দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীর অন্যতম পুত্র নন্দলালকে ৬ বছরের মেয়াদে এবং তৃতীয় পদটিতে রাণীমার আর এক দৌহিত্র গণেশচন্দ্রের জনৈক উত্তরাধিকারী কানাইলাল দলুইকে ৩ বছরের মেয়াদে মনোনীত করা হয়।

অতঃপর উপরোক্ত স্কীমে প্রয়োজন মত রদ-বদলের ব্যবস্থার জন্য আবার আদালতে প্রার্থনা জানানো হয় এবং সেইমত ১৯১২ সালের নিয়ম-বিধি আদালত কর্তৃক সংশোধিত হয়ে, ১৯২৯ সালের ১৬ই জুলাই থেকে সংশোধিত নিয়ম চালু হয়। ঐ স্কীমের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম ৩ জন ট্রাণ্ট্রী অবসর গ্রহণ করলে, সেই জায়গায় যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা প্রত্যেকে ৯ বছর মেয়াদকাল ভোগ করবেন। এই নিয়মে ট্রাষ্টিগণের নির্বাচন বিধি, তাঁদের ক্ষমতা ও করণীয় কর্তব্য, সেক্রেটারী নিয়োগ, কর্মচারী নিয়োগ-বরখাস্ত, পূজাপার্বনাদি পালন, আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু পরিচালন প্রভৃতি এই স্কীমে বিশদভাবে বিধিবদ্ধ করা আছে।

এই স্কীমের সর্বশেষ ট্রাষ্টি শ্রীআশুতোষ দাস (যিনি প্রথম ট্রাষ্টি যোগেন্দ্র-

মোহনের একমাত্র পুত্র, বলরামের পৌত্র এবং শ্রীমতী পদ্মমণির প্রপৌত্র) ১৯৭২ সালের ২৮শে জুলাই উক্ত ৩০৮।১৮৭২ নং মোকদ্দমায় এক দরখাস্ত করেন যে, সেবায়েতগণ কর্তৃক যে পদ্ধতিতে ট্রাষ্টিগণ নির্বাচিত হন, সেটি উক্ত স্কীম অনুযায়ী সঠিকভাবে ভোট গণনার অন্তরায়, সুতরাং আদালত কর্তৃক এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হোক। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে আদালত ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করে রায় দেন যে, ভোট গণনার পদ্ধতি পরিবর্তন করা হোল, কিন্তু সেজন্য স্কীমের কিছু রদ-বদল আবশ্যক।

উক্ত শ্রীআশুতোষ দাসের ট্রাষ্টিপদের মেয়াদ ১৯৭৮ সালের ১২ই এপ্রিল শেষ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু যে পর্যন্ত নিয়মাবলীর রদ-বদল না হয়, সে পর্যন্ত নতুন ট্রাষ্টি নির্বাচন স্থগিত থাকে। ফলে, অন্তবর্তীকালীন দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেট পরিচালনার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক এটর্নীদ্বয়—শ্রীপুলকচন্দ্র দাস ও শ্রীকিঞ্জলকুমার বড়ালকে 'স্পেশাল অফিসার' রূপে নিয়োগ করা হয়।

১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীআশুতোষ দাস ঐ মূল মোকদ্দমায় পুনরায় দরখাস্ত করেন যে, স্কীমের প্রয়োজনীয় রদ-বদল করে ট্রাষ্টি নির্বাচন চালু করা হোক এবং 'স্পেশাল অফিসার'দের অপসারণ করা হোক। ঐ দরখাস্ত দাখিলমাত্র মঞ্জুর হয় এবং উক্ত 'স্পেশাল অফিসার'দ্বয় স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সেবায়েতগণের মধ্য থেকে নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের জুন মাসে ৩ জন ট্রাষ্টি নির্বাচিত হন, কিন্তু তাঁদের মেয়াদকাল ৯ বছরের পরিবর্তে মাত্র ৩ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালেও ট্রাষ্টি-গণের মেয়াদ ঐ ৩ বছর করেই থাকার সিদ্ধান্ত হয়।

বলা আবশ্যক, এখানকার পরিচালনার সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী এই ট্রাষ্টি।

একটি আন্তর্জাতিক মন্দির-পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে সকল বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্যই শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত তথ্যাদি পরিবেশিত হোল।

* * *

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসমণি দেবী দিনাজপুরে যে সম্পত্তি দেবোত্তর করে গিয়েছিলেন, সেটি পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, সেখানকার জমিদারীর আয় সম্পূর্ণ বন্ধ; সেজন্য দেবালয়ে রাসমণি দেবীর আমলের মত ব্যয় বহন করতে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। উদ্যানের মধ্যে রাস্তার ধারে বা গঙ্গার ধারে যে সব দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া আছে, সেই ভাড়ার টাকা দেবালয়ের কাজে ব্যয় হয়। উদ্যানের পুকুরগুলিও 'লীজ' দিয়ে কিছু আয় হয় এবং উদ্যানের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞাপন বোর্ডের

দরুনও কিছু আয় হয়। বলা বাহুল্য, সব আয়ই দেবালয়ের জন্য ব্যয় হয়। তা ছাড়া, প্রতিটি মন্দিরে দেবদেবীর কাছে যে প্রণামী পড়ে, বা কোন ভক্ত যদি বিশেষ কিছু দান করেন, সেগুলি দেবসেবার কাজে ব্যয় হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন—অন্যান্য অনেক দেবালয়ের সেবায়েতগণ যেমন মন্দিরের আয়ের কিছু ভাগ পান, এখানকার আয়ের কোন অর্থই কোন সেবায়েতের নেওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু পূজারীগণ এষ্টেট থেকে বেতন পেলেও, ভক্তদের কাছ থেকে পৃথক দক্ষিণা পান। দক্ষিণা ছাড়া দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণামী দেওয়ার জন্য প্রতিটি মন্দিরে পৃথক বাক্সের ব্যবস্থা আছে এবং সেই প্রণামীর টাকা দেবসেবার জন্য এষ্টেট ব্যয় করে।

বর্তমানে এই দেবালয়ে পূজক, কেরানী, খাজাঞ্চী, ভাণ্ডারী, পাচক, দারোয়ান, মালী, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি ৬০।৬২ জন বেতনভোগী কর্মচারী আছেন। ট্রাষ্টি কর্তৃক নিযুক্ত সেক্রেটারী* এখানকার কাজকর্ম প্রধানতঃ দেখাশোনা করেন।

এই দেবালয় বাবদ মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও যেমন দিতে হয়, সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ, রাস্তা ও দেবালয়গুলির ইলেকট্রীক খরচ বাবদও প্রচুর ব্যয় হয়। তাছাড়া প্রতিদিন এখানে আগত ভক্তদের 'হাতে হাতে' অন্নভোগ প্রসাদ দেওয়ার জন্যও কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। এই রকম নানাভাবেই নানা খরচ সাধ্যানুযায়ী দেবোত্তর এষ্টেট বহন করে, যদিও রাণী রাসমণির আমলের সেই বিপুল আয়ের পথ বর্তমানে দেশ ভাগের দরুন বন্ধ।

* * *

বর্তমানে এই মন্দিরটি কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, আলমবাজার পোষ্ট অফিস এবং বেলঘরিয়া থানার অধীন। মন্দির বাড়ির কোন নম্বর নেই। ঠিকানা—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, রাণী রাসমণি রোড, পোঃ—আলমবাজার, কলিকাতা-৩৫ (টেলিফোন নম্বর—৫৮-২২২২)।

* বর্তমান সেক্রেটারী কোন বেতন গ্রহণ করেন না।

॥ ২৪ ॥

তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় রাজচন্দ্র-রাসমণি সংবাদ

(তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত রাজচন্দ্র দাস ও রাণী রাসমণি সংক্রান্ত নানা সংবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। উদাহরণ স্বরূপ, কয়েকটি সংবাদ ঐতিহাসিক কারণে পরিবেশিত হোল। তৎকালীন ভাষা ও কিছু বানান এই সঙ্গে লক্ষ্যণীয়।

১

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিষয়ে রাজচন্দ্র দাসের ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮২৯, ৩০ মে (১২৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ)

"কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক—গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার একসচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয়ই করিলেন যে, কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেবলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল। সেই কাগজে প্রায় একশত সাহেবলোক প্রভৃতি সহী করিলেন, তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে, সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে। সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।..."

২

ব্যাঙ্ক স্থাপন উদ্দেশ্যে ভোটের দ্বারা নির্বাচিত কার্যকরী সমিতিতে রাজচন্দ্র দাসের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮২৯, ২৭ জুন (১২৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৫ আষাঢ়)

"...ট্রাস্টি (বিশ্বস্ত)—কম্পটন সাহেব, ডিকিন সাহেব ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়। ডাইরেক্টর (অধ্যক্ষ)—জন পামার, মেং গার্ডন, মেং স্মিথ, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মিথসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপক্যার, মেং সটন, বাবু রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটারী (সম্পাদক)—হরিসাহেব। ট্রেজারার (খাজাঞ্চী) —বাবু রমানাথ ঠাকুর।...ফলিতার্থ এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা, অতএব অস্মদেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল।"

৩

নিমতলা মহাশ্মশানের কাছে রাজচন্দ্র দাস কর্তৃক যাত্রী নিবাস নির্মাণের সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮৩৪, ১ জানুয়ারী

"মুমূর্ষু ব্যক্তিদের আশ্রয় স্থান—ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহাদের কোন প্রকারে জীবন সম্ভাবনা নাই, এমন ব্যক্তিদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতি ধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। ইহার পূর্বে ঐ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাকা দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে, নিজ খরচে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাপণে অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিদের ঐ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদি উপকার হয়। এবং এই অতি হিতজনক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে যে, অত্যল্পকালের মধ্যেই ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহাতে ঐ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে। অতএব, বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

৪

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে স্মরণ সভায় যোগদানের জন্য আহ্বায়কগণের মধ্যে অন্যতম রাজচন্দ্র দাসের নামযুক্ত সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮৩৪, ২৬ মার্চ (১২৪০ বঙ্গাব্দ, ১৪ চৈত্র)

"রাজা রামমোহন রায়—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচে লিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

"পশ্চাত স্বাক্ষরিত আমরা ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরনীয় হয়, এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামি ৫ এপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা সময়ে টৌন হালে ৺প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেমস্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জানপামর। টি প্লোডন। রসময়

দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। লঙ্গ ইবিল ক্লার্ক। রুস্তমজি কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্স। ডি মাকফার্লন। এ এয়র। এচ এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উইলিয়াম কব হরি। ডবলিউ কার। সি ই ত্রিবিলয়ন। ডেবিড হ্যার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। জেম্স সদর্লণ্ড। সি কে রাবিসন। ডি মাকিণ্টায়র। ডবলিউ এচ স্মোল্ট সাহেব।"

৫

সরকার কর্তৃক রাজচন্দ্র দাসকে সম্মানসূচক 'অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট' বা অবৈতনিক বিচারক পদে নিয়োগের সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮৩৫, ৯ মে

"এতদ্দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট—হরকরা-পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে ম্যাজিস্ট্রেটীকর্ম্ম নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রাজচন্দ্র দাস, রাজচন্দ্র মল্লিক, রাজা কালীকৃষ্ণ, রসময় দত্ত, রাধামাধব বাঁড়ুয্যো, রাধাকান্ত দেব, রুস্তমজী কাওয়াসজি।…"

৬

রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর সংবাদ ঃ—

সমাচার দর্পণ—১৮৩৬, ১৮ জুন (১২৪৩ বঙ্গাব্দ, ৬ আষাঢ়)

"বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু—স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিখ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরা-পত্র হইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণ পত্র হইতে নীত হইল। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ক বার্ত্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা ৺প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যে-যে কর্ম করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

৭

রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর সংবাদ ঃ—

সমাচার চন্দ্রিকা—১৮৩৬, ১৮ জুন (১২৪৩ বঙ্গাব্দ, ৬ আষাঢ়)

স্বীয় দয়ালু স্বভাবযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙালির মধ্যে অতি সুবিদিত ছিলেন, তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টা সময়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা পরে পরদিবস পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ বাবুর মরণে কেবল

তাঁহার আত্মীয়বর্গের মহাশোক হইয়াছে এমন নহে, তাঁহার মরণে সর্বসাধারণের বিশেষত এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে। বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাকা ঘাট বন্ধন এবং এক রাস্তা ও রোগী লোকদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজপ্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন, মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিবেন, তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল হিন্দু কলেজে কতক বিদ্যার্থীর বেতন নিয়মিত করেন, কিন্তু হায়! এমত সময় কালমৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল আশাই শেষ করিল। যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে, তৎকাল অবধি জীবন শেষ পর্য্যন্তই একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন।”

৮

রাসমণির নবদ্বীপভ্রমণ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ভোজন-দান-দক্ষিণার সংবাদ ঃ—

সংবাদ ভাস্কর—১৮৫১, ১১ ফেব্রুয়ারী (১২৫৭ বঙ্গাব্দ, ৩০ মাঘ)

“…কলিকাতার জানবাজার নিবাসী ৺বাবু রাজচন্দ্র রায়ের গুণবতী ভার্য্যা সুশীলা শ্রীমতী রাসমণি দাসীকে তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক বিপুল ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন জানাইতেছি যে, গত চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে প্রাগুক্তা শ্রীমতী নবদ্বীপে উপস্থিতা ছিলেন, গ্রহণকালীন ৺সুরধুনীতটে 8000 চারি সহস্র তঙ্কা নগদ ও প্রায় পাঁচশত খানা রক্তবর্ণ বনাত উৎসর্গ করিয়া নবদ্বীপ নিবাসী ছোট বড় প্রত্যেক পণ্ডিতগণকে ঐ মুদ্রা ও বনাত বিতরণ করিয়াছেন ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও গোলকনাথ ন্যায়রত্ন ও লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতিকে 50 পঞ্চাশ পঞ্চাশ তঙ্কা নগদ ও একখান ২ বনাত প্রদান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা ঐ দান বিশেষ সন্তুষ্টতার সহিত গ্রহণপূর্বক পুণ্যবতী শ্রীমতী রাসমণী দাসীকে সর্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদ করিতেছেন, কেবল ৺দেবী তর্কালঙ্কারের পৌত্র শ্রীযুত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীমতীর দান গ্রহণ করেন নাই।…”

৯

একদা জামাতা মথুরমোহনের বিরুদ্ধে আদালতে রাসমণির অভিযোগের সংবাদ ঃ—

সংবাদ সাগর—১৮৫২, ১২ জুলাই (১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ৩০ আষাঢ়)

“রাসমণি দাসী ও মথুরামোহন বিশ্বাস, এই দুই মান্য মহাশয়ের ছাড়াছাড়ি এবং টাকা ভাঙ্গাভাঙ্গি বিষয় প্রায় সকলেই সুবিদিত আছেন, তাহা আমাদের লেখা বাহুল্য ; শ্রীমতী রাসমণির সুপাত্র দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ যে সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ প্রদানপূর্বক মথুরামোহনের প্রতি সুপ্রিম কোর্টে যে অভিযোগ করাইয়াছিলেন, তাহা তত্রস্থ প্রাড্‌বিবাকগণ অতি সুক্ষানুসুক্ষ্য বিবেচনা করিয়া

রাসমণির পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন। মথুরবাবু এক্ষণে 'পুনঃমুসিকাবৎ' হইলেন, দেখা যাউক পরে কি হয়, বাবুজি কি শ্রীমতীর পর থাকেন, কি পুনরায় আপনার হন, যদ্যপি পর থাকেন, তবেই পেঁচা পেঁচি, নতুবা আপনার হইতে পারিলে, 'শঙ্কর চিলের ঘটিবাটী, গোদা চিলের মুখে নাথি'।"

১০

জামাতা মথুরমোহনের সঙ্গে রাসমণির বিরোধের ফলে কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত রাসমণির উকীলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার সংবাদ ঃ—

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫২, ১৪ই জুলাই (১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ২শ্রাবণ)

"বিজ্ঞাপন"

"কোম্পানির কাগজের ক্রয়-বিক্রয়কারিগণ এবং অন্যান্যদের প্রতি—এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান বৎসরের জুলাই মাসের সপ্তম দিবসে সুবে বাঙলার অন্তঃপাতি ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুসারে পশ্চাল্লিখিত কোম্পানির কাগজ সকল, যাহার মধ্যে প্রথম নয়খানা, যাহা পূর্ব্বে জগদম্বা দাসীর নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু অবশিষ্ট কয়েকখানা কাগজ যাহা পূর্ব্বে ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তদ্বিষয়ে উক্ত কোর্টের বিচারে এমত সাব্যস্ত হইল যে, মহানগর কলিকাতার জানবাজার নিবাসিনী মৃত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী বিধবা শ্রীমতী রাসমণি দাসী ঐ সমস্ত কাগজের স্বত্বাধিকারিণী ও কর্ত্রী। এ কারণ উল্লিখিত কোর্ট হইতে এরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইল যে, এইক্ষণে ঐ সমুদায় কাগজ অথবা তন্মধ্যে কোন কাগজ ক্রয় না করেন এবং বন্ধক না রাখেন।

১২ জুলাই, ১৮৫২

ইতি
জন নিউমার্চ
শ্রীমতী রাসমণি দাসীর উকীল।"

১১

রাসমণির জলপ্রণালীর জন্য দানের সংবাদ ঃ—

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৩, ১৬ ফেব্রুয়ারী (১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ৬ ফাল্গুন)

"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী সুশীলা পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতি রাসমণি দাসী সম্প্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

উক্তা শ্রীমতীর বাটীর নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্যন্ত জল প্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীসহ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে। তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণবর বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দূরীকরণার্থে এক জল প্রণালী নির্মাণ নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিষয় শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দান পূর্বক একাকিনী তৎকার্য্য সম্পন্ন করণে সম্মতা হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে—এবং এই কীর্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথ্বীমধ্যে বহু কাল ব্যাপিনী হইয়া জন সমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তি-কারিণীকে চিরস্মরণীয়া করিবেক।"

১২

রাসমণির অন্যান্য কীর্তি সহ দক্ষিণেশ্বর মন্দির স্থাপনের প্রস্তুতির সংবাদ ঃ--

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৩, ১৪ মার্চ (১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ২ চৈত্র)

"আমরা পরমানন্দে প্রকাশ করিতেছি, সুশীলা দানশীলা দয়াময়ী শ্রীমতী রাসমণি জানবাজার হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জল প্রণালী নির্ম্মাণার্থ নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক দ্বিতীয়ভাগের কমিশনারের হস্তে ২৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আর বড় বিলম্ব হইবেক না। এ বিষয়ে শ্রীমতী সাতিশয় যশস্বিনী হইয়াছেন। অপিচ, ইঁনি বহুলোকের উপকারার্থ হুগলীর ঘোলঘাটের পার্শ্বে, বহু ব্যয়পূর্বক যে এক নয়ন প্রফুল্লকর মনোহর ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তা দৃষ্টে দর্শক মাত্রেই সন্তোষ সাগরে অভিষিক্ত হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আমরা শুনিতেছি, উক্তা গুণযুক্তা শ্রীমতী আগামী বৈশাখীয় পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত্য করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয়, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিত্র কর্ম্মোপলক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়।"

১৩

রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঃ—

সোমপ্রকাশ—১৮৫৫ খৃঃ (১২৬২ বঙ্গাব্দ, ২২ জ্যৈষ্ঠ)

"জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষ্যে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিব স্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য, পট্টবস্ত্র, নগদ টাকা দিয়াছেন;

তারা মূর্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল। আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটী, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে, ৫০০ মোণ সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমনীয়রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বান্ধা রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোন প্রকার বৈলক্ষণ হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা, অর্দ্ধমুদ্রা, কেহ কেহ সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছেন, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্য্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক। অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই। জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিনী করিয়াছেন, সেই প্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুলধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্তি সংস্থাপিত রহিল।"

১৪

রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদঃ—

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৬। ১২ই এপ্রিল(১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ)

"১২৬২ জ্যৈষ্ঠ, জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যবতী শ্রীমতী রাসমণি দাসী বহু ব্যয় ও বহু সমারোহ পূর্বক দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন ও শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।"

১৫

বহুবিবাহ রোধে রাসমণির প্রচেষ্টার সংবাদঃ—

সংবাদ প্রভাকর ১৮৫৬,৩১ জুলাই (১২৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৭ শ্রাবণ)

"কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণের জন্য কলিকাতা হইতে দুইখানা, শান্তিপুর হইতে একখানা এবং শ্রীমতী রাসমণি দাসী একখানা, এই কয়েকখানা আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হইয়াছে, উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কালবিল সাহেব তাহা মুদ্রিত করণের অনুমতি করিয়াছেন।"

১৬

রাসমণির বাড়িতে গোরা সৈন্যদের অত্যাচারের সংবাদ ঃ—

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৮,৬মে (১২৬৫ বঙ্গাব্দ, ২৪ বৈশাখ)

"অবগতি হইল গত পরশ্ব সন্ধ্যার সময় ৪।৫ চারি পাঁচ জন সবল মদমত্ত গোরা নিবারণ না শুনিয়া জানবাজার নিবাসিনী, ধনশালিনী শ্রীমত্যা রাসমণি দাসীর সিংহদ্বারে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছিল, ইতিমধ্যে কতিপয় দ্বারপাল একত্র মিলিত হইয়া তাহার দিগ্যে প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। পরে অনুমান রাত্রি দশ ঘটিকার সময় উক্ত প্রহারিত গোরারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া আপনার দিগের দলস্থ অপর প্রায় একশত গোরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করত ঐ বাটীতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে, তাহাতে সমুদয় দ্বারপাল অতিশয় কোপান্বিত হইয়া প্রভুর ধনপ্রাণ সর্ব্বস্ব রক্ষা করণার্থে যত্নশীল হয়, কিন্তু তাহারা গৃহস্বামিনীর অনুমতি না পাওয়াতে পলায়ন—পরায়ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। গোরাগণ দুইজন দ্বারপালকে অসিদ্বারা হত্যা ও ৫।৬ পাঁচ ছয়জনকে সাঙ্ঘাতিক-রূপে আহত করে, এবং বহু মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী অপচয় করিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক পোলিস প্রহরী উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। নগরের মধ্যে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি, তাহা বাক্যাতীত।"

১৭

রাসমণির বাড়িতে গোরা সৈন্যদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিমতের সংবাদ ঃ—

সংবাদ প্রভাকর—১৮৫৮, ৬ আগষ্ট (১২৬৫ বঙ্গাব্দ, ২৭ শ্রাবণ)

"জানবাজার নিবাসিনী মান্যা ধনাঢ্যা শ্রীমতী রাসমণি দাসীর বাটীতে গোরা সেনারা প্রকাশ্যরূপে অত্যাচার করিয়াছিল, কেবল দুরাচারদিগের আকার নিরূপণ দুষ্কর হইয়াছিল, এই কারণ দণ্ড মুক্তি পাইয়াছে, অপর নূতনাগত গোরা সেনার-দিগকে সতর্ককরণ যাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং তাহারদিগের সর্ব্বদা রক্ষণ বিষয়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন—গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের নিকট এ বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য সন্ধান করিয়াছেন কিনা, অদ্যাপিও তাহা প্রচার হয়নি।"

॥ ২৫ ॥

রাণী রাসমণি বিষয়ক শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি

১

"রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন।···ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।"

(লীলাপ্রসঙ্গ—৩য় খণ্ড (গুরুভাব-পূর্বার্ধ)—পঞ্চম অধ্যায়)

২

" 'আমি' আর 'আমার'— এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছেন।"

(কথামৃত-১ম ভাগ, দশম খণ্ড-৭ম পরিচ্ছেদ)

৩

(দক্ষিণেশ্বর-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে)—"ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।"

(লীলাপ্রসঙ্গ-২য় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)

৪

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম। কারুকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।···একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এলো! পূজার সময় আসতো আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইলো।"

(কথামৃত-২য় ভাগ, প্রথম খণ্ড-১ম পরিচ্ছেদ)

৫

"মথুরবাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন আমরা ছিলাম। মথুরবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজাবাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে, এইসব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, 'মা, কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দক্ষিণশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই"।

(কথামৃত-২য় ভাগ, প্রথম খণ্ড-১ম পরিচ্ছেদ)

৬

"রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত, ভক্তলোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে! এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে-সব ভক্তেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তারপর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা-সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার...আছে; ঐসব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যেজন্য দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ১ম ভাগ-স্বামী যোগানন্দ প্রসঙ্গ)

৭

(বিদ্যাসাগর মহাশয়কে) "একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগানে। ভারী চমৎকার বাগান।" (কথামৃত, ৩য় ভাগ, প্রথম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)

॥ ২৬ ॥

বিদেশীয়দের দৃষ্টিতে রাণী রাসমণি

১

অধ্যাপক ফ্রেড্‌রিল ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০)

(জাতিতে জার্মাণ, ধর্মে খৃষ্টান। বিখ্যাত ভাষাবিদ। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডে বসবাস ও অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। ভারতীয় বেদের অনুবাদকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম বিদেশী গ্রন্থকার।)

"১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতার পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির স্থাপিত হয়। গঙ্গার তীরে ভারতের অন্যতম মনোরম মন্দির। মন্দিরের দলিল বা চুক্তিপত্র তৈরী হল রাণী রাসমণির গুরু বা ধর্মাভিভাবকের নামে। চুক্তিপত্র তৈরী না হলে, কেউ মন্দিরে আসবেন না, প্রসাদ গ্রহণও করবেন না, এই অনুমানে ঐ ব্যবস্থা। রামকৃষ্ণের বড় ভাই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হলেন।...... কয়েকমাস পরে অসুস্থতার জন্য তাঁর দাদার পক্ষে পৌরহিত্যের কাজ চালানো দুরূহ হয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণকেই ঐ কাজটি গ্রহণ করতে তিনি অনুরোধ করলেন। তিনি সম্মত হন এবং দেবী কালীর স্বীকৃত পুরোহিত হিসাবে তিনি গৃহীত হলেন।"

(রামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী—বঙ্গানুবাদ রঞ্জিৎ সিংহ। প্রথম প্রকাশ—জুন ১৯৭৯ খৃষ্টব্দ / পৃষ্ঠা—৩৩

প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩)

মন্তব্য :—উপরোক্ত তথ্যে কিছু ভুল আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের বদলে হবে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। কোন চুক্তিপত্রই রাণী রাসমণির গুরুর নামে রচিত হয়নি ; কেবলমাত্র মন্ত্রের দ্বারা গুরুর নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছিল।—**লেখক**।

২

মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)

(নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, জীবনী-কার, শিল্প ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ।)

"ঐ সময়ে নিম্নশ্রেণীর একজন ধনী মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম রাণী রাসমণি। কলিকাতা হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বরে তিনি মহাদেবী কালিকার একটি মন্দির স্থাপন করেন। সেখানে পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছিল। ধর্মভীরু ভারতবর্ষে লোকে সাধু-সন্ন্যাসী ও মুনি-ঋষির প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধাবান হইলেও, মাহিনা-করা পদের প্রতি সেখানে কাহারো শ্রদ্ধা নাই।… তাছাড়া, এক্ষেত্রে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শূদ্রানী। তাই মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণে ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুত হইবার ছিল সম্ভাবনা। অবশেষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ গ্রহণ করিতে রামকৃষ্ণ মনস্থ করিলেন।…১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের রক্ষয়িত্রী রাসমণির মৃত্যু হয়।…রাসমণি ছিলেন 'নয়া বড়লোক' এবং জাতিতেও নিম্নশ্রেণীর। তাই তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার মহানুভবতা ও উদারতার ফলে সকল ধর্মের অতিথিদের থাকার জন্য এখানে কয়েকটি কামরা ছাড়িয়া দেন।"

(রামকৃষ্ণের জীবন—বঙ্গানুবাদ ঋষিদাস। ৫ম সংস্করণ, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা ১৯, ৩১ ও ৫৭।

প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, সি ২৯-৩২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭)

৩

ক্রিস্টোফার ইশারউড (১৯০৪-১৯৮৬)

(প্রখ্যাত মার্কিন-সাহিত্যিক। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া বেদান্ত সমিতির প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের দীক্ষিত।)

"একথা ঠিক নয় যে, দাসত্ব ছাড়া বাঙালীজীবনের অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের দিক ইংরেজের চোখে সেদিন পড়েনি। সেদিন এমন অনেক বাঙালী ছিলেন, যাঁরা ভয়ডরহীন মনে রাজশক্তির কর্তৃত্ব আর রক্তচক্ষু শাসন উপেক্ষা করেছেন এবং রাজশক্তির সামনে নিজেদের সম্মানের আসনটি উঁচুতে তুলেছেন। এমনি একজন

প্রত্যয়দৃপ্ত মহিলা হলেন রাণী রাসমণি। (রাসমণি রাজমহিষী নন। ডাক নাম রাণী, সেই নামেই গুরুজনেরা ডাকতো। মেয়ে বড় হলেও সাধারণ মানুষ ঐ নামটিকেই বীজমন্ত্র করে নেয়। শুধু যে নেত্রীসুলভ তেজস্বিতা, তা নয়; রাসমণি ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্তি। তাই রাণীর মতই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতো।) রাণী বিধবা হয়েছিলেন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। স্বামী রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলেন রাসমণি। কলকাতার জানবাজার অঞ্চলে তাঁর বিশাল প্রাসাদ-ভবন। সেখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর দান-ধ্যান, দেবদ্বিজে ভক্তি আর তেজস্বিতার কথা, তখন কলকাতার মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। এমন একজন অসাধারণ মহিলা, যিনি ধনে, মানে, মর্যাদায় অভিজাত,---জন্মসূত্রে তিনি কিন্তু একজন শূদ্রারমণীমাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষে অবশ্য এই অসঙ্গতির ঘটনা, মোটেও বিরল নয়।"

(রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—বঙ্গানুবাদ রবিশেখর সেনগুপ্ত
১ম প্রকাশ—১৩৮৮ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ৩৬
প্রকাশক ঃ—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯)

৪

সিস্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)

(পূর্বনাম-মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। জন্মস্থান—আয়ারল্যাণ্ড। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারে আগমন। পেশায় শিক্ষিকা। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আগমন এবং স্বামীজীর কাছে দীক্ষান্তে 'ভগিনী নিবেদিতা' নাম গ্রহণ। ১৩/১০/১৯১১ তারিখে দার্জিলিঙয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে দেহত্যাগ)

"দক্ষিণেশ্বর মন্দির জাতিতে কৈবর্ত ধনাঢ্য রাণী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অন্যতম পূজারীরূপে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

"এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে; সম্ভবতঃ স্বামীজী নিজে সে প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের শিষ্যগণ যে ধর্ম-আন্দোলন সংগঠন করেন, এক হিসাবে নিম্নশ্রেণীর এক নারীই তাহার মূল কারণস্বরূপ। মানবিক দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও আসিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্যও হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের ঠিক পূর্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাড়ি-নির্মাণের উপরই সমগ্র ব্যাপারটি নির্ভর করিয়াছে। তাহাও আবার নিম্ন জাতির এক ধনবতী নারীর ভক্তির ফল।

স্বামীজী স্বয়ং আমাদের মনে করাইয়া দিতে ভোলেন নাই যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে দৃঢ়বদ্ধ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক এদেশে সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে ঐরূপ ঘটা কদাপি সম্ভব হইত না। এই ঘটনা হইতে তিনি ভারতে সার্বভৌম শাসকবৃন্দের জাতিভেদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ অর্পণ না করার গুরুত্ব অনুমান করেন।"

"রাণী রাসমণি তাঁহার সময়ের একজন বীর প্রকৃতির নারী ছিলেন। কিরূপে তিনি কলিকাতার জেলেদের অন্যায় কর ভার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখনও লোকমুখে সে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করেন, তাহা দিবার জন্য স্বামীকে* সম্মত করান। তারপর নদীর উপর দিয়া বিদেশীয় জাহাজ গমনাগমন একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেন। সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠ বা ময়দানে তাঁহার অধিকৃত রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিজনবর্গ কেন দেবপ্রতিমা লইয়া যাইতে পারিবেন না, তাহা লইয়া তিনি বেশ ভালমতো যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল, ইংরেজরা যদি ভারতবাসীর ধর্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে পথে প্রতিমাসহ শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহার আপত্তিকর অংশের দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হয়—উহাতে বিশেষ হাঙ্গামা কি? সেইরূপই করা হইল। ফল হইল এই যে, কলিকাতার 'রতন রো' নামক চমৎকার রাজপথটি মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। বৈধব্যদশা ঘটিবার কিছুদিন পরেই ব্যাঙ্কারদের নিকট সঞ্চিত বিপুল অর্থ স্বহস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে সমগ্র বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ অর্থ তিনি নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করেন। কার্যটি কঠিন হইলেও অসীম বুদ্ধি ও দক্ষতা সহকারে তিনি উহা সম্পাদন করেন এবং তখন হইতে সমস্ত কার্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। বহুদিন পরে এক বড় মকদ্দমার কৌঁসুলীর মাধ্যমে তাঁহার প্রত্যুতপন্নমতিত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান ও প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করার কাহিনী আজ পর্যন্ত কলিকাতার প্রতি হিন্দু পরিবারে চলিয়া আসিতেছে।"

"...শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরের ব্রাহ্মণযুবকরূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, এক নিম্নশ্রেণীর নারী কর্তৃক মন্দির নির্মাণ এবং ঐ উদ্দেশে সম্পত্তি দান তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল।..."

"...পরবর্তীকালে কালীবাড়িতে তিনি যে পদ অধিকার করেন, এই ঘটনাটি নিশ্চিত তাহার তাৎপর্য গভীরতর করিয়া তোলে। ভ্রমবশতঃ তিনি কদাপি কৈবর্ত বংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি বা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জানিতে পারেন, জগতে তাঁহাকে কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে, তখন ইহাও হৃদয়ঙ্গম করেন যে, বাল্যকালে পল্লীগ্রামের কঠোর আচারনিষ্ঠ অভ্যস্ত জীবন ঐ কার্যে সহায়ক না

*তথ্যগত ভুল আছে। স্বামী রাজচন্দ্র দাস তখন জীবিত ছিলেন না। —লেখক

হইয়া বরং প্রতিকূলই হইবে। আমরা ইহাও বলিতে পারি, তাঁহার সমগ্র জীবন এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, সামাজিক জীবনে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক, ধর্ম জীবনে সকলের সমান অধিকারে তাঁহার বিশ্বাস ছিল।"

"আমাদের গুরুদেব অন্ততঃ মনে করিতেন, তিনি যে সংঘভুক্ত, তাহার ব্রত হইল নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন।"

(স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—বঙ্গানুবাদ স্বামী মাধবানন্দ।
ষষ্ঠ সংস্করণ—পৌষ।১৩৮৪। পৃষ্ঠাঃ—২৩১-২৩৪
প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩)

॥ ২৭ ॥

স্বদেশীয়দের দৃষ্টিতে রাণী রাসমণি

শ্রীম—(শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) :—"ধন্য রাণী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।)

* * *

স্বামী সারদানন্দ :—"কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন পূর্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা এবং দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি, তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অর্থব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক নিজগুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতর নির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।··· অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী

শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রাণীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।)

* * *

স্বামী গম্ভীরানন্দ:—"রাণী রাসমণির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারেতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণা রাণী সেই প্রারম্ভাবস্থায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে তিনি ও তাঁহার জামাতা সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক যুগপ্রবর্তন কার্যের সহায়করূপে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। রাণীর জীবনীর অনুসরণ করিলে স্বতই মনে হয়, সুযোগ-সুবিধা পাইলে বঙ্গললনা যে-কোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও কার্যক্ষমতা বিকাশ করিয়া দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থা হইতে পারেন।..."

"এইরূপ ভক্তিমতী নারীর জীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ণয় করা অসম্ভব ; ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ধারণায় আনিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরই অনুধ্যান করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।....রাণীর প্রতি কার্যেই জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত। (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, 'রাণী রাসমণি' প্রসঙ্গ।)

* * *

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ:—"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান লীলাক্ষেত্র বলিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি বিশ্বতীর্থে পরিণত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নানা দেশ হইতে অসংখ্য নরনারী এখানে তীর্থযাত্রা করিতে আসেন। সাধারণতঃ ইহা 'রাসমণির কালীবাড়ি' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহার ইতিবৃত্ত রাসমণির জীবনেতিহাসের সহিত অভিন্নভাবে বিজড়িত। কারণ, ইহা রাণী রাসমণির জীবনের অক্ষয় কীর্তি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত রাণী রাসমণির নাম অধুনা বিশ্ববিদিত। যুগাবতারের লীলানাট্যের দৃশ্যপট নির্মাণের ভার যাঁহার উপর সংন্যস্ত হইয়াছিল, সেই মহীয়সী মহিলা নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয়া ও চিরঞ্জীবী। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগজ দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি জগদম্বার অষ্টনায়িকার অন্যতমা।"

(দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—১ম অধ্যায়।)

* * *

স্বামী অপূর্বানন্দ:—"কলিকাতার জানবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী রাসমণি। চার কন্যার মা। এমন সময় স্বামীর মৃত্যু হয়। অগাধ

বিষয়-সম্পত্তি। স্বামীর মৃত্যুর পরে বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিতে হল রাসমণিকে নিজের হাতে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতায় জমিদারির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হল। পুণ্যকর্মে অজস্র অর্থদান, অকাতরে অন্নদান, বহু জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান এবং তাঁর অসীম সাহসিকতার সুযশ কলিকাতা ছাড়িয়ে পড়ল দূর দূর স্থানে। তাঁর রাণী নাম সার্থক হল। তাঁর দেবীভক্তি এত গভীর ছিল যে, জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রে নিজ নামের যে শিলমোহর ব্যবহার করতেন, তাতে লেখা ছিল—'কালীপদ অভিলাষীণী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।' দেবদ্বিজে ভক্তিমতী রাণী যদিও তথাকথিত নীচকুলোদ্ভবা, আসলে তিনি ছিলেন—দেবী-অংশ-সম্ভূতা, ভগবতীর অষ্ট সখীর একজন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা—৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা—২৭।)

* * *

স্বামী তেজসানন্দ ঃ—"ঠাকুর বলিতেন, 'রাণী রাসমণি জগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।' তাই মাতৃপূজার অবসানে সিদ্ধ সাধিকা রাণী রাসমণি পূজার পবিত্র সুরভি জগতে বিতরণ করিয়া পুনঃ দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অলৌকিক কর্মকুশলতা, নির্ভীক সত্যবাদিতা, দয়াদাক্ষিণ্য, ন্যায়পরায়ণতা ও দেবভক্তি তাঁহাকে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের অন্তরে শ্রদ্ধার উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে এবং বাংলার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসেও এই আদর্শ জীবন-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।"

* * *

স্বামী জিতাত্মানন্দ ঃ—"সে যুগে হিন্দুধর্মের অবস্থা ছিল প্রায় ভয়াবহ। রক্ষণশীল মতাবলম্বীদের পরস্পর বিরোধী হাস্যকর বাচালতা আজ গল্পের মতো শোনায়। শৈবরা দুর্গাকে বলতেন 'হাতিমুখোর মা।' বৈষ্ণবরা বেলপাতা ছুঁতেন না,—নাম দিয়েছিলেন 'তেফরকাপাতা'। ভট্টাচার্য বামুনরা ভাগবতের পৃষ্ঠা ছুঁতেন না, দৈবাৎ একখানা পাতা খুলে প'ড়ে গেলে, তাঁরা চিমটা দিয়ে পাতাটা ধ'রে তুলে দিতেন। পণ্ডিতরা ব'সে মাথা ঘামাতেন অমুকদিন অমুক সবজি রান্না করা যাবে কিনা। ঠিক এই সময়ে যেন বিধাতার ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ তথা সর্বধর্মসমন্বয়ের মঞ্চ তৈরি করলেন কৈর্বত্যরাণী মহিয়সী রাসমণি।"

(বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ—২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৪৪)

* * *

স্বামী প্রভানন্দ :—"ঊনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। দুই অলোক সামান্য ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল ঘটনা প্রবাহের দুটি ধারা; ধারা দুটি মিলিত হয়েছিল ইংরাজ-ভারতের রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে—সেখানে গড়ে উঠেছিল ৺মাকালীর কেল্লা, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বেদীমূলে বসেছিল 'ধর্মমহাসভা', সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন ইতিহাস, আকর্ষণ করেছিল সকল শ্রেণীর মানুষকে, তাদের মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল এক মহিমময় ভবিষ্যতের। প্রথমজন হলেন গ্রাম বাংলার অসাধারণ প্রতিভাধর এক মানুষ, নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি ভারতবর্ষের পাঁচহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার ঘনীভূত মূর্তিরূপে সম্পূজিত। দ্বিতীয়জন কলকাতার এক ধনী অভিজাত পরিবারের কর্ত্রী, যিনি বুদ্ধিতে, তেজে, দানশীতায় ও হৃদয়বত্তায় এক মহাশক্তির অভিপ্রকাশ রূপে বাংলাদেশে চির সমাদৃত। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও আশীর্বাদপুষ্ট।...কালের বেলাভূমিতে সনাক্তকৃত পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে, রাসমণির জীবনসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ত্রিশবছরের ধর্মবিজ্ঞানের সাধনা দক্ষিণেশ্বরে মিলিত হয়ে সেখানে গড়ে তুলেছে এক মহাতীর্থ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন।"

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম):—"ওদিকে সকলের অগোচরে জগদম্বার ইঙ্গিতে ভাগীরথী তীরে এক পরিত্যক্ত শ্মশানভূমির উপর গদাধরের নূতন লীলাক্ষেত্র গড়িয়া উঠে।

গড়িয়া তুলিলেন সাধক রামপ্রসাদের দেশের এক মাহিষ্য কৃষকের কন্যা, পরবর্তীজীবনে—পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি। রাসমণি বহুগুণে ভূষিতা—একাধারে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, সহৃদয়া এবং ভক্তিমতী। বিবাহসূত্রে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইলেও ভোগবিলাসের মোহ 'কালীপদ-অভিলাষী' রাণীর চিত্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। জগদম্বার আরাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।"

(সারদা-রামকৃষ্ণ/'প্রভুগদাধর' অধ্যায়)

* * *

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ :—"শ্রীশ্রীভবতারিনী ও শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে সকল ধর্মমতের সাধকদের মিলনক্ষেত্র যেন—তীর্থক্ষেত্র রচিত হয়েছিল পুণ্য দক্ষিণেশ্বরে। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, কবি, চিকিৎসক, সঙ্গীতবিদ সকলেরই সমাগম হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। এলেন লীলাপার্ষদ সন্তানেরা, এলেন দেশ-দেশান্তর হতে কত রকমের ভক্ত ও সাধকেরা, আনন্দের নববৃন্দাবন রচিত

হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে ; পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির অন্তদৃষ্টি ও সুখস্বপ্ন হয়েছিল সার্থকতায় পরিপূর্ণ।…সেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাঙ্গন, সেই সাধনদীপ্ত পঞ্চবটী, সেই বেলতলা আজও তেমনি আছে, কিন্তু আজ তাদের প্রেরণাদীপ্ত ছায়াই শুধু সম্বল, কায়ার আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত তারা। তবুও জানি, তাদের প্রতিটি প্রস্তর খণ্ডে গাঁথা হয়ে আছে সেই পুণ্যবতী রাণী রাসমণির অমর কীর্তিকাহিনী, প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে সেই পুণ্যদেহীদের অমৃত স্পর্শ।"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন)

* * *

ডঃ রমা চৌধুরী :—"এমনই একজন মহাপুণ্যশীলা রমণী ছিলেন সর্বজনবন্দ্যা রাণী রাসমণি। ভারতললনাদের যে সকল বিশেষ গুণের জন্য তাঁরা দেবী পদবাচ্য হয়েছেন, তার সবগুলিই এই মহীয়সী নারীর মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর মাতৃদত্ত দুটি স্বতন্ত্র নাম 'রাণী' ও 'রাসমণি' লোকের মুখে মুখে একত্রিত হয়ে 'রাণী রাসমণিতে' পরিণত হয়েছিল এবং কালক্রমে সত্যই সার্থকতম হয়েছিল তাঁর এই আদরের নাম। কারণ, সরকার প্রদত্ত 'রাণী' উপাধি তিনি কোনদিন লাভ না করলেও, জনসাধারণের হৃদয়দেশে তিনি সত্যই ছিলেন সম্রাজ্ঞী ; নিরন্তর পরহিতৈষণা ও নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্থির সিংহাসন স্থাপন ক'রেছিলেন দেশের মর্মস্থলে পরমৈশ্চর্যময়ী রাণীর মত সগৌরবে।"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন)

* * *

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :—"শ্রীরামকৃষ্ণের টানে যে শিষ্যমণ্ডলী গুরুকে বেষ্টন করিয়া একটি পবিত্র আশ্রম-পরিবেশ রচনা করিয়াছে, তাহারও অলক্ষ্যমূলে রাণীর সাত্ত্বিক চিত্তর অভীপ্সা। রাণী রাসমণিকে বাদ দিলে, দক্ষিণেশ্বর-মহিমার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-আশ্রমকে যে ভক্তি দেখাই, তাহার কিছুটা যে রাণীরও প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।"

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন রচিত 'লোকমাতা রাণী রাসমণি' গ্রন্থের ভূমিকার অংশ)

* * *

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত :—"রাণী রাসমণি দেবী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যথাবিহিত পূজা ও দেবীর অন্নভোগরাগাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্রের আচারগত আপত্তি ছিল। এই সময়ে অনুরুদ্ধ হয়ে গদাধরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমস্যা মিটিয়ে রাসমণি দেবীর অনুকূলে এক ব্যবস্থা প্রদান করেন।…কিন্তু শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের পৌরহিত্য

করতে অস্বীকৃত হওয়ায়, পণ্ডিত রামকুমার অবশেষে নিজেই সেই পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বংশ আজও সেই পদে অধিষ্ঠিত। কথিত আছে, গদাধর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কারবশতঃ সেখানে অন্ন গ্রহণ করেননি। তিনি কিছুদিন গঙ্গাতীরে স্বপাকে আহার করতেন। অবশেষে অগ্রজ রামকুমারের পরলোক গমনের পর তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন।···এই সময় আমরা তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবিধান ভাঙতে দেখি।"

(স্বামী বিবেকানন্দ—৮ অধ্যায়)

*　　　*　　　*

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন :—"শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। রামকৃষ্ণ লীলায় রাণী রাসমণির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।···কিন্তু এই মহিমময়ী নারীর দিব্য জীবনের কতটুকুই-বা আমরা জানি। সকল দেশে, সকল সময়েই রাসমণির আবির্ভাব ঘটেনা। এ আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নহে এবং ইচ্ছা করিলেই রাসমণি সৃষ্টি করা যায় না।···তথাপি এই দেবীকে আমরা তাঁহার নিজস্ব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন)

*　　　*　　　*

'দেশ'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি-ভারতী-ভাগিরথী :—"ঋষিরা যাঁহাদিগকে লোকমাতা বলিয়াছেন, মাতৃমহিমার মনোধর্মে সেই আদর্শের দীপ্তিতে রাণী রাসমণি সত্যই ছিলেন লোকমাতা, জগজ্জননী। ···বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের মাতৃত্বের উদার আদর্শকে যদি আমরা আমাদের সাধনায় সমাজ-জীবনে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইতাম, তবে মনুর পত্নী শতরূপা, বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী, অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, কর্দম ঋষির সহধর্মিণী দেবহুতি, বিন্ধ্যাবলী, কুন্তী, দময়ন্তী, সতী, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, কৌশল্যা প্রভৃতির সঙ্গে রাণী রাসমণিও এদেশে লোকমাতৃরূপে পূজিতা হইতেন। আমাদের জাতীয় দৈন্য দূর হইত। আমরা মানুষ হইতাম।"

(লোকমাতা রাণী রাসমণি—একাদশ অধ্যায়)

*　　　*　　　*

'ভারতবর্ষ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :—

"রাণীর অসাধারণ পুণ্যফলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের উদ্ভব হইয়াছিল। শুধু 'যত মত, তত পথ'-এর আদর্শ প্রচারিত হয় নাই, ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রনাথ সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন এবং জড়বাদ জর্জরিত, ইহকাল সর্বস্ব জনসমাজে নূতন করিয়া সনাতন ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়া জগৎবাসীকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন।···স্বামীজীর আদর্শ আজ সর্বত্র আদৃত

হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ভারতের সর্বত্র সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই আজ নির্বাণলাভ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আর্তের সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রাণী রাসমণি গৃহী ছিলেন—আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের স্বার্থরক্ষার ও উন্নতি বিধানের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে জগৎবাসীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ চেষ্টার কথা ও তাহাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কথাও তাঁহার মনকে সর্বদা বিব্রত করিত। তাই তিনি তাঁহার বিরাট সম্পত্তির একাংশ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তথায় দেবসেবার সহিত অনাথ আতুর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রতি মানুষের যে এইভাবে স্বজন প্রতিপালনের সঙ্গে সর্বসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের একটা দায়িত্ব আছে, রাণীর জীবন ও কর্ম দ্বারাই সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাই পরবর্তীকালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কর্মের মধ্যে রূপায়িত দেখিতে পাইতেছি।”

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির— শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন)

* * *

সাহিত্যিক শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীঃ—“জানবাজারের বিখ্যাত রাণী রাসমণি। তেজস্বিতায় যিনি অদ্বিতীয়া। কেবল বিষয় কর্মে দক্ষতাই নয়,—তাঁর দরিদ্রসেবা, সত্যে নিষ্ঠা, ঈশ্বর বিশ্বাস, তাঁর অকাতর অকৃপণ হস্তে দান প্রভৃতি তাঁকে সে সময় সকলের প্রিয় করেছিল। লোকহিতকর কাজে তাঁর ছিল বিশেষ অনুরক্তি, অন্যায় বা অবিচার তিনি কোনদিনই মেনে নিতে পারেন নি। সেদিনকার শাসকবর্গও তাঁকে বিশেষ সম্মান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।···দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা রাণী রাসমণির একান্ত নিষ্ঠায় দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্ত হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। রাণীর সাধনা সার্থকতা লাভ করল।”

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন)

* * *

সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তঃ—“কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে।....স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক। একদিন মাতাল হয়ে একদল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয় পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই, রুখতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে শুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণী রাসমণি। রাজেন্দ্রাণী হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চাননা, শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী,

মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা-দুখানি কামনা করেন। সেরেস্তায় যে শীলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—'কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।' ঐশ্বর্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ।"

(পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—১ম খণ্ড।)

* * *

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—"প্রণাম করি মহাপুণ্যবতী মহিয়সী রাণী রাসমণিকে। যাঁর ভক্তির আকর্ষণে দেবী ভবতারিণ এই পীঠ-ভূমিতে নিজের লীলার ক্ষেত্র স্বপ্নযোগে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। যে ভক্তিমতী পুণ্যবতী স্বপ্নকল্পনার শিবশক্তির মহাতীর্থ রূপায়িত করেছিলেন ব্যাকুল আগ্রহে। যে ভক্তিমতী মহিয়সী অভ্রান্ত পুণ্যদৃষ্টিতে সাধক রামকৃষ্ণকে চিনতে ভুল করেননি। যাঁকে সাধক রামকৃষ্ণ পরমাপ্রকৃতির অষ্টসখীর অংশজাতা বলে জেনেছিলেন। নমো মহা সাধিকায়ে নমঃ।"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন।)

* * *

সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীঃ—"বিভূতি প্রকাশের জন্যেও ভগবানের অবলম্বন প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণের বহু সখা সখী ছিলেন। তাঁদের অবলম্বন করেই তিনি লীলা করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও অন্তরঙ্গ পার্ষদের অভাব ছিলনা। সাম্প্রতিককালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বহু শিষ্য-শিষ্যাকে অবলম্বন করেই লীলা করে গেছেন। যাঁদের অবলম্বন করে তাঁর আবির্ভাবের সূচনা, রাণী রাসমণি তাঁদের অগ্রনী।....যখন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঠাকুরের অন্যান্য বীর শিষ্যদল এসে জোটেননি, যখন ধর্মজগতে ঠাকুরের নামও অপরিচিত, তখন ছিলেন রাণী রাসমণি। রাণীকে জানবার এবং বোঝবার পক্ষে এই তত্ত্বটি সর্বাগ্রে অনুধ্যান করা প্রয়োজন।"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন।)

* * *

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ—"রামকৃষ্ণদেব না থাকলে, কোথায় থাকত দক্ষিণেশ্বর? রাণী রাসমণি না থাকলে কোথায় থাকতেন রামকৃষ্ণদেব? কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। যুগমানব যাঁরা, তাঁরা হবেনই আবির্ভূত, ঘটবেই তাঁদের বিকাশ,—রামকৃষ্ণদেবের বিকাশ ঘটবেই বলে যুগ-নিয়ন্তা রাণী রাসমণিকে এগিয়ে রেখেছিলেন তার আয়োজন করে রাখতে। ওদিকে নরেন্দ্র গড়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দের বিরাট সম্ভাবনার মধ্যে।

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণভবনে প্রবেশ করে মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়ালে, বাঁ দিকের দেয়ালে প্রথমেই তৈলচিত্রে একটি নারী-প্রতিচ্ছবি চোখে পড়বে, ঘরে এইটাই সব

চেয়ে বড়। প্রশস্ত প্রশান্ত ললাট, স্নেহায়ত দুটি বিশাল চক্ষু, তা থেকে জননীর আশা, আনন্দ আর ভগবৎ নির্ভরতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কণ্ঠে তুলসীর মালা। ইনিই দক্ষিণেশ্বরের জননী রাণী রাসমণি। আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেবিকারূপে। জননীর চেয়ে বড় সেবিকা আছেই বা কে?"

(দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন।)

* * *

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় :—"রাণী রাসমণির অবিস্মরণীয় কীর্তি দক্ষিণেশ্বর মন্দির, আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অবিস্মরণীয় কীর্তি রামকৃষ্ণ পরমহংস। এক হিসেবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে রাণী রাসমণিরই কীর্তি বলে গ্রহণ করলে ভুল বলা হয়না। ভবতারিণী মন্দিরের সেবাভার প্রাপ্তির অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণের মধ্যে যে দিব্যভাব দেখা দিয়েছিল, সাধারণ দৃষ্টিতে যা পাগলামীর লক্ষণ বলে প্রতিভাত হয়েছিল, সূক্ষ্ম বিচারদৃষ্টির কল্যাণে রাসমণি যদি সে ব্যাধির নির্ভুল নিদান করতে না পেরে চিরদিনের জন্য রামকৃষ্ণকে মন্দির হতে বিদায় দিতেন, যদি রামকৃষ্ণের আত্মিক পরিণতির জন্য মন্দিরের মধ্যেই তাঁর সাধনভজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করতেন, তা হলে হয়তো কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়, —গদাধর চট্টোপাধ্যায়ই রয়ে যেতেন। সে অবস্থায় জগতের আর্ত-নিপীড়িত মানবাত্মার যে অনতিবর্তনীয় ক্ষতি হত, তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাণী রাসমণি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ—এই ত্রয়ী একটি অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক একক, যা নিরবধিকাল অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিকিরণ করবে।" (দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬১ সন।)

* * *

(রাণী রাসমণি সম্পর্কে এরূপ অনেক অভিমত পাওয়া যায়। সবগুলি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে দুঃখিত।—**লেখক**।)

॥ ২৮ ॥

বংশধর পরিচিতি প্রসঙ্গ

রাণী রাসমণি দেবীর বংশধর পরিচিতি প্রসঙ্গে প্রথমেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী পুত্র সন্তান ছাড়া, কন্যা সন্তানকে "বংশধর" রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না; এমনকি, যাঁদের কেবলমাত্র কন্যাসন্তান আছে, তাঁদের মৃত্যুর পর, কন্যাসন্তান থাকা সত্বেও শাস্ত্রানুযায়ী তাঁদের বংশলোপ হ'য়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজচন্দ্র দাস ও রাণী রাসমণির কোন বংশই নেই, যেহেতু তাঁরা অপুত্রক ছিলেন এবং তাঁদের চারজন সন্তানই ছিলেন কন্যা। সুতরাং বিষয়টি যে স্পর্শকাতর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

আবার, শাস্ত্রানুযায়ী পিতামাতার রক্ত সম্পৃক্ত কন্যাসন্তানকে নিজের বংশধর-রূপে পরিচয় দানে বঞ্চিত করে, অপর যে কোন রক্তের ব্যক্তিকে "দত্তক" গ্রহণ করেও "বংশধর" রূপে পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ, কন্যাটি পিতা-মাতার বংশজাত সন্তান হলেও "বংশধর" নয়। এক্ষেত্রে, পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তানটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতই সমাজে স্থান পায়, যদিও নব্য সভ্যতায় নারী ও পুরুষের অধিকারকে সমান ভাবে গণ্য করা হয়।

এই "বংশধর" প্রসঙ্গটি তিনটি দিক থেকে বিচার করা প্রয়োজন। এক—শাস্ত্র, দুই—আইন এবং তিন—আধুনিক বিজ্ঞান।

এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা প্রয়োজন—'ধর্ম' ও 'শাস্ত্রনিয়ম' একই পর্যায়ে পড়েনা। ধর্মের স্থান অনেক উচ্চে এবং পবিত্রতা, অনুভূতি, আস্তিক্যবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্-গুণাবলীই ধর্মের প্রাণ। এই ধর্মের সহায়করূপে কতকগুলি বাহ্যিক বা সামাজিক আচার, নিষেধ ও সংস্কারগুলি "শাস্ত্রনিয়ম" অনুযায়ী পালিত হয় এবং এই নিয়মপালনের মাধ্যমেই ধর্মাবলম্বীর পরিচিতি ঘটে।

এবার এই বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ স্মরণ করা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান হিন্দু সমাজ "মনুসংহিতার" অনুশাসনে পরিচালিত। শাস্ত্রানুযায়ী পুরাকালে পৃথিবীতে ১৪ জন মনু ছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন। এই রকম একদিনের পর পর ১৪ জন মনু এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। এক এক মনুর অধিকার কালকে 'মন্বন্তর' বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনুর নাম পাওয়া যায়—যথা, (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) ঔত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুস, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) রৌচ্য এবং (১৪) ভৌত্য। এঁদের নির্দেশ সম্বদ্ধ সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের নাম—"মনু-সংহিতা"। এই সংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ধর্ম; দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতকর্মাদি সংস্কার

বিধি, তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি বিধি কার্যাদির নানা নির্দেশ আছে। এইভাবে প্রতি অধ্যায়ে এক একটি বিশেষ বিষয়ের নির্দেশকে 'শাস্ত্রবাক্য' বলা হয়। এই সংহিতার নবম অধ্যায়ে—স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি ও শূদ্রধর্মের বিষয় বর্ণিত আছে। এই দায়ভাগ নিয়ম অনুযায়ী কন্যাসন্তান বংশধর হয় না। এই নিয়মটিই বর্তমানে শাস্ত্রনিয়মরূপে স্বীকৃত এবং এখনও অপরিবর্তনীয়। আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাই পিতার পরিচয়েই পুত্র বংশধর হয়, যদিও এই ভারতবর্ষেই কয়েকটি প্রদেশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে। পিতার পরিচয়ে যদি পুত্রই বংশধর হয়, তবে পিতার পরিচয়ে কন্যাই বা কেন বংশধর হবেন না, সেকথা শাস্ত্রে উল্লেখ নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রাণী রাসমণির কন্যা হিসাবে যদি তাঁর কন্যাদের 'মাতা' রাসমণির বংশধররূপে পরিচয় দেওয়ার বাধা থাকে, তবে পিতৃ পরিচয়ে তাঁরা 'পিতা' রাজচন্দ্র দাসের কেন বংশধর হবেন না, তা বোধগম্য নয়। যুক্তিতে বলে হওয়া উচিত, কিন্তু শাস্ত্র এক্ষেত্রে একমাত্র পুত্র সন্তানের অনুকূলেই বিধান দিয়েছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্রসন্তানই অধিক মর্যাদা বা একমাত্র মর্যাদার অধিকারী। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয় এবং পুত্রসন্তান লাভের পর, মানুষ পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়। (ঋষিঋণ ও দেবঋণ শোধের কথাও শাস্ত্রে আছে, যেগুলির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।)

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩ ১)" অনুসারে পুত্রলাভ করে পিতা অন্ধকার অতিক্রম করেন ; পুত্র হল জ্যোতিঃ, কিন্তু কন্যা বা দুহিতা হল কৃপণ বা দুঃখের কারণ।

"ঋগ্বেদে (১০।৮৫।৪৫)" জননীর দশটি পুত্রকামনার কথা উল্লেখ আছে ; কারণ, পুত্রসন্তান না হলে গৃহের মর্যাদা থাকেনা, তাই পুত্র সম্পদরূপে গণ্য। পক্ষান্তরে কন্যা বন্ধকী দ্রব্য।

"অথর্ববেদে (৩ ২৩।৩।৬)" পুত্রকামনার কথা পাওয়া যায়।

"বিষ্ণুধর্মসূত্র (৮৫।৭০)" অনুসারে, বহুপুত্র হলে, তার মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়ায় পিণ্ডদান করবে।

"মনুসংহিতায় (৯'১৩৮)" উল্লেখ আছে ঃ—

'পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥'

অর্থাৎ—পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ করে ; এজন্য ব্রহ্মা স্বয়ং 'পুত্র' এই নাম রেখেছেন।

উক্ত সংহিতায় (৯'১৩৭) আরো উল্লেখ আছে ঃ—

'পুত্রেণ লোকান্ জয়তি'—অর্থাৎ, মানুষ পুত্র দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতি লোক সকল লাভ করে।

এইভাবে বসিষ্টসংহিতা, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে কেবলমাত্র পুত্রের জয় গান করা হয়েছে, কন্যাদের সেখানে কোন স্থান নেই। অর্থাৎ, পুত্র যদি উচ্ছৃঙ্খল বা কুলাঙ্গারও হয়, তবুও শাস্ত্রীয় মতে বংশধর হিসাবে সে শ্রেষ্ঠ ; আর কন্যা যদি সর্বগুণময়ীও হয়, তবুও পুত্রের তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ নয়। এই ভাবে, আমাদের শাস্ত্রই হিন্দুদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে, তথা ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইন্ধন জুগিয়েছে।

সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কন্যাকে বংশধররূপে স্বীকার করায় প্রবল বাধা আছে।

পরিবর্তনশীল জগতে যেমন প্রয়োজন বোধে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে, সনাতন ধর্মকে বজায় রেখেই তার শাখা-প্রশাখারও রূপান্তর ঘটেছে। যুগ অনুযায়ী যখন এই প্রাণবন্ত ধর্মের আঙ্গিক সত্তার পরিবর্তন হয়, তখন তাকেই "যুগ-ধর্ম" বলে স্বীকার করা হয়। স্বভাবতঃই এই যুগ-ধর্মের সঙ্গে শাস্ত্রনিয়ম-শাসনবিধিকেও অনেক সময় শিথিল বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মজার বিষয় এই যে, পুরুষ-শাসিত বা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে কয়েকটি শাস্ত্র-শাসনের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য, কয়েকজন বিবেকবান পুরুষ প্রধানকেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং তাঁরা জয়ীও হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের যুক্তিসম্মত প্রবল প্রতিবাদের ফলে, আইনকেও যুগ অনুযায়ী চলতে হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কন্যা-সন্তানও তাঁর পিতৃপরিচয়েই প্রকৃতপক্ষে বংশধররূপে দাবী করতে পারেন, যেহেতু পুত্রের অবর্তমানে কন্যা শাস্ত্রানুযায়ী তাঁর পিতামাতার পিণ্ডদানাদি শ্রাদ্ধের অধিকারিণী। দুঃখের বিষয়, নারীদের ক্ষেত্রে আমাদের শাস্ত্র এমন অনুদার যে, কয়েকটি দেবার্চনাতেও নারীদের শাস্ত্রসম্মত অধিকার নেই, যদিও স্ত্রীরূপে তিনি স্বামীর সহধর্মিনী।

* * *

এবার, এই বিষয়ে আইন কি বলে, সেটি বিবেচনা করা যাক। পূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি, আইনকেও যুগ অনুযায়ী চলতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে শাস্ত্রের নির্দেশের বিরুদ্ধেও কয়েকটি ক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপ ঘটেছে।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য, কন্যাসন্তানকে হিন্দুশাস্ত্র বংশধররূপে স্বীকৃতি না দিলেও, ইদানীংকালে আইনের দ্বারা কন্যা সন্তানকে পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, যা নাকি আগে ছিল না। অবশ্য "বংশধর" আর "উত্তরাধিকারী"র মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। যেমন স্ত্রী তাঁর স্বামীর উত্তরাধিকারিণী, কিন্তু বংশধর নন। আবার পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের মৃত্যু হ'লে, সেই মৃত পুত্রের সন্তানগণ বংশধর হয়েও 'উত্তরাধিকার' থেকে আগে বঞ্চিত হতেন। এইভাবে হিন্দুশাস্ত্রের নানা জটিল সমস্যা থেকে

আইন এই ধর্মকে রক্ষা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শাস্ত্রবিধানের অপব্যাখ্যার ফলে, পূর্বে জীবন্ত হিন্দুনারীকে মৃত স্বামীর চিতায় "সতী"রূপে বলপূর্বক পুড়িয়ে মারা হোত ; কিন্তু হৃদয়বান, মহান সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আইনের দ্বারা সেই পৈশাচিক ক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে। আবার শাস্ত্রানুযায়ী অকাল বিধবা নারীর বা কোন বিধবা নারীরই পুনরায় বিবাহের অধিকার ছিল না ; কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়, দয়ার সাগর, পরদুঃখে কাতর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু সংগ্রামের পর, "বিধবা-বিবাহ" আইনও চালু হয়েছে। শাস্ত্রানুযায়ী একজন পুরুষ বহু নারীকে বিবাহের অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুদের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা তা-ও বন্ধ করা হয়েছে। নারী অত্যাচারিতা হলেও, 'পতি পরম গুরু' রূপে স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার শাস্ত্রে ছিল না ; বিবাহের পর থেকেই স্বামীর কাছে স্ত্রী 'চিরদাসী' বা 'ক্রীতদাসী' হয়ে থাকতেন। বর্তমান 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' আইনে, স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুকূলেও তা প্রযোজ্য। গৌরীদানের অছিলায় পূর্বে শাস্ত্র-সম্মত ভাবে নাবালিকার বিবাহের যে প্রথা ছিল, সেই বিধানকেও আইনের দ্বারা রুখে দেওয়া হয়েছে। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে, যার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।

সুতরাং দেখা যায়, এমনিভাবেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা বা অপপ্রয়োগ করে যে সব বিধান আগে প্রচলিত ছিল, যুগের চাহিদা অনুযায়ী বারে বারে আইনের দ্বারা তার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং শাস্ত্র নানা বিধান দিলেও, আইন-ই শেষ কথা বলে—অর্থাৎ শাস্ত্রের ওপরেও আইন-ই প্রধান, অবশ্য কেবলমাত্র ব্যবহারিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে।

পিতামাতার সন্তান হয়েও কন্যাটি তাঁর পিতামাতার বংশধর নয়, কেবলমাত্র আইনের বলে উত্তরাধিকারিণী—এটি কন্যা সন্তানের প্রতি পরোক্ষ অপমান ও হীনমন্যতার সহায়ক। দুঃখের বিষয়, পণ-প্রথা আইনসম্মতভাবে শাস্তিমূলক অপরাধ হলেও এবং সমাজের কিছু হৃদয়বান ব্যক্তি এই পণ প্রথার বিরোধী হলেও, চতুরতার সঙ্গে গোপনে পণ প্রথার ঝোঁক এখনও বিদ্যমান থাকায়, পিতামাতার কাছে বা সমাজের কাছেও কন্যাসন্তান খুবই হেয়রূপে বা বোঝারূপে গণ্য হয়। এটিও কন্যাসন্তানের প্রতি এক নির্মম অবিচার। যাইহোক, কন্যাসন্তান জন্মসূত্রে বংশধর নয়, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারিণী—এই বিসদৃশ এবং বিতর্কিত বিষয়ের চুলচেরা বিচার করার সুযোগ এখানে নেই। তবে এইটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, শাস্ত্রে নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করা হলেও, আইন অন্ততঃ নারীকে উত্তরাধিকারিণী রূপে স্বীকার ক'রে শাস্ত্রের প্রাচীন বিধানকে বন্ধ করেছে, যদিও সরাসরি 'বংশধর' কথাটি ব্যবহৃত হয়নি।

* * *

শাস্ত্র ও আইনের ঊর্ধে এবার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়টি দেখা যাক। বিজ্ঞানের বিচারে, পিতামাতার রক্তের সম্পর্কে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন প্যার্থক্য থাকেনা।

সংক্ষেপে বিজ্ঞান বলে, পিতা ও মাতার শরীরের 'স্পার্ম' ও 'ওভামের' মিলনের ফলেই নতুন জীবনের আরম্ভ হয়। স্ব-প্রজননশীল যে অংশ মানুষের বংশগত বৈশিষ্ট্যাবলী বহন করে, সেই ক্রোমোজোমের অবিচ্ছিন্ন অংশ 'জিন' পুরুষানুক্রমে পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের ধারক ও বাহক। এমনকি, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের মধ্যে তার প্রভাব সঞ্চারিত হয় এবং তাতে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য আনেনা। কয়েকটি বংশগত ব্যাধিও পুত্র ও কন্যাদের বা তাদের সন্তানদের রেহাই দেয় না।

এই বংশপ্রবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্বপুরুষের রক্তের ধারার সঙ্গে বংশের পরবর্তী সন্তানগণ—কি পুরুষ, কি নারী—সেই বংশের ধারা প্রাপ্ত হয়। তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেও বংশের একটি মূলগত ঐক্য থাকে, যদিও মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটে।

আবার, শুধুমাত্র পিতামাতার কাছ থেকেই সন্তান বংশের ধারা লাভ করেনা। সে তার পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, প্রমাতামহ-প্রমাতামহী প্রভৃতি ঊর্ধতন পুরুষ থেকেও বংশের উত্তরাধিকার পায়। শ্রেষ্ঠ পিতা-মাতার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সন্তান এবং নিকৃষ্ট পিতামাতার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সন্তানলাভের আংশিক কারণ,—পূর্বপুরুষ থেকে আগত বংশগতির প্রভাব। এই প্রভাব থেকে পুত্রসন্তান বা কন্যাসন্তান কেউই বাদ যায় না। দৈহিক এবং মানসিক —উভয় ক্ষেত্রেই এই বংশানুক্রমিক ধারা বজায় থাকে। রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে যমজ সন্তান পরস্পরের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। যমজ ভ্রাতাভগ্নীদের ক্ষেত্রেও রক্তের সম্পর্কের কোন পার্থক্য না থাকায়, পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিকৃষ্ট করা যায় না। যে জঠরে পুত্রের স্থান, সেই জঠরেই কন্যার স্থান—প্রাকৃতিক নিয়মে কন্যার জন্য মাতার পৃথক জঠর সৃষ্টি হয় না। আবার, নারীর মধ্যে পুরুষত্ব এবং পুরুষের মধ্যে নারীত্ব বিদ্যমান থাকায়, পুত্র ও কন্যা উভয়ের মধ্যেই মাতা ও পিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যদিও পুরুষ ও নারী দুটি পৃথক লিঙ্গ, তবুও উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বস্তুটি সমানভাবে বিরাজমান থাকায়, উভয়ের মধ্যে লিঙ্গহীন সত্তাটি অভেদ। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্তমানে পুত্রকে কন্যা এবং কন্যাকে পুত্ররূপেও পরিবর্তন করা যায়।)

সুতরাং, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রক্তের সম্পর্কে পুত্র ও কন্যা—দুজনেই একই বংশজাত এবং দুজনেই বংশের ধারক। এক্ষেত্রে শাস্ত্র বা আইন কন্যাকে সামাজিক

ক্ষেত্রে বংশধর না বললেও, বৈজ্ঞানিক বিচারে পুত্র এবং কন্যা সেই বংশের সন্তানরূপে রক্তের সম্পর্কে মনুষ্যসমাজের কাছে সমান।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাজচন্দ্র দাস ও রাণী রাসমণির কন্যাগণ বিজ্ঞানের যুক্তি ও প্রমাণে জগতের কাছে তাঁদের বংশজাত সন্তান হিসাবে বংশের ধারক বা বংশধর, যদিও আমাদের শাস্ত্রীয় সমাজের কাছে নয়। তবে সেই কন্যাগণের সন্তান সন্ততি তাঁদের নিজ নিজ পিতামাতার পরিচয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ বংশধর হলেও, এই গ্রন্থে রাণী রাসমণি দেবীর দৌহিত্র বংশীয়দের উত্তরাধিকার সূত্রে রাণীমার বংশধর রূপেই গণ্য করা হয়েছে।

হিন্দুশাস্ত্রেও দৌহিত্র তাঁর মাতামহ-মাতামহীর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী।

॥ ২৯ ॥

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি ও জামাতা শ্রীরামচন্দ্র দাস

রাজচন্দ্র দাস ও রাসমণি দেবীর প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম—শ্রীমতী পদ্মমণি। কলকাতার জানবাজারের পিত্রালয়ে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর (১২১৩ বঙ্গাব্দের ২১শে আশ্বিন) তাঁর জন্ম হয়। প্রথম সন্তান হিসাবে শৈশবে শ্রীমতী পদ্মমণি পিতামাতার যথেষ্ঠ স্নেহলাভ ক'রেছিলেন এবং মহাধুমধামের সঙ্গে তাঁর নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হয়েছিল। বাড়িতে থেকেই তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সিঁথিগ্রাম নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র দাসের সঙ্গে ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে (১২২৪ বঙ্গাব্দে) শ্রীমতী পদ্মমণির বিবাহ হয়। রামচন্দ্র দাস শ্রীমতী পদ্মমণির চাইতে বয়সে মাত্র ২ দিনের বড় ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বংশ মাহিষ্য-কুলীন হওয়ায়, রাসমণি দেবী বয়সের এই সামান্য তফাৎ সত্বেও, এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের রামচন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ জামাতারূপে নির্বাচন করেন। জ্যেষ্ঠাকন্যার জামাতারূপে রামচন্দ্র শ্বশুরালয়ে 'বড়বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। মাতা রাসমণি দেবীর মত শ্রীমতী পদ্মমণিও নির্ভীক চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধিমত্তার ওপরেই বেশী আস্থা রাখতেন। তিনি নিজে যেটি সঠিক বিবেচনা করতেন, সেই মতই কাজ করতেন। ফলে, রাসমণি দেবীর অবর্তমানে, তাঁর নিজের ভগ্নী বা অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনিবনা ছিল না এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে শেষ জীবনে তিনি বৈষয়িক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হ'য়ে পড়েছিলেন।

* * *

শ্রীমতী পদ্মমণির স্বামী রামচন্দ্র দাসের জন্ম ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১২১৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন) উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সিঁথি গ্রামের এক কৃষিজীবি কুলীন মাহিষ্য পরিবারে। এঁদের বংশের জনৈক উর্ধতন পুরুষ শ্রীশিবরাম দাস কোন সূত্রে 'আটা' উপাধিতে পরিচিত হওয়ায়, রামচন্দ্র দাসও প্রতিবেশীদের কাছে 'আটা'-উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পদবী ছিল দাস। তাঁর জন্মস্থানের একাংশকে এখনও 'আটাপাড়া' বলা হয় এবং বর্তমানে সিঁথিতে যেখানে 'সিঁথি শিক্ষায়তন' নামক বিদ্যালয়টি অবস্থিত, সেখানেই ছিল রামচন্দ্র দাসের আদি বাড়ি। 'আটা' উপাধিতে এখনও সিঁথিতে কেউ কেউ বাস করেন, তবে রামচন্দ্রের বংশধরগণ কেউই আর 'আটা' উপাধি ব্যবহার করেন না; সকলেই 'দাস' পদবীতেই পরিচিত। রামচন্দ্র দাসের বংশধরগণ বর্তমানে কেউই আর সিঁথির আটাপাড়ায় বাস করেন না।

কথিত আছে, হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের জমিদারপুত্র শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর খুল্লতাত এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও বৈষ্ণব শ্রীহিরণ্য দাস ছিলেন রামচন্দ্র দাসের পূর্বপুরুষ। পরবর্তীকালে এই বংশ হুগলী থেকে শান্তিপুর-নদীয়া এবং শান্তিপুর থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন; অতঃপর বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ ক'রে স্থায়ীভাবে সিঁথিতে বসবাস শুরু করেন। রামচন্দ্র দাস সেই বৈষ্ণব ভক্ত পরিবাবেরই সন্তান।

* * *

রামচন্দ্রের পিতার নাম নীলমণি দাস এবং পিতামহের নাম দাতারাম দাস। দাতারাম স্বভাবতঃ ধর্মভীরু, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কৃষিকার্যে বিলক্ষণ কুশল ছিলেন। দানশীলতার জন্যও তাঁর দাতারাম নাম ছিল সার্থক।

রামচন্দ্রের পিতা নীলমণি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। নিজ প্রচেষ্টায় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি প্রথমাবস্থায় বিলাতী মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন; পরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মল্লাহাটী নামক গ্রামের নীলকুঠিতে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় নীলমণি প্রচুর অর্থ উপার্জন করায়, বাড়িতে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তন মাধ্যমে পূজা উপলক্ষে অকাতরে অর্থ বিতরণ করতেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে নীলমণি হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন।

নীলমণির ৫টি সন্তানের মধ্যে ৪টি পুত্র এবং ১টি কন্যা। পুত্রগণ, যথাক্রমে—রাধামোহন (প্রথম), রামচন্দ্র (দ্বিতীয়), ঈশ্বরচন্দ্র (তৃতীয়) এবং ভোলানাথ (কনিষ্ঠ)।

নীলমণির দ্বিতীয়পুত্র রামচন্দ্র সর্বদাই বিনীত, নম্র, বিলাসশূণ্য ও সর্বোপরি কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালায় গুরু মশায়ের কাছে উত্তম-রূপে বাংলা শেখেন। কিন্তু মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায়,

সাময়িকভাবে তাঁর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হয়। অতঃপর তাঁর বিধবা মাতা পুত্রদের নিয়ে কলকাতার বহুবাজারে সহোদর ভ্রাতা রামনারায়ণ দাসের মলঙ্গা লেনের বাড়িতে সাময়িকভাবে বাস করেন। এই সময় রামচন্দ্র প্রথমে 'বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন্' নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজীভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে বাড়িতে শ্রীযুক্ত বদন মাস্টারের তত্ত্বাবধানে ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর অভিনিবেশ সহকারে ইংরাজী শেখার পর, ইংরাজী ভাষায় লেখা ও কথা বলায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রথমে রামচন্দ্র টালা কোম্পানী ও পামর কোম্পানীর অফিসে 'এপ্রেন্টিশ' হিসাবে যোগ দেন। কয়েক বছর এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, নিজ দক্ষতায় তিনি একটিতে 'কার্যদক্ষ' হন এবং পরে জেনারেল ট্রেজারীর রেভিনিউ এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে 'রাইটার'-পদে নিযুক্ত হন ; পরে সে কাজ থেকেও তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী পদ্মমণির সঙ্গে যখন রামচন্দ্র দাসের বিবাহ হয়, তখন রামচন্দ্রের অভিভাবকরূপে তাঁর মাতুল রামনারায়ণ দাস মহাসমারোহে এই বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ধনশালী শ্বশুর রাজচন্দ্র দাসও তাঁর প্রথমা কন্যার বিবাহে বিপুল আয়োজনের কোন ত্রুটী রাখেননি। জামাতা রামচন্দ্র আক্ষরিক অর্থে নিজে জমিদার না হলেও, জমিদার সদৃশ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

এত সম্পদের অধিকারী হয়েও, রামচন্দ্র ধার্মিক ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। "রামচন্দ্র দাসের জীবন চরিত"-গ্রন্থে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) জীবনীকার শ্রীলালমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় উল্লেখ করেছেন ঃ—

"রামচন্দ্র দাস, তরুণ বয়সে ধনার্জনক্ষম ও সবল শরীরী হইয়াও মাদক ও ব্যভিচারাদি ইন্দ্রিয়—সেবারূপ পশুবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া সৎ-পথের পান্থ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি পুণ্যাত্মা সাধুগণের উচ্চাসনে আসীন হইয়া ধর্ম-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।"

"একদা ইন্দ্রিয়-শাস্তা রামচন্দ্র দাস যৌবনাবস্থায় শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ করিয়া প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে এক পান্থ-নিবাসে অবস্থিতি করেন। কার্যগতিকে তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিলে পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষের এক নবীনা রমণী, তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া তাঁহার আহারাদির সেবা করিতে লাগিল। পরে যখন ঐ রমণী তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, তখন তিনি সেই যুবতীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া, তাঁহাকে বস্ত্রাদি দান করিয়া প্রতিগমন করিলেন। (কলিকাতা গোয়ালটুলী নিবাসী শ্রীদ্বারকানাথ হোড় দ্বারা অবগত)।"

"অপিচ, তাঁহাদের মকিমপুর নামক জমিদারীতে মোকর্দমা উপলক্ষে তাঁহার ৩য় শ্যালীপতির (শ্রীমথুরামোহন বিশ্বাস) সহিত উপস্থিত হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহাদের পরস্পর মনোমিলন ছিলনা, এই জন্যে কতকগুলি

তোষামোদেরা তাঁহার তৃতীয় শ্যালীপতির নিকট তাঁহার দোষারোপ করিয়া কহিল, 'বড়বাবু অর্থাৎ রামচন্দ্রবাবু অমুকের কন্যার সহিত আসক্ত হইয়াছেন' ইত্যাদি। তোষামোদেরা এই প্রকার তাঁহার নিকট দোষারোপ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে তাহাদের সমক্ষে কহিলেন, 'তোমরা অন্যান্য বিষয় যাহা বলিলে, তাহা শুনিলাম। কিন্তু বড়বাবু যে পরনারীতে আসক্ত হইয়াছেন, একথা তোমরা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া শপথ করিলেও বিশ্বাস করিনা'। (প্রাচীন আমলাদের দ্বারা জ্ঞাত)"।

* * *

১২৪৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে) রামচন্দ্রের শ্বশুর, তথা রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস ৪৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করায়, রাসমণি দেবী তৎকালীন আইন বলে মৃত স্বামীর সমুদয় সম্পত্তির একাই উত্তরাধিকারিণী হন। (বর্তমান আইনে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা— সকলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন)

রামচন্দ্র বেশীর ভাগ সময়েই নিজ বাড়িতে বাস করতেন এবং প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে গিয়েও অবস্থান করতেন। এই সময় সকল বিষয়েই তিনি বিধবা শাশুড়ী রাসমণি দেবীকে সৎ পরামর্শ দিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন রাসমণি দেবীর সম্পত্তির 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন রামচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ও বিশিষ্ট নামী ব্যক্তি মতিলাল শীলের সঙ্গে পরামর্শ করে রামচন্দ্র কৌশলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আকাঙ্খা পূরণে বিঘ্ন ঘটান। অতঃপর, রাসমণি দেবীর তিন জামাতা—রামচন্দ্র দাস, প্যারীমোহন চৌধুরী ও মথুরমোহন বিশ্বাস একত্রে সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সকলেই শ্বশুরালয়ে বাস করেছিলেন।

* * *

পূর্বে উল্লিখিত "রামচন্দ্র দাসের জীবন চরিত-"গ্রন্থে রামচন্দ্রের সদ্‌গুণ রাশি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—

"রামচন্দ্র দাস, বাল্যকালাবধিই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, এবং এক্ষণে ও পরলোক গমন পর্যন্ত, তাঁহার কৃষ্ণ-মন্ত্রে একান্ত দৃঢ় ভক্তি ছিল; তাঁহার বাল্যকালে যেরূপ নিরহঙ্কার, শান্ত-স্বভাবাদি গুণ ছিল, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তদ্রূপ স্বভাব, নম্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও ধার্মিকতা ছিল। কোন অবস্থাতেই তিনি সদ্‌-গুণের ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন নাই। তিনি আপন শাশুড়ী রাসমণি দাসীকে ধর্মকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। প্রথমতঃ তিনি মহাসমারোহে রাসোৎসব সম্পাদন করেন।"

"দ্বিতীয়তঃ রৌপ্যরথ নির্মাণ; এই রথ নির্মাণে তাঁহার অধ্যবসায় দৃষ্ট হয়; রাসমণি দাসী, রথযাত্রার প্রায় ১ মাস পূর্বে রথ নির্মাণে সম্মতি প্রদান করেন।

এত অল্পকালের মধ্যে রৌপ্যরথ হওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু তিনি একাগ্রমনে রৌপ্যরথ নির্মাণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ধর্মকার্যে ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন না, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন নিরুৎসাহ না হইয়া টাকশাল, হেমিলটন ও লোটিপিটর কোম্পানীর নিকট রূপার পাত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দিবসের স্বল্পতা প্রযুক্ত তাহারা রূপার পাত প্রস্তুত করিতে অস্বীকার করিল।"

"হেমিলটন প্রভৃতি ধনাঢ্য বণিকেরা রূপার পাত প্রস্তুত করিতে অস্বীকৃত হইলে, জনসাধারণ চলচ্চিত্ত ও রৌপ্যরথ নির্মাণ না হওনের আশঙ্কা করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল, 'রামবাবু এ রূপার রথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না'। অন্যেরা কহিল, 'এ বিষয়ে রামচন্দ্রবাবুর হস্তক্ষেপ করা ভাল হয় নাই। না বুঝিয়া কাজ করিতে গেলেই এরূপ বিপাকে পড়িতে ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়।"

"লোকদিগের এবম্বিধবাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও, তিনি অধীর বা হতোৎসাহী না হইয়া বরং তাঁহার ধর্ম বিষয়ের অধ্যবসায়গুণ আরও তেজস্বী হইতে লাগিল এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক তৎকার্য্য সাধনের উদ্ভাবন ভাবনা করিতে লাগিলেন।..."

"অনন্তর তিনি স্বগ্রাম ও ভবানীপুর হইতে কর্মকার আনাইয়া রথযাত্রার পূর্বেই রৌপ্যরথ নির্মাণ করিলেন। রৌপ্যরথ নির্মিত হইলে অসূয়ক প্রভৃতিরা (অন্তর কষ্ট পাইলেও) মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ রথ প্রতিষ্ঠা অতি সমারোহে সম্পাদন হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ রথ প্রবর্ত্তমান থাকিয়া রথ প্রতিষ্ঠাতার অধ্যবসায় বিকীর্ণ করিতেছে।"

"তৃতীয়তঃ, তাঁহার শাশুড়ী রাসমণি দাসী, কলকাতার ৩ ক্রোশ উত্তর, গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে দেবালয়াদি যে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই কীর্ত্তির ভিত্তিমূল প্রথমতঃ ইনিই করেন, তৎপরে অন্যেরা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসীর ঐ কীর্ত্তি এক্ষণেও বিদ্যমান রহিয়াছে।..."

"তিনি (রাসমণি) দেবকীর্ত্ত্যাদি অমিত ব্যয়শালিতাতে সাধারণের নিকট যশস্বিনী হইয়া ১২৬৭ সালের ফাল্গুন মাসে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎকন্যাদ্বয় তাঁহার ধনের অধিকারী হন এবং সমস্ত ভার আপন আপন স্বামীর উপর অর্পণ করিলেন।"

"রামচন্দ্র দাস ক্রমান্বয়ে ১৪ বৎসর তদ্ধন উপভোগ এবং সেই ঐশ্বর্য্যের উপর আধিপত্য করেন। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য কদাচ তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারে নাই; আতরুণ প্রৌঢ় পর্য্যন্ত, বিলাসশূন্য, ধীরপ্রকৃতি, নিরহঙ্কারী, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন।...প্রতিদিনই ধর্ম কার্য্যের নিমিত্ত কিয়ৎ সময় ক্ষেপণ করিতেন, কদাচ তাহাতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।"

"তাঁহার দাতৃত্ব শক্তিও অসামান্য! এক্ষণকার আঢ্যগণের ন্যায় যশঃ

আকাঙ্ক্ষায় বা সম্ভ্রম লাভার্থে কাহাকেও অর্থদান করিতেন না। তিনি এরূপ কৌশলে দান করিতেন, অন্য কোন ব্যক্তি জানিতে পারিতেন না। গোপনে দান করাই তাঁহার স্বভাব ছিল।"

"তিনি গোপনে কয়েক ব্যক্তিকে সহস্রমুদ্রারও অধিক দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই কলিকাতায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী অনেক ধনাঢ্যগণই আছেন, কিন্তু কোন ব্যক্তিই বেনেটোলাস্থ শ্রীশ্রী৺সোনার গৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমন্দির সংস্কারার্থে অধিক দান করিতে সমর্থ হন নাই। রামচন্দ্র বাবু সেই শ্রীমন্দির নির্মাণের প্রায় সমুদায় ব্যয় আনুকুল্য করিয়াছিলেন এবং যে নবদ্বীপ বঙ্গভূমির বিখ্যাত স্থান ও যে নবদ্বীপে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গপ্রভুর আবির্ভাব হয়, সেই নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গন দেবালয় শ্রীশ্রী৺গঙ্গায় নিপতিত হয়, কিন্তু কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিই কটাক্ষপাত করেন নাই; ইঁনি শ্রুতিমাত্রই সেই বিখ্যাত শ্রীবাস অঙ্গন দেবালয় পুনর্নির্মাণার্থে ১000 সহস্র মুদ্রা এবং মহোৎসবের ব্যয়ের ২৫0 শত টাকা গোপনে দান করেন।"

"তাঁহার ইষ্টদেবের আলয় গোস্বামী বা গোসাই মালপাড়া; তথায় শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল ঠাকুরের শ্রীমন্দির এখনও বিরাজমান করিতেছে। তাঁদের ইষ্টদেব (গোস্বামী মহাশয়েরা ঐ ঠাকুরের সেবাকারী) শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল ঠাকুরের রৌপ্যনির্মিত চৌকী প্রস্তুত করিতে অর্থদান করেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়েরা তাঁহার অনভিমতে ঐ চৌকীতে তাঁহার নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।"

"একদা তাঁহার নিকট এক ব্রাহ্মণ বার্ষিক লইতে উপস্থিত হইয়া কথাচ্ছলে আপন কন্যাদায় অবগত করিলেন; পরে যখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসেন, এমন সময়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে নির্জনে ডাকিয়া একটা কাগজ মোড়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, আপনি এই কাগজ সাবধানে লইয়া যাইবেন, পরে আপনার বাটী গিয়ে খুলিয়া দেখিবেন।' কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ কাগজ মোড়া পাইয়া তাহা দেখিবার জন্যে ব্যগ্র চিত্ত হইয়া পথিমধ্যেই খুলিয়া দেখেন যে, এক কেতা ৫00 টাকার নোট। (ঐ ব্রাহ্মণ নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।"

"রামচন্দ্র দাস এই অতুল ঐশ্বর্য্যের একাধিপত্য করিয়াও কোন প্রজা বা আমলাগণের প্রতি কখনই অশ্লীল বা কটু বাক্য প্রয়োগ করেন নাই; এবং কখনও প্রজাগণের বা আমলাগণের উৎপীড়নাদি নির্দয়াচরণ না করিয়া সতত দয়া ও স্নেহভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়াশীলতা গুণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার জন্য অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।"

"তিনি কখনই দম্ভপ্রকাশ করিতেন না, উদার স্বভাব ও বদান্য ছিলেন। তিনি সম্পৎকালেও আপনার প্রথমাবস্থা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্মের

দ্বেষ করিতেন না ; সর্বধর্মাবলম্বীরা তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। লোকদিগকে পরিতৃপ্তে ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন, এই জন্যে তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'উদর পূর্ণ হইলে যেরূপ খাদ্যদ্রব্যে প্রার্থনাশূন্য হয়, সেরূপ অন্য কোন বস্তুতে প্রার্থনাহীন হয়না। অতএব লোকদিগকে পরিতোষ-'রূপে ভোজন করানই আমোদের বিষয়। তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি কিছু লাভের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া যাইত, প্রায়ই তাহারা বিমুখ হইত না। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কোন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁহার নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করিতে গেলে, তাঁহার সেই দ্রব্যের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার কিছু কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতেন ; অন্যেরা তাঁহাকে সেই বস্তু ক্রয়ের অন্যাবশ্যক জানাইলে পশ্চাৎ তাহাদিগকে কহিতেন, 'ঐ ব্যক্তি কিছু পাইব প্রত্যাশা করিয়া এখানে আসিয়াছে। ইহাকে নিতান্ত বিমুখ করিলে মনের সঙ্কোচ ব্যতিরিক্ত পরিতোষ জন্মায় না।"

"রামচন্দ্র দাস এইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণতার সহিত ক্রমান্বয়ে ১৪ বৎসর কাল অতুল সম্পদের যথার্থ সুখভাগী হইয়া তিন পুত্র, পাঁচ পৌত্র, পৌত্রী এবং এক দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও সহধর্মিনী রাখিয়া ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে বিশূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগামী হন।"

* * *

উক্ত বিশদ বিবরণের মাধ্যমে রাসমণি দেবীর জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চারিত্রিক চিত্রের দর্শন পাওয়া যায়, যা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত!

কিন্তু এই প্রসঙ্গে খুবই দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, এমন সদগুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করে রাসমণি দেবীর কোন বিশেষ অনুগত, স্বার্থান্বেষী ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি রাসমণি দেবীকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করেন এবং সম্পত্তির টাকা তছরূপ বা হিসাবে গরমিল প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর অভিযোগে জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্রকে দায়ী করেন।

প্রবাদ আছে যে, মুনিরও মতিভ্রম হয়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। উদভ্রান্তা রাসমণি দেবী সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণিসহ সন্তানতুল্য জামাতা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে (বর্তমানে হাইকোর্ট) একটি মোকদ্দমা রুজু করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সুপ্রীম কোর্টের সেই মোকদ্দমায় রাসমণি দেবীর পক্ষে এটর্নী ছিলেন কলকাতার ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীটের উইলিয়াম টমাস ডেনম্যান। এই মামলায় রামচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে যে জোরালো যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দাখিল করেছিলেন, তার ফলে রামচন্দ্রকে দোষী প্রমাণ করা খুবই শক্ত ছিল। অতঃপর এই চক্রান্তের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সর্বদিক বিবেচনা করে তীক্ষ্ণধী রাসমণি দেবী পরবর্তীকালে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী সেই মামলা প্রত্যাহার করেন এবং ভবিষ্যতে আর যাতে কোন ঝামেলার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি 'সোলেনামায়' দু-পক্ষই সই করেন।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেও অনুরূপ অভিযোগ এনে রাসমণি দেবী তাঁর অতি বিশ্বস্ত অপর জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন এবং পরে সেটিও প্রত্যাহৃত হয়েছিল।)

অবশ্য জীবনের শেষাবস্থায় রাসমণি দেবী রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই মামলার পর থেকেই উপলব্ধি করছিলেন যে, বিষয়াসক্তির ফলেই এমন অঘটন ঘটে। তাই ক্রমশঃ তিনি বিষয়-সম্পত্তি হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মামলা মিটে যাওয়ার দু-বছরের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি দেবোত্তর-দলিল প্রস্তুত করান।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে (১২৮১ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ) রাসমণি দেবীর জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর ৪ বছর বাদেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর (১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন) রাসমণি দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি বৈধব্য অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

* * *

রামচন্দ্র দাস ও শ্রীমতী পদ্মমণির মোট ৭টি সন্তান। তাঁদের নাম, যথাক্রমে ঃ—মহেন্দ্রনাথ (পুত্র), গণেশচন্দ্র (পুত্র), সৌদামিনী (কন্যা), সুভদ্রা (কন্যা), বলরাম (পুত্র), কালী (কন্যা) এবং সীতানাথ (পুত্র)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হওয়ায়, গণেশচন্দ্রকেই জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে গণ্য করা হয়। জীবিত তিন দৌহিত্রই রাসমণি দেবীর সুবিশাল সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হয়েছিলেন।

* * *

শ্রীমতী পদ্মমণির জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশচন্দ্রের জন্ম ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর (১২৩৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অঘ্রাণ) এবং মৃত্যু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে (১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে)। গণেশচন্দ্রের তিনটি বিবাহ এবং মোট সন্তান ৬ টি। (**বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য**)। গণেশচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নাম গোপালকৃষ্ণ এবং পুত্রবধূর নাম গিরিবালা। গণেশচন্দ্রের পুত্র-বংশ বর্তমানে লুপ্ত। গণেশচন্দ্রের পুত্রবধূ শ্রীমতী গিরিবালা দয়াবতী, দানশীলা ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা মহিলা ছিলেন। রাসমণি দেবীর দক্ষিণেশ্বরের আদর্শে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার আগড়পাড়ায় গঙ্গার তীরে একটি দেবালয় নির্মাণ করিয়ে রাধাগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ এবং ছয়টি শিবমন্দির ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। রাসমণি দেবীর ন্যায় তিনিও বহু তীর্থক্ষেত্র পর্যটন করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আগড়পাড়ার মন্দিরটি ব্যারাকপুরের ভোলাগিরি আশ্রমের তত্ত্বাবধানে আছে।

* * *

শ্রীমতী পদ্মমণির মধ্যম পুত্র বলরামের জন্ম ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী (১২৫১ বঙ্গাব্দের ২১শে পৌষ) এবং মৃত্যু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২ রা মে, (১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ)। বলরামের মোট ৬ টি সন্তান। (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য)। বলরাম বিবিধ সদগুণের জন্য দেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি কলকাতার ডভটন্ কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজে সুনিপুণ পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণের দরুন তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবরূপে নিজের জীবন গঠন করেছিলেন।

বলরামের জীবদ্দশাতেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দুই পুত্র—শিবকৃষ্ণ ও শ্যামলাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন পর পর পরলোক গমন করেন। তাঁরা দুজনেই বি. এল. ছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে যোগেন্দ্রমোহন ও অজিতনাথ জীবিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন **Free Mason**-য়ের সভ্য, **Bengal Land Holders' Association**-য়ের সভ্য এবং উত্তরবঙ্গ জমিদার সভার সদস্য ছিলেন। দিল্লীর রাজদরবারে তিনি সরকার পক্ষ থেকে নিমন্ত্রিতও হয়েছিলেন। কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায়, তাঁর এণ্টালীর নিজস্ব বাড়িতেই তিনি প্রথম নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় স্থানাভাবে সেটি কাছেই স্থানান্তরিত হয়—নাম 'এণ্টালী বালিকা বিদ্যালয়'। যোগেন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র আশুতোষ দাস, বি. এল, মহাশয়ও হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট ছিলেন এবং এখনও জীবিত আছেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনিই এই গ্রন্থ প্রণয়নে এই লেখককে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রেছেন।)

অজিতনাথ দাসও বলরামের বংশের একজন কৃতবিদ্য সন্তান। তিনি জে. পি.; এম-আর-এস (লণ্ডন); এফ জেড্, এস (লণ্ডন) ছিলেন এবং 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দেশের বহু সদনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করে গেছেন এবং পিতা বলরাম দাসের পালায় আইনের সাহায্যে তাঁরা দুই ভাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 'বলিদান'-প্রথা বন্ধ করে গেছেন। তিনি কলকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, ডেপুটী করোনার, রেফিউজ ও অপরাপর দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের গভর্ণর, ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের পরিদর্শক-সমিতি ও আলীপুর চিড়িয়াখানার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর তিনপুত্র—কৃষ্ণকিশোর, কুঞ্জকিশোর ও কমলকুমার—প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

* * *

শ্রীমতী পদ্মমণির কনিষ্ঠ পুত্র সীতানাথের জন্ম ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ঠা অক্টোবর (১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন) এবং মৃত্যু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ (১৩০১ বঙ্গাব্দে)। সীতানাথের একটি পুত্র—নাম, অমৃতনাথ এবং ৪টি কন্যা। (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য)। সীতানাথও ধর্মনিষ্ঠা এবং দয়াদাক্ষিণ্যগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অমৃতনাথও সহৃদয়তা, পরোপকার প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জমিদারী অঞ্চলের প্রজাগণের হিতার্থে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। পিতা সীতানাথের মৃত্যুতে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অমৃতনাথ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় দশ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রত্যেককে দু'-টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল এবং পঞ্চাশ হাজার কাঙালীকে পরিতোষ সহকারে ভূরি ভোজন করানো হয়েছিল। এই উপলক্ষে কয়েকদিন কলকাতার জানবাজারের রাস্তায় লোক ও যানবাহনের চলাচল বন্ধ হয় এবং 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে সর্বত্র মুখরিত হয়। তৎকালে বিপুল সমারোহপূর্ণ এরূপ 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ সচরাচর কেউ দেখেননি। পিতা সীতানাথের নামে তিনি তাঁর গোপালগঞ্জ জমিদারিতে 'সীতানাথ দাস হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। বহু জনহিতৈষণামূলক কাজের দরুন সরকার অমৃতনাথকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও, তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন এবং শেষ জীবন অবধি লোকহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

শ্রীমতী পদ্মমণির বংশধরগণের একাংশ জানবাজারে রাণী রাসমণির প্রাসাদে বাস করেন ; এই অংশগুলির ঠিকানা—১৯, ২০, ২০এ ও ২০বি, এস, এন, ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩। এঁদের অংশের চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীমতী পদ্মমণির বংশধরগণ পৃথকভাবে দুর্গা পূজা করেন। রাণী রাসমণির এই প্রাসাদ ছাড়াও শ্রীমতী পদ্মমণির বংশধরগণের অনেকেই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন।

॥ ৩০ ॥

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি ও জামাতা শ্রীরামচন্দ্র দাসের বংশ তালিকা

(প্রপৌত্র--প্রপৌত্রী অবধি)

শ্রীমতী পদ্মমণি--শ্রীরামচন্দ্র দাস

- মহেন্দ্রনাথ (অকালে মৃত)
- গণেশচন্দ্র (অনঙ্গ সুন্দরী) নিঃসন্তান (সৌদামিনী) (ভুবনমোহিনী)
  - (সৌদামিনী)
    - গোপালকৃষ্ণ (গিরিবালা)
      - ১। সন্তোষমোহিনী (সতীশ সরকার)
      - ২। দুর্গেশনন্দিনী (হৃদয়কৃষ্ণ দাস)
      - ৩। বিধুমুখী (ক্ষেত্রমোহন দলুই)
      - ৪। জীবনকানাই—অবিবাহিত
      - ৫। অবিনাশ (তারকবালা)
      - ৬। নৃপেন্দ্রনন্দিনী (হৃষিকেশ বিশ্বাস)
    - কুসুমকুমারী (সুরেশ সরকার)
    - গঙ্গামণি (ক্ষেত্রচন্দ্র দাস)
  - (ভুবনমোহিনী)
    - তারাসুন্দরী (হারাণচন্দ্র সরকার)
    - গজেন্দ্রনন্দিনী (শশীভূষণ মান্না)
    - জ্ঞানদা (হেমচন্দ্র মান্না)
- সৌদামিনী (ভূপালচন্দ্র দাস)
- সুভদ্রা (প্রসন্নকুমার মান্না)
- বলরাম (অপূর্বকুমারী)
  - শিবকৃষ্ণ (মন্মথবালা)
    - ১। হরমনমোহিনী (কিশোরী রায়)
    - ২। বিজয় (বীণাপানি)
    - ৩। রমেন্দ্র (নির্মলনলিনী)
    - ৪। নন্দকিশোর (উর্মিলা)
    - ৫। কুমুদকৃষ্ণ (দুর্গাবতী)
    - ৬। গোপেন্দ্র (সুহাসিনী)
    - ৭। প্রভাবতী (মুরারীমোহন রায়)
  - শ্যামলাল (শরৎশশী)
    - ১। অনঙ্গমঞ্জরী (উমাচরণ দাস)
    - ২। ইন্দুমতী (বৃন্দাবন সরকার)
    - ৩। শৈলেন্দ্রকুমারী—অবিবাহিতা
    - ৪। বিনয়কৃষ্ণ (অন্নপূর্ণা) (ইন্দিরা)
    - ৫। প্রফুল্লকৃষ্ণ (আভাময়ী)
    - ৬। দোলগোবিন্দ (তারাব্রহ্মময়ী)
    - ৭। নিতাই কিশোর—শৈশবে মৃত
  - চঞ্চলা (কিশোরীমোহন মণ্ডল)
  - যোগেন্দ্রমোহন (সরোজিনী)
    - ১। সুধাংশুবালা (প্রভাস মণ্ডল)
    - ২। বনবিহারী—অকালে মৃত
    - ৩। হিমাংশুবালা (যতীন্দ্র মণ্ডল)
    - ৪। আশুতোষ (নির্মলা) (বীণাপানি)
    - ৫। বিভ্রাংশুবালা (সুবোধ দাস)
    - ৬। গৌরীরাণী (পুলিন হাজরা)
    - ৭। লীলাবতী (হীরেন্দ্র মল্লিক)
  - প্রমদা (উপেন্দ্রনাথ দাস)
  - অজিতনাথ (সরসীবালা)
    - ১। কৃষ্ণকিশোর (লাবণ্যপ্রভা)
    - ২। লাবণ্যপ্রভা (প্রতুল মণ্ডল)
    - ৩। কুঞ্জকিশোর (কমলা) (পুষ্পরাণী) (শেফালিকা)
    - ৪। কমলকুমার (বেলাময়ী)
- কালী (কৈলাশচন্দ্র মণ্ডল)

শ্রীমতী পদ্মমণি—শ্রীরামচন্দ্র দাস
সীতানাথ (ক্ষেত্রমণি)
অমৃতনাথ (ননীবালা)
নৃপেন্দ্রনন্দিনী (গোপীকৃষ্ণ মণ্ডল)
সুবেন্দ্রবিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস)
বনবিহারিণী (মন্মথনাথ ভাণ্ডারী)
নবনলিনী (হরিচরণ মণ্ডল)
গৌরহরি শৈশবে মৃত
১। অনিল (যূথিকা)
২। অনিলা (প্রবোধ মণ্ডল)
৩। অতীন্দ্রনাথ (প্রতিভাসুন্দরী) (সুভাষিণী)
৪। সরযূবালা—অবিবাহিতা মৃত
৫। সরসীবালা (রবীন্দ্র সরকার)
৬। অনাদিনাথ (রাণী)
৭। অবনী (মহামায়া)
৮। অলকা (সুনীল বিশ্বাস)

॥ ৩১ ॥

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারী ও জামাতা শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী

রাজচন্দ্র দাস ও রাসমণি দেবীর দ্বিতীয়া কন্যার নাম—শ্রীমতী কুমারী। কলকাতার জানবাজারের পিত্রালয়ে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে (১২১৮ বঙ্গাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে জানবাজারের বাড়িতেই তিনি লেখাপড়া করেন এবং পরম স্নেহে লালিতা পালিতা হন। উপযুক্ত বয়সে রাসমণি দেবী তাঁর বিবাহ দেন। জামাতার নাম—শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী। তাঁর পিতামাতার নাম জানা যায়নি।

শ্রীচৌধুরী তৎকালে তাঁর নিজস্ব কলকাতার বাড়িতে—২৪ নং চৌরঙ্গী রোডে বাস করতেন এবং এখানে বসবাসকালীনই তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী কুমারীর বিবাহ হয়। ঐ বাড়িটি এখনও বিদ্যমান এবং তাঁর বংশধরগণের অধীনে। প্যারীমোহন মাহিষ্য-কুলীন ছিলেন এবং তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপের জন্য রাসমণি দেবী এই সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে শ্রীমতী কুমারীর বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহকালীন প্যারীমোহনের খুলনায় (অধুনা বাংলাদেশ) সোনাবেড়িয়াতে জমিদারি ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক কারণে পরবর্তীকালে রাসমণি দেবী সেটি ক্রয় করেছিলেন এবং পরে ঐ সম্পত্তিই দৌহিত্র যদুনাথকে, তথা প্যারীমোহনের পুত্রকে দান করেছিলেন।

প্যারীমোহনের 'পদবী' কি ছিল জানা যায়না,—তবে কৌলিক উপাধি 'চৌধুরী' হওয়ায়, তাঁর পূর্বপুরুষ যে অতি সম্ভ্রান্ত—বংশোদ্ভূত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৌধুরী' উপাধির পূর্বে তাঁদের আর এক উপাধি ছিল 'খাঁ' এবং তারও পূর্বে 'রায়'।

শ্রীবসন্তকুমার রায় রচিত ও ঢাকা থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "মাহিষ্য বিবৃতি"—গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণের ২১৯-২২২ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গে ঢাকা নগরী থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে বংশাই ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে, বংশাই নদীর পূর্ব তীরে সাভার (বা সম্ভার) অবস্থিত। এই সাভার গ্রামই প্রাচীন সর্বেশ্বর নগরী। কথিত আছে, একদা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর হতে পূর্বদেশে গিয়ে বেশ কিছু অঞ্চল জয় করে রাজা হরিশ্চন্দ্র সাভারে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই মহিষী ছিলেন—কর্ণাবতী ও ফুলবতী। কিন্তু অপুত্রক হওয়ায় রাজা হরিশচন্দ্র তাঁর ভাগিনেয় দামোদর (দামু রাজা) রায়ের হাতে রাজ্যভার দিয়ে প্রব্যজ্যা অবলম্বন করেন। দামোদরের মাতা ছিলেন হরিশ্চন্দ্রের সহোদরা রাজেশ্বরী দেবী। পরবর্তীকালে, অহম ও কোচদের আক্রমণে এই রাজবংশের পতন হয়। দামোদর রায়ের অধস্তন দশম-পুরুষ শিবচন্দ্র রায় বিশেষ দুরবস্থায় পড়েন এবং বহু তীর্থ পর্যটনান্তে তাঁর

দেহত্যাগ হয়। তাঁর অধস্তন একাদশ পুরুষ ছিলেন তরুরাজ খাঁ। ইনি হুগলীর সহকারী ফৌজদার হন। তাঁর ৪ টি পুত্র ছিলেন—শুভরাজ, যুবরাজ, ভাগ্যবন্ত ও বুদ্ধিমন্ত। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার সঙ্গে হুগলীতেই থাকতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা স্বদেশে ফিরে না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই থেকে যান। তাঁদের বংশধরেরা পরে অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা জেলার সোনাবেড়িয়ায় (সোনাবেড়ে) বাস করতে থাকেন এবং সোনাবেড়িয়ার 'চৌধুরী' নামে খ্যাত হন।

রাসমণি দেবীর দ্বিতীয় জামাতা প্যারীমোহন চৌধুরী ছিলেন উক্ত সোনা-বেড়িয়ার চৌধুরী-পরিবারের সন্তান এবং প্রখ্যাত তরুরাজ খাঁয়ের বংশধর। অনেকে অনুমান করেন যে, তরুরাজ খাঁয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বুদ্ধিমন্ত খাঁ পরবর্তী-কালে নবদ্বীপে গিয়ে জমিদারি স্থাপন করেছিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিবাহে যাবতীয় ব্যয় বহন করে মহাসমারোহে তাঁদের বিবাহ দিয়েছিলেন।

* * *

প্যারীমোহন বরাবরই তাঁর কলকাতার চৌরঙ্গী রোডের বাড়িতে বাস করলেও, জানবাজারের শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করতেন। রাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর তিনি জানবাজারেই চলে এসেছিলেন। শ্বশুরালয়ে তিনি 'মেজবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পিতা রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পরের বছরেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (১২৪৪ বঙ্গাব্দে) এবং মাতা রাসমণি দেবীর জীবদ্দশাতেই মাত্র ২৫।২৬ বছর বয়সে শ্রীমতী কুমারীর মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম—যদুনাথ। কিছুকাল পরে বিপত্নীক প্যারীমোহনও দেহত্যাগ করেন।

* * *

শ্রীমতী কুমারীর একমাত্র পুত্র যদুনাথ তাঁর পিতা প্যারীমোহনের মত অপরূপ সুন্দর ছিলেন। রাসমণি দেবীর দৌহিত্ররূপে তিনি মাতামহীর সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হয়েছিলেন। দৌহিত্র সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ছাড়াও, যদুনাথ খুলনা জেলার অন্তর্গত কলারোয়া হোসেনপুর পরগণার পৈতৃক ভূ-সম্পত্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বর্তমানে সেই সম্পত্তি বাংলাদেশের মধ্যে থাকায়, তাঁর বংশধরগণ সেই সম্পত্তির ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত। জমিদারী পরিচালনায় যদুনাথ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও বিশেষ বিবেচনা শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর জমিদারীর প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা জমিদারী উত্তরোত্তর বর্ধিত করেছিলেন।

যদুনাথ শেষজীবনে ধর্মচর্চা ও তীর্থাদি ভ্রমণে পুণ্য সঞ্চয় করে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। ভবানীপুরে তাঁর নামাঙ্কিত প্রসিদ্ধ 'যদুবাবুর বাজার' বর্তমানে তাঁর বংশধরদের অধীনে।

যদুনাথের দু'বার বিবাহ হয়। প্রথম পক্ষে নদীয়া জেলায় বিবাহ করেছিলেন ; সেই স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত। প্রথমপক্ষে কোন সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি কলকাতার দ্বারিকানাথ দাসের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁর ৫ টি পুত্র—চণ্ডীচরণ, প্রসন্নকুমার, দুর্গাপ্রিয়, নবকিশোর ও নন্দলাল ; এবং ২ টি কন্যা—সুরধুনী ও ভুবনমোহিনী। (বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)। তাঁর কন্যাগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহিতা এবং পুত্র-পৌত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত। এঁদের অনেকের মধ্যেই সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা ও সৎকর্মের দৃষ্টান্তগুলি মহিয়সী রাণী রাসমণির অত্যুজ্জ্বল গৌরবের ধারক ও বাহক।

* * *

যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডীচরণ সৎ, শান্ত, ধর্মভীরু ও নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। তাঁর দান-ধ্যানও প্রচুর ছিল। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। দেবদ্বিজে ভক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান তাঁর প্রবল ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে অনুজ ভ্রাতাদের প্রতি তাঁর অগাধ প্রীতি, চৌধুরীবংশের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে।

যদুনাথের দ্বিতীয়পুত্র প্রসন্নকুমারও খুব উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপুত্রক থাকায়, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির কিছু অংশ কন্যাদের দিয়ে অবশিষ্ট সমস্তই তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চণ্ডীচরণের পুত্র যোগেশপ্রসাদকে দান করে যান। জ্যেষ্ঠভ্রাতা চণ্ডীচরণ ও চতুর্থভ্রাতা নবকিশোরের সহায়তায় তিনি কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউ রাস্তার শেষপ্রান্তে প্রসিদ্ধ যোগাচার্য পরিব্রাজক আনন্দ ঋষির চিতার কাছে বহু অর্থব্যয়ে কৃষ্ণ-কালীর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

যদুনাথের তৃতীয়পুত্র দুর্গাপ্রিয় নিঃসন্তান ছিলেন। তিনিও পিতা-পিতামহের গৌরব রক্ষার জন্য সর্বদাই যত্নশীল ছিলেন। তিনি বরাবরই কাশীতে বাস করতেন। কাশীতে তাঁর বাড়ির সামনেই লক্ষ্মীকুণ্ডুতে তিনি ৺জগদ্ধাত্রী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে সেটি যদুনাথের জ্যেষ্ঠাপুত্র চণ্ডীচরণের একমাত্র পুত্র যোগেশপ্রসাদের বংশধরগণ পরিচালনা করেন।

যদুনাথের চতুর্থপুত্র নবকিশোর অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ, সত্যব্রত ও বাঙনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পিতৃপুরুষের অনুসৃত দানধ্যানাদি প্রভৃতি কাজে তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন। পরোপকার করা তাঁর জীবনের ব্রত হওয়ার ফলে, এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর দেড় লক্ষ টাকা নষ্ট হয় এবং তারপর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। যৌবনে ও পরিণত বয়সেও তিনি বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থাদি পরিভ্রমণ করেছিলেন।

যদুনাথের পঞ্চম, তথা কনিষ্ঠ পুত্র নন্দলালও নানা গুণের অধিকারী ছিলেন এবং নানা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রমাতামহী রাণী রাসমণির কীর্তি-রক্ষায় সকল সময়েই তাঁর আগ্রহ ছিল। নবদ্বীপে রাণী রাসমণি ঘাটের কাছে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-রাধার যুগলমূর্তি স্থাপন ক'রে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। সেখানে এখনও নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে সেটি চৌধুরী বংশীয়গণই দেখাশোনা করেন।

শ্রীমতী কুমারীর বংশধরগণের একাংশ জানবাজারে রাণী রাসমণির প্রাসাদে বাস করেন; এই অংশটির ঠিকানা ঃ—১৮/৩-এ, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩। এই অংশের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁর বংশধরগণ ৺দুর্গাপূজা করেন। রাণী রাসমণির এই প্রাসাদ ছাড়াও শ্রীমতী কুমারীর বংশধরগণের অনেকেই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারী ও জামাতা শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরীর বংশ তালিকা

(প্রপৌত্র—প্রপৌত্রী অবধি)

শ্রীমতী কুমারী—শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী

যদুনাথ

(প্রথমা স্ত্রী—নিঃসন্তান) (হেমাঙ্গিনী)

চণ্ডীচরণ (জ্যোৎস্নাযামিনী)

১। সুশীলাবালা (কালিদাস বিশ্বাস)
২। সুবালা (সুরেন্দ্রনাথ দাস)
৩। সুরমা (শরৎচন্দ্র দাস)
৪। শোভাবতী (হরিনাথ মণ্ডল)
৫। যোগেশপ্রসাদ (উমাতারা)

প্রসন্নকুমার (শশীমুখী)

১। ইন্দুপ্রভা (মন্মথ রায়)
২। কনকপ্রভা (কুমুদ মণ্ডল)
৩। সরযূপ্রভা (পঞ্চানন মণ্ডল)
৪। প্রতিভা (প্রমথনাথ রায়)

দুর্গাপ্রিয় [নিঃসন্তান] (কিরণশশী)

সুরধুনী (চণ্ডীচরণ মণ্ডল)

নবকিশোর (সন্তোষবালা)

১। সুধাংশুশেখর (বিদ্যুৎলতা) (আশালতা)
২। কিরণকুমার (রেণুকা) (মহামায়া)
৩। প্রমীলাবালা (বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল)
৪। নির্মলাবালা (কমলকৃষ্ণ মণ্ডল)
৫। কমলপ্রসাদ (অমলা)

নন্দলাল (মৃণালিনী)

১। লবঙ্গলতা (দেবেন্দ্রনাথ সরকার)
২। স্নেহলতা (নগেন্দ্রনাথ হাজরা)
৩। জিতেন্দ্রনাথ (পারুলবালা)
৪। শৈলেন্দ্রনাথ (ঊষারাণী)
৫। কনকলতা (ধীরেন্দ্রনাথ দাস)
৬। বিদ্যুল্লতা (ঐ)
৭। অনিলকুমার (১ মা স্ত্রী) (রেণুকা)
৮। হিরন্ময়ী (পঞ্চানন দাস)

ভুবনমোহিনী (কৃষ্ণলাল মণ্ডল)

॥ ৩৩ ॥

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী ও জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস

রাজচন্দ্র দাস ও রাসমণি দেবীর তৃতীয়া কন্যার নাম—শ্রীমতী করুণাময়ী। কলকাতার জানবাজারের পিত্রালয়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে (১২২৩ বঙ্গাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। রাসমণি দেবী জামাতারূপে উপযুক্ত পাত্র পাওয়ায়, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে (১২৩৪ বঙ্গাব্দে) মাত্র ১০।১১ বছর বয়সে শ্রীমতী করুণাময়ীর বিবাহ দেন। জামাতার নাম—শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস। তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহের সম্পর্কে মথুরমোহন শ্বশুরালয়ে 'সেজবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র পুত্র ভূপালের জন্মগ্রহণের দু'বছর বাদেই আর একটি সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে (১২৩৮ বঙ্গাব্দে) মাত্র ১৫।১৬ বছর বয়সে শ্রীমতী করুণাময়ীর অকাল মৃত্যু হয়। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীমতী করুণাময়ীর মৃত্যুর পর, রাসমণি দেবী পুনরায় মথুরমোহনের সঙ্গে তাঁর চতুর্থী, তথা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে রাসমণি দেবীর অপর দুই জামাতা—রামচন্দ্র দাস ও প্যারীমোহন চৌধুরীর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এবার জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজন)।

* * *

রাসমণি দেবীর তৃতীয় জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাসের আদি নিবাস—উত্তর-চব্বিশপরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত বিথারি গ্রাম। রাসমণি দেবীর প্রিয় জামাতারূপে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্তরূপে শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাসের নিজস্ব পরিচিতি ছাড়া, কোনও গ্রন্থে তাঁর পূর্বপুরুষের বা পৈতৃক বংশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেজন্য বর্তমান লেখক কর্তৃক মথুর মোহনের পৈতৃক বংশের বিথারি গ্রাম নিবাসী শ্রীকল্যাণকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে যে অজ্ঞাত তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলিই এখানে বিবৃত হল। উক্ত শ্রীকল্যাণকুমার বিশ্বাস হলেন মথুরমোহনের নিজভ্রাতা শ্রীপ্রাণকান্ত বিশ্বাসের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ এবং বর্তমানে বিথারি গ্রামেই মথুরমোহনের পৈতৃক বাড়িতে বাস করেন। (ঠিকানা—শ্রীকল্যাণকুমার বিশ্বাস। গ্রাম—বিথারি, পোঃ—বিথারি, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগণা)। তাঁর কাছে অতি প্রাচীন তুলট কাগজে রক্ষিত তাঁদের বংশলতিকা দৃষ্টে এবং তাঁর নিজ প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মথুরমোহনের পূর্ব পুরুষ 'দাস সিংহ' পদবীধারী কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার জোগ্রাম-কুলীন-গ্রামে। মথুরমোহনের পিতার নাম জয়নারায়ণ বিশ্বাস। মথুরমোহনের পূর্বতন

ছয় পুরুষের আমলেই তাঁরা কায়স্থ থেকে 'মাহিষ্য-কুলীন' হন। কিন্তু কেন ও কিভাবে তাঁরা মাহিষ্য হয়েছিলেন, তার কোন সূত্র পাওয়া যায় না।

মথুরমোহনের পূর্বপুরুষের বংশ তালিকা ঃ—
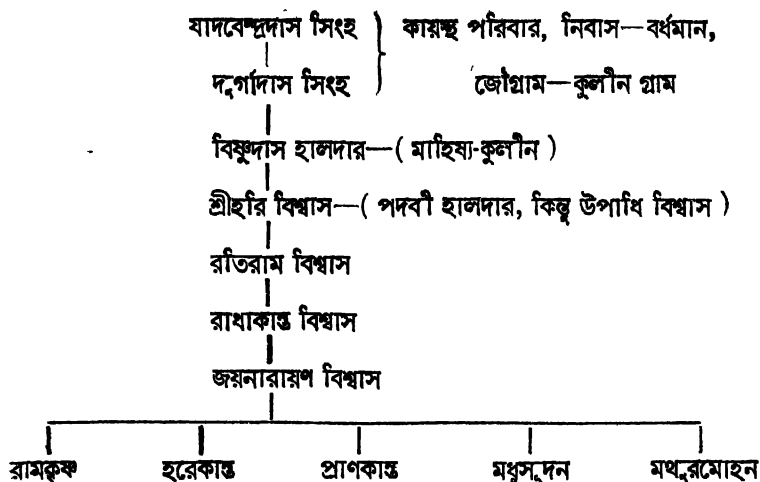
আরো জানা যায় যে, শ্রীহরি বিশ্বাসের পিতা বিষ্ণুদাস হালদার ও তাঁর অপরাপর ভ্রাতাগণ একদা একযোগে 'কায়স্থ' থেকে 'মাহিষ্য-কুলীনে' পরিণত হন এবং 'দাসসিংহ' পদবী ছেড়ে 'হালদার' পদবী গ্রহণ করেন। (প্রসঙ্গতঃ, শ্রীকল্যাণ কুমার বিশ্বাস জানান যে, পরবর্তীকালে বিষ্ণুদাস হালদারের জনৈক ভ্রাতার বংশধর পুনরায় 'মাহিষ্য-কুলীন' থেকে 'কায়স্থ' হন এবং 'হালদার' পদবী ত্যাগ করে ও 'দত্ত' পদবী গ্রহণ ক'রে মধ্যকলকাতায় প্রসিদ্ধ 'দত্ত পরিবার' রূপে পরিচিত হন। তাঁদের বংশধরগণ বর্তমানে কলকাতায় কায়স্থরূপেই গণ্য ও প্রতিষ্ঠিত।)

শ্রীহরি বিশ্বাস (পূর্বে হালদার) নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের অধীনে রাজ এস্টেটে ৫ টাকা মাহিনায় মুন্সীর কাজ অতি সততার সঙ্গে পালন করায় এবং এই কাজে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করায়, সেই রাজবংশ থেকে শ্রীহরি হালদারকে 'বিশ্বাস' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণও আজ অবধি ঐ 'বিশ্বাস' উপাধিই ব্যবহার করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিথারি গ্রামের এক অংশে শ্রীহরি বিশ্বাসই প্রথম বসতি স্থাপন করেন। বিথারিগ্রাম নিবাসী মথুরমোহনের পিতা জয়নারায়ণ বিশ্বাস ছিলেন গাতীদার। তাঁর কোন জমিদারী ছিল না। পরবর্তীকালে মথুরমোহন রাণী রাসমণির জামাতারূপে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বার নামে বিথারীতে ও সোনাবেড়িয়াতে জমিদারী ক্রয় ক'রে নিজে 'জমিদার' হন।

জয়নারায়ণ বিশ্বাসের পাঁচটি পুত্রের মধ্যে মথুরমোহন সর্বকনিষ্ঠ। জয়নারায়ণ তাঁর তৃতীয় পুত্র প্রাণকান্ত এবং পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র মথুরমোহনকে কলকাতার

হিন্দু কলেজে একই শ্রেণীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি করান। কলেজের হোস্টেলে বাস করে তাঁরা লেখাপড়া শিখে স্নাতক হন। এই সময় হিন্দু কলেজে এই দুই ভ্রাতার সহপাঠী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুজনে একসঙ্গে কলকাতার কলেজে পড়াকালীন, রাণী রাসমণি এঁদের সন্ধান পান এবং জয়নারায়ণ বিশ্বাসের তৃতীয় পুত্র প্রাণকান্তের সঙ্গে নিজ কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু যেহেতু রাণী রাসমণি মাহিষ্য হলেও কুলীন ছিলেন না, সেজন্য নিজেদের কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখার জন্য প্রাণকান্ত এই বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে যে কোন কারণেই হক, মথুরমোহন এই বিবাহে রাজী হওয়ায়, রাণী রাসমণি তখন প্রাণকান্তের বদলে তাঁর ভ্রাতা মথুরমোহনকেই জামাতারূপে নির্বাচন করেন এবং মথুরমোহনের সঙ্গে শ্রীমতী করুণাময়ীর বিবাহ দেন। মথুরমোহন তখন কলেজের ছাত্র এবং বয়সও বেশী নয়। তাই বিবাহের সময় শ্রীমতী করুণাময়ীও নাবালিকা (মাত্র ১০।১১ বছর বয়স) ছিলেন। এই বিবাহের সময় মথুরমোহনের পিতা জয়নারায়ণ বিশ্বাস জীবিত ছিলেন।

শ্রীমতী করুণাময়ীকে বিবাহ করে মথুরমোহন যখন বিথারি গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানেই 'বৌ-ভাতের' ব্যবস্থা করেন, তখন কৌলীন্য প্রথা ভাঙার অপরাধে মথুরমোহনকে দায়ী করে, তাঁরই মাহিষ্য-আত্মীয়গণ এবং ব্রাহ্মণগণ এই 'বৌভাতে' প্রথমে যোগদানে বিরত থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিমান মথুরমোহন সবাইকে ষোল আনা সম্মান স্বরূপ নগদ ১টি করে রৌপ্যমুদ্রা দেওয়ার প্রস্তাব রাখায়, পরে সবাই তা গ্রহণ করেন এবং মথুরমোহন কৃত 'বৌভাতে' যোগদান করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য মথুরমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতার জানবাজারে নিজ শ্বশুরালয়ে বসবাস করতেন, যদিও তাঁর জমিদারী ও পৈতৃকবাড়ি বিথারি গ্রামেই ছিল। মথুরমোহনের পৈতৃক বাড়ির অংশ (তৃতীয় অগ্রজ প্রাণকান্ত বিশ্বাসের পুত্র) সতীশচন্দ্রই ভোগ করায়, সতীশচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র সুরেশচন্দ্র এবং তাঁর অবর্তমানে কল্যাণকুমার (যিনি এই পারিবারিক তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন) বর্তমানে এখানে বাস করেন। এই পারিবারিক তথ্য প্রকাশের দ্বারা সর্বপ্রকারে সাহায্য করায় শ্রীকল্যাণকুমার বিশ্বাসের কাছে লেখক চিরকৃতজ্ঞ।

* * *

শ্রীমতী করুণাময়ী-মথুরমোহনের একমাত্র পুত্রের নাম ভূপালচন্দ্র। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ বঙ্গাব্দে) ভূপালচন্দ্রের জন্ম হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ বঙ্গাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন আইনানুসারে শ্রীমতী করুণাময়ীর পুত্র ভূপালচন্দ্র রাণী রাসমণির সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন, যদিও দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েতরূপে শ্রীমতী করুণাময়ীর বংশধরগণ রাসমণি দেবীর দলিল অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভূপালচন্দ্রের ১টি কন্যা ও ৩টি পুত্র। (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে ভূপালচন্দ্রের বংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, শ্রীমতী করুণাময়ীর অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

॥ ৩৪ ॥

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী ও জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাসের বংশ তালিকা

(প্রপৌত্র—প্রপৌত্রী অবধি)

শ্রীমতী করুণাময়ী—শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস

|

ভূপালচন্দ্র (প্রসন্নময়ী)

|

কাদম্বিনী (দেবেন্দ্রনাথ সাঁতরা)	শশীভূষণ (ক্ষীরোদাময়ী)	গিরীন্দ্রভূষণ [নিঃসন্তান (মৃত)]	মণিভূষণ (নিঃসন্তান) (নৃত্যকালী)

শশীভূষণ (ক্ষীরোদাময়ী)

|

১। পুত্র—শৈশবে মৃত

২। রতনমণি বা রত্না (অবিনাশচন্দ্র সরকার)

|| ৩৫ ||

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা ও জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস

রাজচন্দ্র দাস ও রাসমণি দেবীর চতুর্থা, তথা কনিষ্ঠা কন্যার নাম—শ্রীমতী জগদম্বা। কলকাতার জানবাজারের পিত্রালয়ে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে (১২৩০ বঙ্গাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে জানবাজারের বাড়িতে তিনি অপর ভগ্নীদের মত লেখাপড়া করেছিলেন এবং পরমস্নেহে লালিতা-পালিতা হয়েছিলেন। রাসমণি দেবীর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সঙ্গে মথুরমোহন বিশ্বাসের প্রথম বিবাহ হয়েছিল। শ্রীমতী করুণাময়ী তাঁর একমাত্র পুত্র ভূপালচন্দ্রকে রেখে অকালে পরলোকগমন করায়, রাসমণি দেবী তাঁর উপযুক্ত জামাতা মথুরমোহন পাছে হাতছাড়া হয়ে যান, সেজন্য ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে (১২৪০ বঙ্গাব্দে) পুনরায় মথুর-মোহনের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার বিবাহ দেন। শ্রীমতী জগদম্বা, মথুরমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। পূর্বের বিবাহের সুবাদে মথুরমোহন শ্বশুরালয়ে 'সেজবাবু' নামেই সম্বোধিত হতেন এবং শ্বশুরালয়েই স্থায়ীভাবে বাস করতেন।

শ্রীমতী জগদম্বা-মথুরমোহনের ৩ টি পুত্র এবং ৩ টি কন্যা। (বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)।

* * *

রাসমণি দেবীর কনিষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী জগদম্বা অতি ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। পরমভক্ত স্বামী মথুরমোহনের মত তাঁর জীবনের অধিকাংশই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িত। স্বামী মথুরমোহনের মত তিনিও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন ; এমনকি, স্বামীর সঙ্গে নিজেদের শয্যায় নিঃসঙ্কোচে তিনি ঠাকুরকেও শুতে দিতেন। ঠাকুরের প্রতি সেবা-যত্নের তিনি কোন ত্রুটী রাখতেন না এবং ঠাকুরের যখন যেটি প্রয়োজন, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এমনকি, ঠাকুরের কামারপুকুরে থাকাকালীন যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিস নিজহাতে গুছিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরের কথার প্রতি তাঁর বিশেষ আস্থা থাকায়, মথুরমোহনের সঙ্গে ঠাকুর কোথাও বেড়িয়ে এলে, তিনি ঠাকুরের মুখ থেকে মথুরমোহনের বিষয়ে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হতেন। ঠাকুরও এই মহিলা ভক্তটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সরলতার প্রশংসা করতেন।

একদা শ্রীমতী জগদম্বার গ্রহনী রোগ হওয়ায় এবং কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করায়, মথুরমোহন উন্মত্তপ্রায় অবস্থায়

কলকাতার জানবাজারের বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর একান্ত ভক্ত শ্রীমতী জগদম্বার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সে সময় মথুরমোহনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী ভাল হয়ে যাবে। ঠাকুরের মুখে আশ্বাসবাণী শুনে মথুরমোহন বাড়িতে ফিরে এসেই দেখেন যে, তাঁর স্ত্রীর সেই সাংঘাতিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে ; ক্রমে ক্রমে শ্রীমতী জগদম্বা সত্যই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠাকুর এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন—"সেদিন থেকে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগল, আর তার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই শরীরের ওপর দিয়ে হতে লাগল ; জগদম্বা দাসীকে ভাল করে, ছ-মাস কাল পেটের পীড়া আর অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিল।" বলা বাহুল্য, শ্রীমতী জগদম্বার রোগ নিজের দেহে ধারণ করে কৃপাময় ঠাকুর তাঁর পরমভক্ত শ্রীমতী জগদম্বার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং শ্রীমতী জগদম্বাও তাঁর কৃপায় সে যাত্রায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অনুরূপ এক ঘটনায় ঠাকুর একদা জনৈক কুষ্ঠরোগীর পীড়াপীড়িতে তার দেহে হাত বুলিয়ে তার ব্যধিও নিরাময় করেছিলেন ; কিন্তু সেদিন সর্বক্ষণ হাতের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন—"তার রোগ সেরে গেল, কিন্তু তার ভোগটা (নিজ শরীর দেখিয়ে) এইটের ওপর দিয়ে হয়ে গেল।"

পুণ্যবতী মাতা রাসমণি দেবীর অনুকরণে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যারাকপুরের কাছে চানকে গঙ্গার তীরে "৺অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির" প্রতিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রাসমণি দেবীর বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শনে বিঘ্ন ঘটেছিল বটে ; কিন্তু চানকে ৺অন্নপূর্ণা মন্দির ও ৺শিব মন্দির স্থাপন করে তিনি তাঁর মাতার ইচ্ছা পূরণে কিছুটা সফল হয়েছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীমতী জগদম্বার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যেমন উপস্থিত ছিলেন, ব্যারাকপুরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনও উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

এই মন্দির সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। টিটাগড় ও ব্যারাকপুরের সন্নিকটে গঙ্গার ধারে গান্ধীঘাটের কিছু দক্ষিণে এই ৺অন্নপূর্ণা মন্দির। ব্যারাকপুরের প্রাচীন নাম ছিল চানক এবং এখনও এই মন্দিরের কাছে 'চানক বিদ্যাপীঠ' নামে একটি বিদ্যালয় আছে।

এখানকার পার্করোড থেকে অন্নপূর্ণা মন্দিরের চত্বরে যাওয়ার প্রধান প্রবেশপথের ফটকের ওপর সিংহমূর্তি। চত্বরের মাঝখানে অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির ; মন্দিরটি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের দক্ষিণে নাট মন্দির এবং পশ্চিমে তিনটি তিনটি করে ছয়টি আটচালা শৈলীর শিবমন্দির। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুই প্রস্ত শিবমন্দিরের মাঝখান দিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাবার পশ্চিমমুখী রাস্তা। গঙ্গার ঘাটটি রাণী রাসমণির ঘাট নামেই

পরিচিত। শিবমন্দিরের পেছনে উত্তরপশ্চিম কোণে নহবৎ। গর্ভমন্দিরে মার্বেলপাথরে বাঁধানো মেঝের ওপর কারুকার্যকরা মর্মর বেদী। রৌপ্য সিংহাসনে পদ্মের ওপর অন্নপূর্ণার অষ্টধাতুর মূর্তি। একটি চরণ জানুর ওপর, অপরটি নীচে ঝুলানো। ডান হাতে একটি হাতা, বাম হাতে অন্নপাত্র। সামনে ডানদিকে ভিক্ষাপাত্র হাতে মহাদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি। মায়ের চরণের নীচে গরুড়ের মূর্তি॥

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল এই মন্দিরে অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটি নির্মাণ করতে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই সময় শ্রীমতী জগদম্বার স্বামী মথুরমোহন বিশ্বাস জীবিত ছিলেন না।

উক্ত দেবালয় ও দেববিগ্রহের সেবার্চনাদি কাজের জন্য ও দরিদ্রনারায়ণের সেবানির্বাহের জন্য, শ্রীমতী জগদম্বা তাঁর মাতা রাসমণি দেবীর অনুসরণে স্বকৃত 'অর্পণনামা' অনুসারে প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। 'অর্পণ নামার' নির্দেশ অনুসারে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠকে মন্দিরের সেবায়েত করা হয়। শ্রীমতী জগদম্বার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারিকানাথ ইতিপূর্বে পরলোক গমন করায়, শ্রীমতী জগদম্বার মধ্যম-পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে প্রথম এই মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র (দ্বারিকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র) গুরুদাস সেবায়েত হয়েছিলেন। গুরুদাসের মৃত্যুর পর বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা কালিদাস সেবায়েত হন। এই ভাবেই এখনও বংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের ঐ মন্দিরে সেবায়েত করা হয়।

রাসমণি দেবীর ৪ কন্যার মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী জগদম্বাই জীবিত থেকে শেষ দিন অবধি রাণীর সমুদয় সম্পত্তির জীবন-স্বত্ব ভোগ করেছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বার মৃত্যুর পরেই রাণীর তৎকালে জীবিত পাঁচজন দৌহিত্রের মধ্যে রাণীর ঐ সম্পত্তি বিভক্ত হয়। শ্রীমতী জগদম্বা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর (১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ) দেহত্যাগ করেন।

* * *

রাসমণি দেবীর জামাতা, তথা শ্রীমতী জগদম্বার স্বামী মথুরমোহন বিশ্বাসের বংশ ও পূর্ব পরিচিতি আগের অধ্যায়ে শ্রীমতী করুণাময়ীর প্রসঙ্গে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এখন তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মথুরমোহন প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ উল্লেখ করেছেন—"মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতি-সম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইলেও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশালী এবং ধীর প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংরেজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে, উহা বুঝিয়াও বুঝিব না—এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া

ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিলনা, তা তিনি ঠাকুরই হউন, আর গুরুই হউন বা অন্য যে-কেহই হউন। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ।"

প্রকৃতপক্ষে নানাগুণের জন্য জামাতা মথুরমোহন ছিলেন রাসমণি দেবীর দক্ষিণহস্ত। পুত্রহীনা রাসমণি দেবীর অন্যান্য জামাতা বর্তমান থাকলেও বিষয়-কর্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্ত করার কাজে মথুরমোহনের বুদ্ধি-প্রাখর্যের ওপরই রাসমণি দেবী বেশী ভরসা রাখতেন। ফলে, জানবাজারের শ্বশুরালয়ে মথুর-মোহনের প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণের কাজে প্রথমদিকে রাসমণি দেবীর জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস তাঁর প্রধান সহায়ক হলেও, পরে কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহনই এই কাজে বিশেষভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তার পরের ব্যবস্থাপনাতেও তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমণিপর্ব—এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা—অধ্যায় গুলিতে ইতিপূর্বে মথুরমোহনের সম্পর্কে এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে)।

এহেন বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ জামাতা মথুরমোহনের বিরুদ্ধে সম্পত্তির বেহিসাব ও আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনে ইতিপূর্বে রাসমণি দেবী ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টে (বর্তমানে হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীলের কাছে মামলা রুজু করেছিলেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী একটি ডিক্রিও পেয়েছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অবশ্য মাননীয় প্রধান বিচারপতির মধ্যস্থতায় এই মামলায় উভয়পক্ষের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। অনুরূপ মামলার ঘটনা জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্রের সঙ্গেও ঘটেছিল, যা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্ত মথুরমোহনের সম্পর্ক এমনভাবে জড়িত ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মথুরমোহন প্রসঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

মথুরমোহনই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নানা অপূর্ব গুণের পরিচয় পেয়ে, তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর পূজকের পদে বরণ করেছিলেন। ঠাকুরের দিব্যোন্মাদের সময় দক্ষিণেশ্বর-এস্টেটের কর্মচারীদের নানা অভিযোগ থেকে তিনি যেমন ঠাকুরকে মুক্ত করেছিলেন, তেমন আবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষার জন্য তিনি ঠাকুরকে পতিতাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কেও স্বয়ং নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুরুভক্তি স্বরূপ মথুরমোহন লিখে দিতে চাইলে, ঠাকুর সে কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং এই কাম-কাঞ্চনত্যাগী সত্যকারের মনুষ্যরূপী দেবতার ওপর মথুরমোহনের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ঠাকুরের সাধনকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী, ঠাকুরের আচরণ ও দৈহিক লক্ষণ দেখে, তাঁকে প্রথম 'অবতার' রূপে ঘোষণা করায়, মথুরমোহন এই

বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত জানবার জন্য এক বিশেষ সভার আয়োজন করেছিলেন। ঐ সভায় ভাগবতাদি-শাস্ত্র অবলম্বনে এবং যুক্তি-তর্ক সহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সমস্ত পণ্ডিতগণের সমক্ষে 'অবতার' রূপে প্রমাণ করায়, মথুর-মোহনও এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিবাদী মথুরমোহন প্রতিটি বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নিতেন ; তাই 'কাম-ত্যাগ' পরীক্ষায় পতিতাদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া, 'কাঞ্চন-ত্যাগ' পরীক্ষায় ঠাকুরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব এবং 'অবতার'-রূপে পরীক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা ধর্মসভার আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মথুরমোহন ঠাকুরকে যাচাই করে, তবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মথুরমোহন একসঙ্গে 'শিব' ও 'কালী' মূর্তিকে দর্শন করে তাঁর চরণে পতিত হন এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করেন। সেদিন থেকেই তিনি ঠাকুরকে তাঁর জীবন-সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে মথুরমোহনের এমন এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, ঠাকুরও তাঁর নিজের সব কথা—এমনকি সাধনার গোপন কথাও মথুরমোহনের কাছে প্রকাশ না করে থাকতে পারতেন না। ঠাকুরের কৃপায় মথুরমোহনের একদা ভাব-সমাধিও ঘটেছিল। ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দর্শন করে মথুর-মোহনের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর ইষ্টদেবী মা-জগদম্বা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ' ধারণ করে তাঁর সেবা গ্রহণ করছেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁকে রক্ষা করছেন। তাই ঠাকুরের আদেশকে তিনি দৈবাদেশরূপে গ্রহণ করতেন এবং নিজের জাগতিক অভ্যুদয়ের মূলে ঠাকুরের কৃপাকে স্বীকার করতেন।

একদা জমিদারী সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নরহত্যা-জড়িত অপরাধে, আদালতে দণ্ডিত হবার ভয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে দোষ স্বীকার করে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষাও পেয়েছিলেন। ঠাকুরের প্রতি মথুরমোহনের এমন বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, নিজের অথবা স্ত্রীর অসুখের সময় ঠাকুরের কৃপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিরাময় হতেন।

মথুরমোহন দীর্ঘ ১৪ বৎসর একাদিক্রমে নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুজ্ঞানে সেবা করেন এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অধিকাংশ সাধনার সাক্ষী হন। ঠাকুরের মধ্যে একত্রে 'শিব' ও 'কালী' মূর্তি দর্শনের ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তীকালে ঠাকুর বলেছিলেন—"মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের বিভিন্ন অলৌকিক প্রকাশ তিনি দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিক সাহায্যের ফলেই দক্ষিণেশ্বরে সবরকম সাধনায়—এমনকি, ইসলাম ধর্ম সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রাসমণি দেবীর

অবর্তমানে ঠাকুরের সমগ্র ভরণ-পোষণের ভার মথুরমোহন গ্রহণ করায়, ঠাকুর তাঁকে 'প্রধান রসদদার' হিসাবে গণ্য করতেন।

রাসমণি দেবীর অবর্তমানে, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে তিনি কলকাতার জানবাজারের বাড়িতে এনেও রাখতেন এবং সস্ত্রীক তাঁকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর শয্যায় 'বাবা'কে নিয়ে শুতেও তাঁর দ্বিধা ছিলনা। রাসমণি দেবীর সেজ জামাতা হিসাবে প্রথমাবস্থায় ঠাকুর তাঁকে 'সেজবাবু' বলে সম্বোধন করতেন; পরে সম্পর্ক আরো নিবিড় হওয়ায়, সরাসরি 'মথুর' বলেও ডাকতেন। মথুরের ওপর ঠাকুরের সবরকম জোর বা আব্দার চলত।

ঠাকুরকে নিয়ে একদা মথুরমোহন বৈদ্যনাথ (দেওঘর), কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শনে যান এবং আর একসময় কালনার ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে এবং নবদ্বীপে যান। আর একবার ঠাকুরকে নিয়ে মথুরমোহন তাঁর দেশের জমিদারীমহলে বেড়াতে যান। সেখানকার একস্থানে পল্লীবাসীদের দুর্দশা ও অভাব দেখে ঠাকুর তাদের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরমোহনের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়ে সেই দুর্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসীদের একমাথা করে তেল, একখানি করে নতুন কাপড় এবং উদর পূর্ণ করে একদিনের ভোজনের ব্যবস্থা করান। সেইসময় মথুরমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চুর্ণীর খালে ভ্রমণে গিয়েছিলেন; সেখানে সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ের সন্নিথিত গ্রামগুলিতে তাঁর জমিদারী ছিল। ঐ স্থান থেকে তালমাগরো গ্রামে মথুরমোহনের কুলগুরুবংশীয়দের বাড়িতে যাবার সময় তিনি ঠাকুরকে ও তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে নিজের হাতীর পিঠে চড়িয়ে, স্বয়ং পাল্কীতে আরোহন করেছিলেন। বস্তুতঃ মথুরমোহন যেভাবে ঠাকুরের সেবা ও সকলপ্রকার আদেশ পালন এবং তৎসহ প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন, ঠাকুরের আর কোন গৃহীভক্তের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এইভাবে 'বৈষয়িক জমিদার' মথুরমোহন সত্যই 'ভক্তির জমিদার' রূপে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সঙ্গে মথুরমোহনের কাহিনী এমনভাবে জড়িত আছে, যার সবগুলির উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়; তার জন্য পৃথক একটি গ্রন্থের প্রয়োজন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই (১২৭৮ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ) রাণী রাসমণির প্রিয়তম জামাতা এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের একান্ত সহায়ক ও প্রধান রসদদার শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস কলকাতায় ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই দেহত্যাগ করেন। মথুরমোহনের স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বাও তখন জীবিত ছিলেন।

ভক্তপ্রবর মথুরমোহনের দেহত্যাগ সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'-গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মথুরবাবু প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

"সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ-সমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়ের অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময়

শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাঁহার ভক্তকে স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদযাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন মথুরকে দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষদিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্তু অপরাহ্ন উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহু পুণ্যার্জিত লোকে তাঁহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন। ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন; তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠালেন—তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গেল!' পরে গভীর রাত্রে কালীঘাটের কর্মচারীগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ন পাঁচটার সময় (১৬ই জুলাই, ১৮৭১; ১লা শ্রাবণ, ১২৭৮) দেহরক্ষা করিয়াছেন।

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুর পর মথুরের কি হ'ল মশায়? তাঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্ম গ্রহণ করতে হবে না।' ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, 'কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।' এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য অন্য কথা পাড়িলেন।"

* * *

শ্রীমতী জগদম্বা ও মথুরমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম—দ্বারিকানাথ। তিনি জে. পি. ছিলেন। তাঁর দুটী বিবাহ। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে তাঁর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত চান্দুরিয়া গ্রামে একটি কালী-মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। পিতা-মাতার ন্যায় দ্বারিকানাথেরও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল এবং ঠাকুরও দ্বারিকানাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরে জনৈকা নেপালী ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠে 'গীত-গোবিন্দের' গান শুনে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সামনেই রুমালে চোখের জল মুছতে থাকায়, ঠাকুর তাঁর ভক্তির প্রশংসা করেছিলেন। আর একবার দক্ষিণেশ্বরে একটি মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্যারিষ্টার হিসাবে দ্বারিকানাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে, দ্বারিকানাথের উদ্যোগে মহাকবির সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ব্যারাকপুরের চানকে শ্রীমতী জগদম্বার ৺অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়েও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দ্বারিকানাথ নিয়ে গিয়েছিলেন।

একদা ঠাকুর, ভক্ত মথুরমোহনকে জানান যে, মথুরমোহন যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিনই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করবেন এবং তারপরেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন। ঠাকুরের সে কথায় মথুরমোহন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী জগদম্বা ও পুত্র দ্বারিকানাথও ঠাকুরকে সমভাবে ভক্তি করেন। ঠাকুর মথুরমোহনের সে কথা স্বীকার করে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁদের দু'জনের জীবদ্দশায় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন না। প্রকৃতপক্ষে, রাণী রাসমণি ও মথুরমোহনের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন; কিন্তু শ্রীমতী জগদম্বা ও দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশীদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন নি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) মাত্র ৪০ বছর বয়সে দ্বারিকানাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁর মাতা শ্রীমতী জগদম্বার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালীন আইন অনুযায়ী মাতামহী রাসমণি দেবীর বিষয়-সম্পত্তি থেকে তাঁর বংশধরগণ বঞ্চিত হলেও, যৌথ সম্পত্তি থেকে অন্যভাবে তাঁর বংশধরগণ স্থাবর-অস্থাবর নানা সম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

দ্বারিকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুদাস একজন ধর্মনিষ্ঠ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। স্বজাতি-প্রীতির জন্য তিনি অনেক দরিদ্র স্বজাতীয়গণকে প্রতিপালন করতেন। ব্যায়ামের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাল্যকালে পিতা দ্বারিকানাথের সঙ্গে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

দ্বারিকানাথের মধ্যমপুত্র কালিদাস একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন। এজন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত কুস্তিগীর গামা প্রভৃতিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। সুধী সমাজে তিনি 'কালী মাড়' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। রাসমণি দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র চণ্ডীচরণ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী সুশীলা-বালাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তৎকালীন স্বদেশীযুগে কোন দেশী সিগারেটের প্রচলন না থাকায় এবং দেশবাসীদের বিলাতী বর্জনে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ ব্যয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে 'গ্লোব সিগারেট কোম্পানী' নামে একটি দেশী সিগারেটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিলেন; কিন্তু কয়েকজন কর্মচারীর শঠতায় কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বারিকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসও একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন। তিনি অশ্বারোহন ও সন্তরনেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর দেহ অত্যন্ত স্থূলকায় ছিল। তাঁর স্বদেশ-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি টিটাগড় কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং কংগ্রেসের কাজে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁর অসাধারণ ভক্তি ছিল। তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, টিটাগড় মিল অঞ্চলের শ্রমজীবিরা তাঁকে 'রাণী রাসমণি বাবু' বলে প্রীতি সম্ভাষণ করতেন।

* * *

শ্রীমতী জগদম্বা ও মথুরমোহনের মধ্যম পুত্রের নাম—ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁরা ৪টি বিবাহ এবং ১০টি সন্তান। (বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য)। তাঁর প্রথম ও চতুর্থ স্ত্রীর কোন সন্তানাদি ছিল না।

রাসমণি দেবীর দেহত্যাগের পর প্রথমে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি ও পরে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা (রাণীর অপর দুই কন্যার ইতিপূর্বে মৃত্যু হয়েছিল) দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ির সেবায়েত ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বার মৃত্যুর পর ত্রৈলোক্যনাথ দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন এবং আজীবন তা পালন করেন। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন, তবে অসুস্থতার দরুন বেশীদিন তাঁর সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত ত্রৈলোক্যনাথ, তাঁর পিতামাতার ন্যায় সম্পূর্ণ ভক্তি জগতের লোক ছিলেন না ; তাই পিতা মথুরমোহন ও মাতা শ্রীমতী জগদম্বা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বারিকানাথ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যে ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু ঠাকুরের অবতারত্ব সম্পর্কে সে ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। ঠাকুরের জ্ঞান, ভক্তি, সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শনে তিনি ঠাকুরকে সাধারণভাবে ভক্তি করতেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাজগুলি সমালোচনার চক্ষেও দেখতেন। সেজন্য তাঁর পিতা মথুরমোহনের মৃত্যুর পর ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ পাঁচটি টাকা ছাড়া, মথুরমোহন প্রবর্তিত ঠাকুরের জন্য অপর সকল প্রকার বাড়তি খরচ তিনি বন্ধ করে দেন এবং এই কারণে ঠাকুরকে সাময়িক অসুবিধায় পড়তে হয়। পরবর্তীকালে ঠাকুর যখন পূজা করতে পারতেন না, তখন অবশ্য ঠাকুরের বরাদ্দ মাসিক ঐ সামান্য টাকা বন্ধ না করে, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তা দেওয়ার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের দেহ-রক্ষার পর শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে সেই সামান্য টাকা দেওয়াও বন্ধ হয়।

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাগ্নে এবং মা-কালীর পূজক হৃদয়রাম ত্রৈলোক্য-নাথের এক কন্যার পাদ পূজা করায়, সেই অপরাধে ত্রৈলোক্যনাথ তৎক্ষণাৎ হৃদয়রামকে অপমান করে মন্দির থেকে চিরদিনের মত বহিষ্কার করেন। হৃদয়-রামকে মন্দির-ত্যাগের নির্দেশদানকালে ত্রৈলোক্যনাথ প্রচণ্ড ক্রোধের মাথায় ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'এঁরও আর এখানে থাকার দরকার নেই, ইনিতো চলে গেলেই পারেন।' দ্বারবানের মুখে সেই কথা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসি মুখে তৎক্ষণাৎ পায়ে চটি জুতো পরে এবং কাঁধে গামছা ফেলে হৃদয়রামের পিছন পিছন মন্দির ত্যাগ করার জন্য নিজের ঘর থেকে বহির্গত হন। তিনি প্রায় সদর ফটক অবধি চলে যাওয়ায়, ত্রৈলোক্যনাথ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং দ্রুতপদে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর গতিপথে বাধা দিয়ে অনুরোধ ক'রে বলেন—'বাবা, আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি, দারোয়ান ভুল ক'রে আপনাকে যেতে ব'লেছে, আপনি যেমন আছেন থাকুন।' ঠাকুরের প্রতি এই

আনুগত্য প্রকাশের ফলে, নিরভিমান ঠাকুর যেন কিছুই হয়নি, এরূপ ভাবে হাসতে হাসতে আবার নিজঘরে ফিরে আসেন এবং পূর্ববৎ বাস করতে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভক্তগণের আগমন-কাল থেকে, তাঁর দেহান্তের পরেও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরেই পালন করা হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, "বিলাত-প্রত্যাগত" স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে মন্দির কলুষিত হবে—এই নিদারুন অজুহাতে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব করার অনুমতি দেননি। সুতরাং সেই বছর থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ কর্তৃক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বন্ধ রাখা হয় এবং প্রথমে বেলুড়ের 'দাঁয়েদের রাসবাড়িতে' এবং পরে বেলুড়মঠেই তা প্রবর্তন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তৎকালীন 'নব্যভারত' পত্রিকায় * (৩০ খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যা) ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, সেই প্রতিবেদনের একস্থানে বলা হয়েছে ঃ—"রামকৃষ্ণ পরমহংস কিভাবে প্রথমতঃ পূজারী পদে বৃত হইয়া কি আকারের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত জীবনের অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার কিছু আভাস প্রদান করা হইল। তিনি একজন গরীবের সন্তান ; দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজারীর কার্যে নিযুক্ত হইবার পরেও কতককাল পর্যন্ত, অর্থাৎ যৌবনা-বস্থায় অনেক অংশ ব্যাপিয়া একজন কর্মপর গৃহস্থ, কৃতদার ও জীবিকার্থী। তাঁহার জীবনে স্বাধীনভাবে তীর্থ-পর্যটন, কৃচ্ছসাধনা ও বৈরাগ্য-কঠোরতা লক্ষিত হয় না, অথচ যেন অকস্মাৎ বিকশিতজ্ঞান বা জাগ্রত বলিয়া প্রতীত হয়। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে ভগবৎকৃপাসিদ্ধ বলেন। তিনি একবার বৃন্দাবন পর্যন্ত তীর্থপর্যটন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মথুরবাবুর স্নেহভক্তির শীতল ক্রোড়ে উঠিয়া—তাহাতে মথুরবাবুকে পর্যাপ্ত দান ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে যেন অবরুদ্ধ, বহু ভক্তজন কর্তৃক সেবিত, পালিত ও রক্ষিত।"...ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এরকম আরো বিরূপ প্রতিবেদন ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ পরবর্তীকালে সকল তথ্যকে নস্যাৎ করে জনগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পরম পুরুষ রূপেই বরণ করেছিলেন।

রাসমণি দেবী কাশীযাত্রার উদ্যোগের পূর্বেই কাশীধামে একটি মন্দির স্থাপনের জন্য একখণ্ড জমি কিনে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। রাসমণি দেবীর দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ (১৩০০ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র সোমবার) কাশীধামের সেই স্থানে 'রাণী রাসমণি ছত্র' নামক এক দেবমন্দির স্থাপন করেন এবং নিজনামে

* শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা রচিত 'রাণী রাসমণি'-গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেখানে 'ত্রৈলোক্যেশ্বর শিব' এবং 'লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কেদারঘাটের কাছে অবস্থিত। এই দেবালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ত্রৈলোক্যনাথ একটি উইলের দ্বারা প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর বংশের প্রতি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সেখানে সেবায়েতরূপে কাজ করার অধিকার দেন। এমনকি উইলের মাধ্যমে দরিদ্রনারায়ণের সেবা, রবিবারে মুষ্টি ভিক্ষার প্রথা, কর্মচারীগণের বেতন, দেবালয়ের সংস্কারাদি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন স্থানীয় ভোলাগিরির আশ্রম।

প্রবল স্বজাতি-প্রীতির দরুণ ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন জেলার গণ্যমান্য মাহিষ্য-গণকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে "মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী" স্থাপন করেন এবং নিজেই কোম্পানীর এক হাজার টাকার শেয়ার কেনেন। "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির" প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর (১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৩ই পৌষ) ত্রৈলোক্যনাথ পরলোক গমন করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী মহামায়ার পুত্র) ত্রৈলোক্যনাথের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর তারিখ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর (১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৭শে ভাদ্র)।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয়পুত্র ব্রজগোপাল (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী প্রমদা-সুন্দরীর পুত্র) ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (১৩১২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) পরলোক গমন করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের তৃতীয় পুত্র নৃত্যগোপাল (তৃতীয়া স্ত্রীর পুত্র) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর (১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১০ই অঘ্রাণ) পরলোক গমন করেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে জানবাজারের পৈতৃকভবনের কাছে, বিপরীত অংশে 'রাণী রাসমণি ভবন' নামে একটি মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করান।

ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠপুত্র মোহনগোপাল (তৃতীয়া স্ত্রীর পুত্র) ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ) পরলোক গমন করেন।

বর্তমানে ত্রৈলোক্যনাথের পুত্রতরফে কোন বংশধর না থাকায়, কন্যাতরফের বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী।

* * *

শ্রীমতী জগদম্বা ও মথুরমোহনের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—ঠাকুরদাস। মাতা শ্রীমতী জগদম্বার জীবদ্দশাতেই—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের (১২৭৮—৭৯ বঙ্গাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন আইন অনুসারে মাতামহী রাসমণি দেবীর বিষয়-সম্পত্তি থেকে তাঁর বংশধরগণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু যৌথ সম্পত্তি থেকে অন্যভাবে তাঁর বংশধরগণ স্থাবর-অস্থাবর সহ প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরদাসের একমাত্র পুত্রের নাম—শ্যামাচরণ। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১২৭৮-৭৯ বঙ্গাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়।

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা ও জামাতা শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাসের বংশ তালিকা

(প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী অবধি)

শ্রীমতী জগদম্বা—শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস

দ্বারিকানাথ
দাসমণি) (কুমুদিনী)
[নিঃসন্তান]

গুরুদাস
(বিনোদিনী)

১। সুরবালা (ভোলানাথ মণ্ডল)
২। শিবনাথ (সুষমা)
৩। তরুবালা (দুর্গাচরণ দাস)
৪। পারুলবালা (মণিমোহন মল্লিক)

কালিদাস
(সুশীলা)

১। ভবনাথ (গৌরীপ্রভা)
২। সত্যেন্দ্রনাথ (রাণীবালা)
৩। নবনাথ (মাধুরী)
৪। অমরনাথ (নিরুপমা)
৫। বীণাপানি (রবীন্দ্রনাথ দাস)

দুর্গাদাস
(সরোজিনী)

১। প্রফুল্ল (অবিবাহিত)
২। প্রতিভাসুন্দরী (শৈলেন্দ্রনাথ দাস
৩। উমাতারা (বিভূতিভূষণ কাঁঠাল
৪। দুলালচন্দ্র—স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত

শ্রীমতী জগদম্বা—শ্রীমথুরমোহন বিশ্বাস [২য় অংশ]
ত্রৈলোক্যনাথ
(ভুবনমোহিনী) (মহামায়া) (প্রমদাসুন্দরী) (ঠাকুরদাসী)
[নিঃসন্তান]
[নিঃসন্তান]
নিস্তারিণী
(দয়াল সাঁতরা)
ঠাকুরদাস
(কামিনীসুন্দরী)
কৈলাসবাসিনী
(গোপালচন্দ্র বিশ্বাস)
বিধুমুখী
(বিহারীলাল মণ্ডল)
ব্রজগোপাল
(সিন্ধুবালা)
১। বিদ্যুল্লতা (সুধাংশু চৌধুরী)
২। লাবণ্যলতা (বিজয়কৃষ্ণ হাজরা)
নৃত্যগোপাল
(বিভাবতী)
১। সুশীলকুমার (রাধারাণী)
২। ঊষারাণী (সারদানন্দ সরকার)
৩। সুনীলকুমার (অলকারাণী)
৪। পুষ্পরাণী (নির্মলকুমার মান্না)
৫। উমারাণী (কাশীনাথ দাস)
মোহনগোপাল
(বীণাপানি)
১। অনাথনাথ (প্রমীলাসুন্দরী)
২। ইন্দিরাবালা (বিনয়কৃষ্ণ দাস)
তরুবালা
(সত্যচরণ দাস)
শ্যামাচরণ
(বিনোদিনী)
১। নরেন্দ্র—অবিবাহিত
২। যতীন্দ্র
(তুলসীবালা) (কনকলতা)
৩। সত্যেন্দ্র—অবিবাহিত
শ্রীগোপাল
(সরস্বতী)
১। মিনার্ভা (রবীন্দ্রনাথ দত্ত)
মনোরমা
বিনোদিনী
(কেদারনাথ দাস)
জ্ঞানদা
(কৃষ্ণচন্দ্র দাস)
সরোজিনী
(উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল)
নগেন্দ্রবালা
(রামলাল মণ্ডল)

॥ ৩৭ ॥

বিশেষ তথ্যাদি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম এবং রাণী রাসমণির স্বামী রায় রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু একই ইংরাজী বছরে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন। প্রায় ১৯ বছর বাদে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন, যখন বিধবা রাণীর বয়স প্রায় ৬২ বছর। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি (রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত) প্রায় ৬ বছর রাণী রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

*　　　*　　　*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল পরিদর্শনে যান, তখন সেখানে রাণী রাসমণির কাছারী বাড়িতে উঠেছিলেন। সেই বাড়িটি নবদ্বীপে আজও বিদ্যমান। যদুনাথ চৌধুরীর বংশধরগণ এটির মালিক।

*　　　*　　　*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ), তথা তারকনাথ ঘোষালের জন্ম উত্তর চব্বিশপরগনা জেলার বারাসাত শহরে রাণী রাসমণির কাছারী বাড়িতে। তাঁর পিতা রামকানাই ঘোষাল রাণী রাসমণির এষ্টেটের মোক্তার হিসাবে বারাসাতে রাণীর ঐ কাছারীবাড়িতে বাস করতেন, যেখানে স্বামী শিবানন্দের জন্ম। বর্তমানে সেই বাড়িতে বেলুড় মঠের অধীনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' স্থাপিত হয়েছে। সীতানাথ দাসের বংশধরগণ এটির মালিক ছিলেন।

*　　　*　　　*

রাণী রাসমণির প্রচলিত ছবিটি কোন ফটো নয়,—হাতে আঁকা। তিনি যখন অন্দরমহলের ঠাকুরঘরে প্রতিদিন পূজায় বসতেন, তখন সিঁথির জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত (নাম অজ্ঞাত),—যিনি ঠাকুরসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং যাঁর অন্দর-মহলে প্রবেশাধিকার ছিল, তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পূজায় নিযুক্তা রাসমণি দেবীর আকৃতি নিজে এঁকেছিলেন; কারণ, তিনি নিজে একজন দক্ষ চিত্রকর ছিলেন। তাঁর হাতে আঁকা সেই সুন্দর ও নিখুঁত ছবিটিই পরবর্তীকালে 'ব্লক' তৈরী করে প্রচারিত হয়। অবশ্য সেই ছবির অনুকরণে পরে আরো ছবি তৈরী হয়েছে।

*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন (শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ও নহবৎখানার মধ্যস্থলে) রাণী রাসমণির মূর্তি ছাড়াও কলকাতার কার্জন পার্কেও তাঁর মূর্তি আছে এবং জন্মস্থান হালিশহর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে।

* * *

রাণী রাসমণির নামে কলকাতায় ও দক্ষিণেশ্বরে যেমন রাস্তা আছে, অন্যান্য কয়েকটি স্থানে তেমন বাজার ও স্নানঘাট আছে,—এমনকি, তাঁর নামে কলকাতায় স্পোর্টিংক্লাব ও বিদ্যালয়ও আছে। কাশীতেও তাঁর নামে 'রাণী রাসমণি ছত্র' নামক দেবালয় আছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাসের নামে কোন রাস্তা বা বাজার নেই। কেবলমাত্র কলকাতার বাবুঘাটে তাঁর নাম লেখা আছে।

* * *

রাণী রাসমণির তিন জামাতার মধ্যে দুই জামাতার নামে কলকাতায় রাস্তা আছে। জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাসের নামে কলকাতার তালতলায় 'রামচন্দ্র দাস রো' নামে একটি রাস্তা আছে, যেখানে একদা রামচন্দ্রের একটি আস্তাবল ছিল। কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের নামেও কলকাতার বেলেঘাটায় রাণী রাসমণি গার্ডেন্স লেনের পাশেই একটি রাস্তার নাম 'মথুরবাবু লেন'।

* * *

রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে কেবলমাত্র কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের নামে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে একটি রাস্তা আছে এবং দ্বিতীয় জামাতা প্যারীমোহন চৌধুরীর পুত্র যদুনাথ চৌধুরীর নামে কলকাতার ভবানীপুরে একটি বাজার আছে—নাম, যদুবাবুর বাজার।

* * *

রাণী রাসমণির বংশধরগণের মধ্যে যেমন অনেকেই অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি প্রভৃতি আছেন, তেমন অনেকে আবার সরকারী ও বেসরকারী অফিসে বড় বড় পদে নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিও আছেন এবং কলকাতায় বহু বাড়ির মালিকানাও তাঁদের আছে।

* * *

রাণী রাসমণির আমলে তাঁর কলকাতার জানবাজারের বাড়িতে আগে একটি-মাত্র দুর্গাপূজা হোত। বর্তমানে সেই বাড়িতে পৃথকভাবে তিনটি দুর্গাপূজা হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণির বংশধরগণ (দাস বংশীয়) ২০, ২০এ ও ২০বি, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন; দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমারীর বংশধরগণ (চৌধুরী বংশীয়) ১৮/৩ এ, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন এবং কনিষ্ঠা

কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের কন্যার তরফে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (হাজরা বংশীয়) ১৩, রাণী রাসমণি রোড, কলকাতা-১৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন।

* * *

রাণী রাসমণির বাড়ি ছাড়াও তাঁর বংশধরগণ অপর দুই স্থানে—নিজ নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজা করেন। তার মধ্যে একটি হোল—'রাসমণি ভবন' ১৬, রাণী রাসমণি রোড, কলকাতা-১৩ (বিশ্বাস বংশীয়) এবং অপরটি হোল—১১৯, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ (দাস বংশীয়)।

* * *

রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়ির কুলদেবতা ৺রঘুনাথ জীউয়ের পূজা পূর্বে পালাক্রমে তাঁর বংশধরগণ সম্পাদন করতেন। কিন্তু ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস (১৩৯৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস) থেকে সেই কুলদেবতাকে দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাকান্ত মন্দিরে রেখে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে।

* * *

রাণী রাসমণির কলকাতার জানবাজারের বাড়ি ছাড়াও, তাঁর বংশধরগণ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং হাওড়া, বজবজ, ব্যারাকপুর, আগড়পাড়া, সিঁথি প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন। এমনকি, বঙ্গদেশের বাইরেও বর্তমানে অনেকে বাস করছেন।

* * *

রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরটি দেবোত্তর করে গেলেও, নিজের বিশাল সম্পত্তি ভাগ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ৮ জন দৌহিত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হন ; কিন্তু তৎকালীন রাণীর ২ জন কন্যা—শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা জীবিত থাকায়, সম্পত্তিতে তাঁদের জীবনসত্ত্ব অর্শায়। পরবর্তীকালে তাঁদের মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, মাত্র ৫ জন দৌহিত্র জীবিত আছেন। আইনানুসারে তাঁরা প্রত্যেকে সম্পত্তির ⅕ অংশের অধিকারী হন এবং বাকী ৩ জন দৌহিত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা আইনানুসারে মাতামহীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এই ৩ জন দৌহিত্র হলেন—ভূপালচন্দ্র বিশ্বাস, দ্বারিকনাথ বিশ্বাস ও ঠাকুরদাস বিশ্বাস। তবে শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা উভয়েই তাঁদের যৌথ সম্পত্তি থেকে নানা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ৩ জনের উত্তরাধিকারীগণকে বঞ্চিত করেন নি। অবশ্য ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের বর্তমান বংশ নেই। (শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ দাস মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বনে)।

* * *

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন থেকে নতুন নিয়মানুযায়ী যে ৩ জনকে নিয়ে ৩ বছরের জন্য দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের ট্রাস্টি গঠিত হয়, তাঁরা হলেন শ্রীপরেশচন্দ্র হাজরা, শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী এবং শ্রীঅচিন্ত্যনাথ দাস। কিন্তু পরেশচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন শ্রীকেশবলাল বিশ্বাস।

অতঃপর ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ৩ বছরের জন্য যে ৩ জনকে নিয়ে ট্রাস্টি গঠিত হয় এবং যাঁরা এখনও ঐ পদে বহাল আছেন (মেয়াদ ১৯৯২ জুন অবধি), তাঁরা হলেন শ্রীঅমরনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅসিতনাথ দাস ও শ্রীগোকুলানন্দ দাস। ১৯৮৬ খৃঃ থেকেই আজ অবধি অবৈতনিক কর্মসচিব (সেক্রেটারী) পদে নিযুক্ত আছেন শ্রীকুশল চৌধুরী।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে নতুন ট্রাস্টি গঠনের পর ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাণী রাসমণির অমর কীর্তি এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৬-৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের ট্রাস্টি কর্তৃক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের যে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য একটি তালিকা ঃ—

(১) দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী থেকে শুরু ক'রে সকল কর্মচারীর জন্য উচ্চবেতনহার প্রবর্তন, বেতন বৃদ্ধি প্রবর্তন, চিকিৎসা খরচ, ঋণ প্রদান প্রভৃতি নানা সুবিধাজনক পদ্ধতি চালু হয়েছে।

(২) সেবাপূজার মানোন্নয়ন করা হয়েছে।

(৩) মায়ের অলঙ্কারাদি, পদ্মাসন, স্বর্ণনির্মিত মুকুট প্রভৃতির জন্য আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৪) টেরাকাটার স্থাপত্যশৈলীকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী সমগ্র মন্দিরাদি ও পার্শ্ববর্তী ইমারাদির সংস্কার করা হয়েছে।

দেবোত্তর এস্টেট কর্তৃক কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার কাছে মন্দিরের জন্য কোন সাহায্য বা অনুদানের প্রত্যাশী হওয়া এস্টেটের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই মন্দিরকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্ররূপে ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এস্টেটের যৌথ উদ্যোগে নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে ঃ—

(১) পঞ্চবটী উদ্যান, পঞ্চমুণ্ডী, গাজীপীরের স্থান, শান্তিকুটীর প্রভৃতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলির উন্নয়ন ও যথাযথ রক্ষার ব্যবস্থা।

(২) পয়ঃপ্রণালীর সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন।

(৩) সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণকে 'সোডিয়াম ভেপার' আলোকে আলোকিত করা।

(৪) জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(৫) জনসাধারণের জন্য ২টি শৌচাগার নির্মাণ।